মধু-কৈটভ
সৌরভ চক্রবর্তী

মৃত কৈটভ

মৃত-জীবিত

মৃত কৈটভ

সৌরভ চক্রবর্তী

বিভা পাবলিকেশন
রাজারহাট রেসিডেন্সি, কলকাতা-১৫৭

MRITA KAITAV
by SOURAV CHAKRABORTY
Published by Biva Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Roypara, Hatiara, Kolkata 700157
Phone : 9434343446
e-mail : biva.publications@gmail.com
follow us : facebook.com/BivaPublication
Website : www.bivamart.in
Rs. 222.00

ISBN : 978-93-90890-76-7

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা বইমেলা

প্রচ্ছদ : স্বর্ণাভ বেরা

অলংকরণ : কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

মূল্য: ২২২ টাকা (ভারতীয় মূল্য)

প্রকাশক: বিভা পাবলিকেশন

পরিবেশক

দে বুক স্টোর (দীপুদা),
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষর ডট এক্সওয়াইজেড (বাংলাদেশ),
ট-৬৮/৩, সৈয়দবাড়ি, বৈশাখী সরণী, গুলশান লিংক রোড, ঢাকা-১২১২

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণু যাঁর শয়নে স্বপনে বিরাজমান।
আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই শ্রী সুকুমার চন্দ্র ঘোষ-কে।

ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ভূমিকা

প্রথমেই বলি, এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক প্রেক্ষাপটে রচিত। তবে 'মৃত কৈটভ' লেখার কথাটা কীভাবে মাথায় এল একটু বলে রাখি। আমার একটা অভ্যাস বা বদভ্যাস যাই বলুন, সেটা হলো যে কোনো পৌরাণিক কাহিনি যা বাজারে উঠতে বসতে আমরা শুনে থাকি, সেই কাহিনিগুলোর শুরু ও শেষ পুরাণ গ্রন্থে খুঁজে বের করা। এরকমই এক রাতে প্রহ্লাদ আর নরসিংহ দেবতার কাহিনির শেষ কোথায় তা খুঁজছিলাম। হিরন্যকশিপুকে বধ করার পর নরসিংহ দেবের কী হলো, তিনি কোথায় গেলেন এই প্রশ্নগুলো মাথায় এসেছিল। আর সেই খোঁজ করতে গিয়ে অনুসন্ধান পেলাম এক বিশাল কাহিনির। শিবপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে এই একই কাহিনির আলাদা আলাদা ভাষ্য আমার মনে কৌতূহলের জন্ম দিল। সেখান থেকেই জন্ম হল 'মৃত কৈটভ' উপন্যাসের।

লেখার সময় আমি পুরাণের উল্লেখ যথাযোগ্যভাবে বিভিন্ন স্থানে করেছি। হেমন্তাই চরিত্রের মুখে সমস্ত কাহিনির সটীক উল্লেখ রেখেছি কাহিনির মাধ্যমেই। সেখানেই উল্লেখ করে দিয়েছি কোন পুরাণের কোন অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কাহিনি শেষে তথ্যসূত্রেও সেই গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছি যেগুলোর সাহায্য এই কাহিনি লেখার সময়ে নিয়েছি।

এত তথ্য প্রমাণাদির পরেও যে কাহিনিটি আমি লিখেছি তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ত্রিপুরায় না এরকম কোনো উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে না রয়েছে এরকম এক অরণ্য। কাহিনির প্লট নির্মাণের খাতিরেই আমি এরকম কাল্পনিক এক উপজাতি গ্রাম এবং অরণ্যের আশ্রয় নিয়েছি। আমার রাজ্যের উপজাতি ভাই বোনদের প্রতি বাল্যকাল থেকেই আমার ভালোবাসা অক্ষুন্ন ছিল এবং থাকবে।

এই কাহিনিতে আমি ত্রিপুরা এবং রাজধানী আগরতলার প্রায় অজ্ঞাত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করেছি। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আমি যেরকম পড়েছি ও জেনেছি এবং আমার অভিজ্ঞতায় দীর্ঘ তিন দশকের অধিক সময়ে যা দেখেছি তার ভিত্তিতেই এই লেখা। তথ্য সূত্রে কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করলাম।

বিভা পাবলিকেশনের অন্যতম সৈনিক শ্রীমান অভিজিৎ খাঁ বহুদিন আগেই আমাকে একটি পাণ্ডুলিপির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এত কাল পর আমি কথা রাখতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। এই কাহিনি মূলত ওঁর জন্যেই লিখে উঠতে পেরেছি। ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই সংস্থার কর্ণধার শ্রী অনিমেষ প্রামাণিক মহাশয়কে। তিনি আমাকে উপন্যাসটি লেখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় এবং স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

আমার পরিবারের ভালোবাসা ছাড়া এই উপন্যাস লিখতে পারতাম না। এই উপন্যাস আমি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাইকে শ্রী সুকুমার চন্দ্র ঘোষকে উৎসর্গ করেছি। শ্রীবিষ্ণু তথা শ্রীকৃষ্ণ-র প্রতি তাঁর ভাব, ভালোবাসা, ভক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। ত্রিপুরায় আগরতলার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতি তাঁর অধ্যাবসায় শিক্ষনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি আগরতলার বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের ফাউন্ডার মেম্বারদের অন্যতমও বটে। তাই শ্রীবিষ্ণুর এক প্রায় অজ্ঞাত রূপের উল্লেখ যেহেতু এই গ্রন্থে রয়েছে তাই তাঁর এক বড় ভক্তকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা সমীচীন বলে মনে করলাম। ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরিশেষে বলি, বাংলা ভাষায় কার্যত পাঠক পছন্দ করেনি এরকম এক বিষয় নিয়ে এবার লিখলাম এই গ্রন্থে। কোন বিষয়ের কথা বলছি তা আপনারা পড়া শুরু করলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন। এটা আমার নিজের কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে এরকম একটা প্রায় অচল ধারণাকে নিয়ে কীভাবে বাংলায় একটা উপন্যাস লিখতে পারি। বহুদিন ভেবে আমি পুরাণ এবং রহস্য-রোমাঞ্চের আশ্রয় নিয়ে কাজটা করলাম। যদি আপনাদের এই লেখা ভালো লাগে তবে যারপরনাই আনন্দিত হবো এবং আগামীতেও এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাবো। সেক্ষেত্রে হয়তো পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের সিক্যুয়েল আসবেই।

আর কী, পাঠ শুভ হোক।

ধন্যবাদান্তে

সৌরভ চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৬ শে জানুয়ারি, ২০২৩

মেইল আইডি - authorchakraborty.sourav@gmail.com

লেখকের কথা

এই গ্রন্থ কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্কদের জন্য। কোনো পরিবার অথবা সম্প্রদায় অথবা কোনো সাধক কিংবা কোনো সাধারণ ব্যক্তি (জীবিত কিংবা মৃত) অথবা কোনো উপজাতি সম্প্রদায়-কে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লেখা হয়নি। এই কাহিনি সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক অর্থাৎ ফিকশান। তবে এই কাহিনির সঙ্গে কোনো বাস্তব ঘটনা বা ব্যক্তির সরাসরি মিল শুধুমাত্র কাকতালীয় ঘটনা হবে। গ্রন্থের লেখক সমস্ত পুরাণ কাহিনির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই কাহিনিতে উল্লিখিত উপজাতি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি ভাই-বোনদের লেখক বাল্যকাল থেকেই ভালোবাসেন। যে ক্রিয়াদির উল্লেখ এই গ্রন্থে রয়েছে বাস্তবে সেরকম ঘটনা কোথাও ঘটে না এবং এরকম অরণ্যও ত্রিপুরাতে নেই। শুধুমাত্র একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি লেখার খাতিরেই লেখক এই সমস্ত উল্লেখ করেছেন। কাহিনি শেষে তথ্যপঞ্জিতে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হল।

- সৌরভ চক্রবর্তী

(১)

"জঙ্গলে বিষ আছে বাবু, এই জঙ্গলের খুব ভিতরে যেতে নেই।"
খাঁটো ধুতি পরা লোকটা বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যাদের প্রাণে মুক্তিযুদ্ধের আগুনের পরশ জ্বলছে তারা এসব শুনবে কেন?

"কিছু হবে না। আমাদের পাশের দেশে যে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে তার থেকে কম কিছুই হবে এই জঙ্গলের বিষ। আমাদের যেতে দাও। আর শোনো আমরা যে এসেছিলাম তা কাউকে বলবে না। এই নাও বকশিস।"

একটা রূপোর বাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে চারজনের দলটা জঙ্গলের পথে পা বাড়ালো। এই জঙ্গল ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সীমানা পেরিয়ে অনেকটা গেলে বাংলাদেশ। অন্তত একদিনের হাঁটা পথ তো বটেই। উপজাতি অধ্যুষিত জায়গা বলে এদিকে গা ঢাকা দিলে ধরা পড়ার ভয়টা তুলনামূলকভাবে কম। তাই এই জায়গার সন্ধান পেলে কিছু মুক্তিযোদ্ধা এদিকেই যাতায়াত করতে পারবে। এপারের কিছু বাঙালি যুবকের মাথায় ওপারের জন্য মমত্ববোধ জেগে উঠেছে। উঠবে না-ই বা কেন! এই কিছু বছর আগেও এক দেশ ছিল। ভাগাভাগির পর বাড়ির এক অংশ এপারে এক অংশ ওপারে হয়ে গেল। তাতে নাড়ীর টান কমবে কেন? তাই সেরকম কিছু যুবক আজ চলেছে ওপারের পথে। এই পথের হদিশ মুক্তিযোদ্ধাদের দিতে চলেছে ওরা। খবরটা ওপারে দিতে পারলে ধরা

পড়ার ভয়টা কিছুদিনের জন্য অন্তত কেটে যাবে, কাজও এগোবে মসৃণ গতিতে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। উত্তর-পূর্ব ভারত তুলনামূলক শান্তই বলা চলে।

রূপোর বাটি হাতে নিয়েও উপজাতি লোকটা আর-একবার ভাঙা বাংলায় চেষ্টা করে, "আপনেরা না গেলেই ভালো করতেন?"

যুবকদের মধ্যে যে দলনায়ক সে এবার এগিয়ে আসে। লোকটার কাঁধে হাত রেখে বলে, "তুমি শুধু কাউকে বলবে না যে আমরা এদিকে এসেছিলাম। বাকি আমরা সামলে নেবো।"

চোখ তুলে একটা বাঁকা চাহনি দেয় লোকটা, "কিন্তু বাবু, লোকে তো জানবেই।"

এবার উপস্থিত সবাই চোখে চোখে কথা বলে নেয়। লোকটা কি সবাইকে জানাবার মতলব করছে নাকি! রূপোর বাসন নেবার পরেও!

"কে জানাবে লোকেদের?"

দলনায়ক বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে। লোকটা এবার একটু দমে গেল। তারপর রহস্য করে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, "সে আপনারাই জানাবেন। দেবতার জঙ্গলে ঢুকছেন যখন দেবতাই দেখবে আপনাদের। শুধু সাবধানে থাকবেন। কারণ জঙ্গলে বিষ আছে। আমরা কেউ গ্রামের সীমানা থেকে জঙ্গলের এক কিলোমিটার ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকিনি কোনোদিন। আর যারাই গেছে তারা আর সুস্থ হয়ে ফেরেনি বা মরেই ফিরেছে।"

কথাগুলোর মধ্যে কোথাও পুলিশের নাম নেই শুনেই স্বস্তি পেল সকলে। দলনায়ক তরুণ এবং যুক্তিবাদী। মুচকি হেসে উপজাতি লোকটার পিঠে হাত বুলিয়ে বাকি তিনজনকে নিয়ে জঙ্গলের পথে পা দিল। পূর্ণিমার রাত। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। উপজাতি লোকটা দেখল চারজন যুবক জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করছে। তাদের একজন সুন্দর শব্দ করে শিস দিচ্ছে। হয়তো কোনো মনোহর গানের কলি গাইছে এভাবে! সবার পিঠেই বেশ বড় বড় চামড়ার ব্যাগ। সবাই ধুতি আর পায়জামা পরে আছে। ধীরে

ধীরে হারিয়ে গেল ওরা। ওদের আর দেখতে পেল না উপজাতি লোকটা। গ্রামে ফিরে গেল সে।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা মন্দির ছিল। এত রাতেও একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে সেখানে। তবে একটা অস্থির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেশিক্ষণ টিকে থাকবে না এই মোমবাতি। অচিরেই নিভে যাবে। ইতিমধ্যে কাঁপছে আলো। তাই মন্দিরের বিগ্রহের চেহারা আর দেখা যাচ্ছে না।

উপজাতি লোকটা রূপোর বাটিটা পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে নমস্কার করল দেবতাকে। প্রণাম সেরে উঠে আনমনে বলল, "অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আটকাতে পারলাম না। ভোগ গ্রহণ করুন।"

আর তখুনি হাওয়ার বেগ বাড়ল। মোমবাতিটা এক ঝটকায় নিভে গেল। লোকটা তারপর কী করল আর দেখা গেল না। মন্দিরের ভিতরে বট-অশ্বত্থ গাছের জ্যামিতিক অন্ধকারে চাঁদের ঝলমলে আলো এদিকটায় আর পৌঁছয় না।

জঙ্গলের ভিতরে হাঁটছে চার যুবক। মাথার উপরে পরিচ্ছন্ন মেঘ হাওয়ার দাপটে চাঁদের নীচে আসা যাওয়া করছে। তাতে পথ চলার সামান্যও অসুবিধে হচ্ছে না। এদিকে সমান্তরাল উদ্ভিদশ্রেণীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় হাওয়ার দাপটও একটা সময় অব্দি সেরকম কোনো সমস্যা তৈরি করল না। কিন্তু যত তারা ভিতরে প্রবেশ করল তত হাওয়ার দাপট বাড়তে থাকল। জঙ্গলের পাখিরাও আর নির্বিঘ্নে থাকল না। শুরু করল চেঁচামেচি।

"কী রে ঝড় আসবে নাকি অমল?"

দলনায়ক অমল হাঁটা না থামিয়ে বলল, "আসলে আসবে। ভিজবো বৃষ্টিতে।"

অন্যজন বলল, "সে না হয় ভিজলাম। কিন্তু জঙ্গল তো আর কিছুটা গেলেই ঘন হয়ে আসবে। চাঁদের আলো অব্দি পৌঁছাবে না সেখানে। তখন ঝড়ের মধ্যে পড়লে তো কিছু করা যাবে না।"

অমল বক্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাধারণ অবস্থায় বৃষ্টি বা ঝড় না

এলে কী করতিস?”

“তাই তো পূর্ণিমা বাছাই করে বেরোলাম যাতে কিছু অন্তত দেখা যায়।”

অমল বক্তার এই উত্তরে কিঞ্চিৎ হেসে উঠল, তারপর বলল, “বীর বাহাদুরেরা শোনো, তোমাদের এত চিন্তার কিছু নেই। একটা টর্চ জোগাড় করেছিলাম। কেনার টাকা ছিল না আর কেউ এমনিতে দিতেও চাইছিল না। চক্রবর্তীদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়েছি। আপাতত সেটা জঙ্গলে ঢুকলে জ্বালাবো।”

“অমলদা, এইটা তুমি আগে বলবে না?”

একজন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। বাকিরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। জোরে হাঁটতে হাঁটতে হাঁফ ধরে গেছিল সবার। সবাই দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গেল।

অমল পকেট থেকে একটা আধ-খাওয়া বিড়ি বের করল। দেশলাই জ্বালাতেই জঙ্গলটা খনিকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল। সবাই সেই আলোয় জঙ্গলের চেহারা দেখে এই প্রথমবারের মতো ভয় পেল। দেশলাই কাঠিটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল অমল। কিন্তু সম্পূর্ণ জঙ্গল দেখার জন্য এটুকু আলো যথেষ্ট নয়। দলের মধ্যে একজন এবার বেশ শুকনো গলায় বলল, “অমলদা, টর্চটা জ্বালাও না।”

দেশলাই কাঠি ততক্ষণে নিভে গেছে। চাঁদের আলো পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু নিজের স্নিগ্ধ আলোতে চাঁদ যেন এই জঙ্গলের বীভৎসতা আড়াল করার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুবকদের ভুলিয়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢোকানোই যেন তার উদ্দেশ্য।

অমল তার ঠোঁটে সদ্য জ্বালানো বিড়িটায় টান দিল। আগুনের বলয় তেজিয়ান হল ঠোঁটের কাছে। তারপর চামড়ার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা টর্চ। সামনে তাক করে জ্বালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু টর্চ জ্বলে উঠল না। বারকয়েক টর্চের সামনে পেছনে থাপ্পড় মারল অমল। তাতেও কাজ হল না।

আর তখনই প্রথমবার শোনা গেল শব্দটা। তিনজন আগেই স্থির হয়ে

দাঁড়িয়েছিল, শুধু অমল টর্চটাকে জ্বালাবার বৃথা চেষ্টা করছিল। সেও এবার কান খাড়া করে স্থির হয়ে গেল।

"এটা কীসের শব্দ অমলদা।"

চারজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে, সে প্রশ্নটা করল।

"শশশ..."

মুখে শব্দ না করার ইঙ্গিত করল অমল। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল এভাবেই। আর কোনো শব্দ নেই। সবাই নিজের অস্তিত্বটাকেও যথাসম্ভব চেপে জঙ্গলের ঘাসে শুয়ে পড়েছিল। পাঁচ মিনিট কেটে গেলে অমলই প্রথম উঠে দাঁড়ালো। টর্চের বোতামটায় এবার চাপ দিতেই সেটা জ্বলে উঠল। এবার ধীরে ধীরে বাকিরাও উঠে দাঁড়াল। ঘন জঙ্গল ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। গ্রাম থেকে জঙ্গলের প্রথম কিলোমিটারের গণ্ডি শেষ হয়ে গেছে। চাঁদের আলো আর এখানে পৌঁছাতে পারবে না। দেখে মনে

হয় জঙ্গলের দেবতা চাঁদকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতিটুকু অব্দি দেননি। পিছনে ফিরে তাকালো অমল। একটা অংশের পর আর চাঁদের আলো এগোতে পারেনি।

দলের একজন শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "অমলদা, আজ বরং আমরা ফিরে যাই।"

অমল বজ্রকঠিন গলায় বলল, "শুধু তুই কেন বাকিরা চাইলেও ফিরে যেতে পারিস। কিন্তু আমি আজ ফিরবো না। চারদিকে আমাদের বয়সী ছেলেরা কীভাবে রাইফেল বেয়োনেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। আর আমি কিনা এই অন্ধকার জঙ্গলকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবো।"

অন্য একজন অমলকে বোঝাবার চেষ্টা করল, "অমল ওখানে বিপদটা কী হবে আমরা জানি। গুলি খাবো মরে যাবো। কিন্তু এখানে সামনে কী আছে তার কোনো ঠিক নেই। টর্চের আলো একবার জ্বলছে একবার জ্বলছে না। হঠাৎ নিভে গিয়ে আর আদৌ জ্বলবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই। আমরা বরং দিনের বেলা চুপিচুপি ঢুকে পড়বো এই জঙ্গলে।"

অমল রেগে যায়, "কী আবোল তাবোল বলছিস। সামনে কী আছে তার ঠিক নেই এটার মানে কী? সামনে কি দত্যি দানো আছে নাকি? আর তাছাড়া দিনের বেলায়..."

কথাটা শেষ করতে পারে না অমল। সেই পুরোনো শব্দটা আবার হল, সজোরে হল। কোনো গর্জন নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ তীব্র হুঙ্কার।

"এ আবার কোন প্রাণী? কোন প্রাণী এভাবে ডাকে!"

একজন জিজ্ঞেস করল। কারো কাছে কোনো উত্তর ছিল না। অমলের কপালেও এবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

"না না, অমলদা তুমি থাকতে হলে থাকো, এগোতে হলে এগোও। আমরাও বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চাই। বেঁচে থাকলে সাহায্যটা করতেও পারবো। এভাবে বেঘোরে মারা যাবার অর্থ নেই। তুমি থাকলে থাকো, আমি চলে যাচ্ছি।"

অন্য একজনও এতে সায় দিল, "অমল, তুইও যাস না। ফিরে চল আমাদের সঙ্গে। কাল দুপুরের দিকে আবার আসবো আমরা। জেদ করিস না।"

অমলের পিঠে হাত রেখে বুঝিয়ে কথাগুলো বলল তার বন্ধু। কিন্তু অমলের মাথায় রোখ চেপেছিল। সে ঝটকা মেরে সেই হাত নামিয়ে দিল, "ফিরে যা তোরা কাপুরুষের মতো। আমি একাই এগোচ্ছি।"

টর্চ হাতে অমল এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। বাকিরা দেখল একটা টর্চের আলো ধীরে ধীরে গহীন অরণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাকি তিনজন ফেরার পথ ধরল। বাকি পথটুকু সেই পাশবিক হুঙ্কারটা বারকয়েক তারা শুনতে পেল। পা চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব জঙ্গলের পথ শেষ করল তারা।

জঙ্গল থেকে প্রায় যখন গ্রামে পৌঁছে গেছে ঠিক তখন শেষবারের মতো সেই হুঙ্কার শুনতে পেল তারা আর সেইসঙ্গে আরও একটা চিৎকার কানে এল তাদের।

অমল গগনভেদী এক চিৎকার করে সম্ভবত চিরকালের জন্য শান্ত হয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ ভেসে এল না।

পরদিন বেলা বারোটায় আগের রাতের তিনজন দেখা করল। ত্রিপুরাতেও চারদিক থমথমে। বাংলাদেশের আঁচ প্রায় সরাসরি লেগেছে এই রাজ্যে। একটা শুনশান মাঠের এক কোনায় তিনজন গাছের ছায়ার নীচে বসে আছে।

"রাজেশ, আমাদের মনে হয় একবার ফিরে গিয়ে দেখা উচিত।"

রাজেশ মাথা নাড়ল। অমলের পর সেই এখন তেমাথা দলের নেতা। বলল, "সুখেন যাবি?"

সুখেন সবার ছোটো। সে উৎসাহ দেখাল, "অমলদার খবর নিতে যাওয়া দরকার। অভিকদাও যখন বলছে চলো সবাই মিলে যাই।"

রাজেশ মৃদু হেসে বলে, "সে যাওয়ারই যদি হতো তোরা সকালে সেটা ভাবলি না কেন! তাহলে আর ফিরে আসতাম না আমরা। ওখানে যেতেও লাগবে ঘণ্টা দু'য়েক সময়। বাসগুলো ওই জঙ্গলের দিকে এমনিতেই কম

যায়। তার উপর এই যুদ্ধের সময়।”

অভিক বলল, “সকালে আমাদের কারো মাথা কাজ করছিল না সম্ভবত। আচ্ছা, ওই হুঙ্কারটা কোন প্রাণীর? সেটা ভেবেছিস তোরা?”

এবার স্পষ্ট ভয়ে ছায়া নামল সবার মুখে। সুখেন বলল, “প্রাণী নাকি কে জানে! অমলদার ওই বুক ফাটানো চিৎকারটা আমি শেষ রাতে ঘুমের মধ্যেও যেন শুনতে পাচ্ছিলাম।”

থমথমে মুখ নিয়ে রাজেশ বলল, “আমরা ভাবতেই শিওরে উঠছি। অমলটা যদি সেই প্রাণীর সামনে পড়ে থাকে... নাহ আর ভাবতে পারছি না।”

অভিক বলল, “নাহ, চলো যাই একবার। ওইরকম ভয়ানক জঙ্গল দিয়ে আসা যাওয়া করার প্রয়োজন নেই মুক্তি যোদ্ধাদের। কিন্তু অমলকে খুঁজতে যেতেই হবে।”

সবাই এক বাক্যে সায় দিল। শুধু রাজেশ একবার বলল, “কীভাবে যে অমলটা এই জঙ্গলের হদিশ পেল কে জানে। ওই গ্রামে বাপের জন্মে কখনো যাইনি। গ্রামটাও বড্ড অদ্ভুত!”

আধঘণ্টার মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগামী একটা বাসে উঠে পড়ল তিনজনে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। গ্রামটা মূলত একটা পাহাড়ি টিলার উপরে অবস্থিত। এখানকার লোকজন মূলত উপজাতি গোষ্ঠীর। গ্রামে ঢোকার মুখে তারা দেখল জনাকয়েক যুবক চাষবাসের জন্য টিলার উপরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বারকয়েক রাজেশদের দিকে ফিরে তাকাল তারা। রাজেশরাও তাদের দিকে তাকাল। তারপর গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করল।

এই এলাকা এমনিতেই থমথমে থাকে। কিন্তু আজ যেন একটু বেশিই থমথমে হয়ে আছে। খুব বড় এলাকা জুড়ে নয় এই গ্রাম। কিন্তু মোটের উপর আশেপাশে যে আর কোনো গ্রামাঞ্চল নেই তা রাজেশ-সুখেনরা বাসে করে আসার পথেই বুঝে গেছে। অমল থাকলে ভালো হতো। এই অঞ্চলটা

সে আরও ভালো করে চিনতো। ওরা গ্রামের ভিতরে এগিয়ে গেল।

কিছু দূর হাঁটার পর একটা জটলা দেখা গেল। তিনজনে এগিয়ে গেল সেই জটলার দিকে। জটলার কাছাকাছি গিয়ে যে দৃশ্য দেখল তাতে তারা চমকে উঠল। যে জায়গাটায় জটলা করা হয়েছে সেটা মূলত এই গ্রামের শ্মশান। মৃতদেহ পোড়াবার জন্যই যে এই জায়গাটা ব্যবহার করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে দু'টো চিতা। এই অঞ্চলের উপজাতিদের অনেকেই হিন্দু মতে শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে। তাই চিতা দেখাটা বিশেষ কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু যারা চিতার কাছাকাছি রয়েছে, অর্থাৎ যারা ডোম তাদের পোশাক একদমই আলাদা। কালো রঙের প্লাস্টিকের পোশাক পরে আছে দু-জন ডোম। মুখ চোখ অব্দি রুমাল দিয়ে ঢাকা। শুধু তাদেরই নয়, উপস্থিত সকলেরই মুখ ঢাকা রুমাল বা গামছা দিয়ে। কোনো কোনো চাষী খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মুখ, নাক, চোখে রুমাল দেওয়া। এই দৃশ্য স্বভাবতই খুব অদ্ভুত।

একজন মহিলা অদূরে গাছের নীচে বসে কান্নাকাটি করছে। তাকে অন্যরা সান্ত্বনা দিচ্ছে। সম্ভবত ওর প্রিয়জন কেউ মারা গেছে।

ঠিক এই সময় রাজেশ কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। এমনিতেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল ওরা, এই স্পর্শে সে চমকে পিছন ফিরল। একজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে গামছা ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাক, মুখ ঢেকে নিন।"

সবাই গামছা দিয়ে নাক মুখ ঢেকে নিলো ভালো করে। অভিক জিজ্ঞেস করল, "সবাই মুখ ঢেকে অন্ত্যেষ্টি দেখছে কেন?"

গ্রামবাসী এবার হাতের ইশারায় তাদের ডাকল। তারা তার পিছু পিছু রওনা দিল। কিছু দূর একটা গাছ তলায় গিয়ে মুখ থেকে গামছা সরালো সেই গ্রামবাসী। এবার রাজেশ তাকে চিনতে পারল। এই লোকটাই তো গতকাল তাদের সাহায্য করেছিল।

"না করেছিলাম বাবু, না করেছিলাম। জঙ্গলে যেতে বারণ করেছিলাম

আপনাদের।”

কেউ কোনো কথা বলল না। লোকটা নিজের ধুঁতির কোঁচা একটু তুলে ধীর স্থির ভাবে বলল, “এই যে দেখছেন দু'টো লাশ, এর জন্য দায়ী আপনারা। নেহাত আমি মুখে কুলুপ এঁটে আছি তাই কেউ জানবে না। তবে আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই গ্রামের দিকে আর আসবেন না।”

রাজেশ আমতা আমতা করে বলল, “কিন্তু, আমরা তো ফিরে এসেছিলাম।”

লোকটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল, “তাতে কী? আপনার বন্ধু তো আর ফেরেনি।”

সুখেন বলল, “হ্যাঁ, অমলদার জন্যেই তো আজ আমরা আবার এলাম। ওকে নিয়ে ফিরবো।”

লোকটা এবার কোনো উত্তর দিল না।

অভিক জিজ্ঞেস করল, “আপনি কী বলতে পারেন আমাদের বন্ধু কোথায়?”

লোকটা এবার খুব ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রাজেশও সাগ্রহে জিগ্যেস করল, “কোথায় সে?”

এবার লোকটা আঙুল দিয়ে দেখাল। তিনজনেই তার আঙুলের দিক অনুসরণ করে আঁতকে উঠল। কী দেখাচ্ছে লোকটা! চিতার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে সে।

রাজেশ এবার এগে গেল, “কী আবোল তাবোল বলছেন! আমাদের বন্ধু কি চিতায় জ্বলছে নাকি!”

লোকটা এতটুকু উত্তেজিত হল না। শান্তভাবে বলল, “হ্যাঁ। আপনাদের বন্ধুই চিতায় জ্বলছে।”

রাজেশ, অভীক, সুখেনের অবস্থা আর তখন কহতব্য নয়। শোক নাকি রাগ, কীসের বহিঃপ্রকাশ হবে বোঝা যাচ্ছে না। অভিক লোকটাকে মাটি থেকে টেনে দাঁড় করালো। জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছিল অমলদার? আর

জঙ্গলে কাল কোন প্রাণীর হুঙ্কার শুনেছিলাম আমরা?"

লোকটা এবারেও শান্তভাবেই অভিকের বজ্র আঁটুনি থেকে নিজেকে মুক্ত করল। তারপর বলল, "বারণ করেছিলাম। বারবার বারণ করেছিলাম।"

কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না দেখে রাজেশ জিগ্যেস করল, "যদি কিছু হয়েও থাকে, লাশটা আমাদের হাতে তুলে দিলেন না কেন আপনারা?

এবারেও লোকটা হেঁয়ালি করল, "কারণ জঙ্গলে বিষ আছে। সে বিষ ছড়ালে কেউ বাঁচবো না আমরা। তাই তো লাশ পোড়াতে গিয়েও ওরা প্লাস্টিকের পোশাক পরে নিয়েছে। আমরা নাক মুখ ঢেকে দূর থেকে দেখছি।"

কোনো প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেল না। শুধু লোকটা বলে চলেছে, "ফিরে যান আপনারা। আর কখনো ফিরবেন না আমাদের গ্রামে।"

সুখেন শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করল, "দু-টো চিতার অন্যটা কার? গাছতলায় সেই মহিলাই বা কে?"

লোকটা এবার আর শান্ত রইল না। রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাল তাদের দিকে। তারপর বলল, "এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন না আপনারা। এই মুহূর্তে চলে যান নইলে আমি সবাইকে ডেকে আপনাদের পরিচয় এবং কাল রাতের ঘটনা জানাতে বাধ্য হবো।" কথাটা শেষ করেই গটগট করে বেরিয়ে গেল লোকটা। শ্মশানের ভিড়ে গিয়ে গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাজেশ অভিকদের চোখে জল। অমলকে শেষ দেখাও আর দেখতে পেল না তারা। শুধু একরাশ দুঃখ, শোক আর এক অজানা রহস্য নিয়ে শহরের দিকে ফিরে এল ওরা। আর কখনো ওরা সেই গ্রামের পথে পা বাড়ায়নি।

ওরা যখন শহরে ফেরার বাসে উঠছে তখন তাদের পিছনে এক ঝাঁক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দু-টো চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

* * * * * * * * * * *

(২)

দিল্লি এয়ারপোর্টে বসে রামানুজ চারদিকে তাকাচ্ছে। সিকিউরিটিতে ঢোকা ইস্তক কেমন ঝিমুনি আসছিল। এক কাপ গরম কফি খাওয়ার পর সেটা অনেকটাই কেটেছে। ভোরবেলায় ফ্লাইট থাকলে এই ঝিমুনিটা আসে তার। এখন এক কোণে একটা বিন ব্যাগে বসে আশেপাশের ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টি শূন্য নয়। শুধু চারদিকের লোকজন কী করছে, কীভাবে করছে এইসব অভিজ্ঞ চোখের ক্যামেরায় বন্দি করে নিচ্ছে সে। কখন কী কাজে লেগে যায় কে জানে!

এবারের যাত্রাটা ক্যানসেল করে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু ভবি ভোলার নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিশেষ সুপারিশ এল যে রামানুজকেই যেতে হবে। সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযুক্ত মনে হলে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে। প্রোজেক্টটা কলকাতায় হলে তবুও ঠিক ছিল। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা হয়ে যেত। কিন্তু ত্রিপুরায় প্রোজেক্ট শুনে রামানুজ প্রথমেই আপত্তি জানিয়েছিল। সে সরাসরি তার উর্ধ্বতনকে বলেছিল, "স্যর, আপনি অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি ত্রিপুরায় কখনো যাইনি আর যাওয়ার ইচ্ছেটাও নেই। দিল্লিতে সবে স্যাটল করলাম। সামনে বিয়ে। আর এখন আপনি আমাকে আবার অন্য কোথাও পাঠাবার কথা বলছেন?"

উর্ধতন রাজীব ত্রিবেদী হেসেছিলেন। বললেন, "তা বিয়েটা আরও আগে করলে না কেন? আর কলকাতার ছেলে একবার নর্থ ইস্টে যাবে না তা হয় নাকি।"

"কিন্তু আমি কেন স্যর? আরও তো অনেকে আছে?"

"সবাই সবকিছুর যোগ্য হয় না। তোমার মতো ক-জন ফরেস্ট অফিসার এত কম সময়ে জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে এসি লাগানো দশ তলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের

অফিসে পা দুলিয়ে স্যালারি নিচ্ছে? তুমি পেরেছো কারণ তুমি যোগ্য। সারা জীবন জঙ্গলে পড়ে থাকতে হয়নি। কিন্তু জঙ্গলের চাকরি তো, মাঝে সাঝে জঙ্গল আমাদের টানবেই। আমি পঞ্চাশ বছর বয়সেও একটা প্রোজেক্ট কমপ্লিট করে এসেছি। তোমার সবে পঁয়ত্রিশ। যাও যাও, ত্রিপুরায় সত্তর শতাংশ লোক বাংলায় কথা বলে। তোমার ভালো লাগবে রাজ্যটা। আর তাছাড়া, যে জঙ্গলটায় নিয়ে এত কথা, সেটাতে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে ভরসা পাচ্ছি না।"

এবার ভ্রু কোঁচকায় রামানুজ। বলে, "জঙ্গল নিয়ে এত কথা মানে? কীসের জঙ্গল?"

ত্রিবেদী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বড় অফিস ঘরটায় পায়চারি করতে করতে বললেন, "খুব রহস্যঘন এই জঙ্গল। ওখানে একটা ট্রাইব থাকে। জঙ্গলের ভিতরে নয়, জঙ্গলের বাইরের একটা গ্রামে। অদ্ভুত গ্রাম। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মূল শহর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকতেই ওরা ভালোবাসে। জঙ্গলেও কাউকে ঢুকতে দেয় না। বিভিন্ন কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে সেই জঙ্গলে। দেখো, ত্রিপুরা হচ্ছে রবার চাষ প্রধান একটা রাজ্য। এখন এত বড় অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত একটা জঙ্গল যদি রাজ্য সরকার রবার চাষের জন্য পেয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওদিকটায় আরও উন্নতি হবে। চাকরি সংস্থান হবে। কিন্তু এই পার্মিশান শুধু রাজ্য সরকার দিলেই তো হবে না, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকেরও একটা ইনপুট এতে থাকবে। সেই ইনপুটটা তুমি আমাদের সরবরাহ করবে। সেই হিসেবে বাজেট করা হবে, লাইসেন্সিং হবে। কিন্তু তারও আগে দেখতে হবে সেই জঙ্গলে হাতি-ঘোড়া আছেটা কী যে কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না ওরা। স্থানীয় অফিসারেরা সাহসও দেখায় না। যারা ভিতরে গেছে তাদের কোনোদিন খুঁজে অব্দি পাওয়া যায়নি। দেখো রামানুজ, আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। আমি তোমার কাজের পদ্ধতি জানি, তাই আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তোমাকেই এই কাজে নিয়োগ করতে চাই।

ত্রিবেদী নিজের চেয়ার বসলেন। চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন। তিনি জানেন রামানুজকে এই প্রোজেক্টে ইন্টারেস্ট নিতে বাধ্য করার মতো লেকচারটা তিনি দিয়ে ফেলেছেন। এবার রামানুজের উত্তর শুনতে তিনি উদগ্রীব। রামানুজ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পেয়ালায় রাখা কফিতে শেষ চুমুকটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "ঠিক আছে। ডিসেম্বরে ওদিকটাতেও খুব ঠান্ডা পড়ে শুনেছি। কিছু নতুন সোয়েটার কিনে আনি।"

স্যালুট করে রামানুজ বেরিয়ে গেল। ত্রিবেদী সাহেব হাসলেন। ওষুধ ধরেছে ভালোই।

.এখন ত্রিপুরায় যাবার ফ্লাইটের অপেক্ষা করছে রামানুজ। দিল্লি থেকে কলকাতা, সেখান থেকে আধ ঘণ্টা পর আবার উড়ান। সরাসরি আগরতলা বিমানবন্দরে নামবে সে।

ফ্লাইটের ঘোষণা হতেই ফ্লাইটের দিকে পা বাড়ায় রামানুজ। সে এখনও জানে না যে কতটা রোমাঞ্চকর হতে চলেছে তার এই যাত্রা।

বেলা দু-টোর মধ্যে দুই বিমানবন্দরের সমস্ত কাজ সেরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পাঠানো গাড়িতে উঠে পড়ল রামানুজ। সরকারের তরফে মিঃ দাসকে নিযুক্ত করা হয়েছিল রামানুজের সমস্ত যত্ন আত্তির জন্য। মিঃ দাসই বিমানবন্দরে তাকে নিতে এসেছিলেন। দাসের হাতে সুন্দর ফুলের তোড়া। ফোন নম্বর আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই বিমানবন্দর থেকে বেরোতেই ওরা একে অপরকে চিনতে পারল। দাসবাবু কান থেকে মোবাইল রেখে সসম্মানে এগিয়ে এলেন, "আসুন স্যর আসুন..."

রামানুজ হাসিমুখে ফুলের তোড়াটা হাত্র নিয়ে চশমা নামাল। চারদিকে তাকিয়ে বলল, "এয়ারপোর্টটা দারুণ!"

দাসবাবু ত্রিপুরার মানুষ। সগর্বে বললেন, "বছরখানেক হল এটা তৈরি হয়েছে। নর্থ ইস্টের বেস্ট এয়ারপোর্ট স্যর।"

রামানুজ চারদিকের বাগান, বিমানবন্দরের ভিতরে বাঁশ বেতের অসাধারণ কারুকার্য দেখে মুগ্ধ। এতক্ষণের ধকল এই নয়নাভিরাম বাগান দেখলে

পলকের মধ্যে কেটে যায়। আরেকবার সেই দৃশ্য মোবাইলে বন্দি করে গাড়িতে উঠে বসল সে।

"কোথায় যাবো এখন?"

"স্যর বাংলোতে।"

"ওই উপজাতি গ্রামটার কাছেই?"

"হ্যাঁ স্যর। গ্রাম থেকে গাড়িতে মিনিট দুয়েকের রাস্তা।"

"আর এখান থেকে যেতে কতক্ষণ লাগবে?"

"ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। দেড় ঘণ্টাও লাগতে পারে।"

"আপনি কি আমার সঙ্গেই থাকবেন?"

"স্যর আমি আপনার সঙ্গেই আছি। বাংলোর একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার। তবে মাঝে মাঝে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এলে আমি শহরে যাবো। তাছাড়া আপনার সর্বক্ষণের সঙ্গী আমি।"

রামানুজ ত্রিপুরায় এসে বাংলায় কথা বলতে পেরে বেশ খুশি হয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে বাংলায় কথা একপ্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছে তার। শুধু হাঞ্জি আর হাঞ্জি!

"এখানে কি সবাই আপনার মতো বাংলাতেই কথা বলে?"

"হ্যাঁ স্যর। তবে আপনার বাংলা আর আমাদের কথ্য ভাষার বাংলায় অনেকটা তফাত আছে। স্থানীয়রা আমরা এই বাংলাটাকে বলি খাস বাংলা, ঢাকার বাংলার সঙ্গে মিল রয়েছে এই ভাষার। তবে মূল পার্থক্য যেটা সেটা হল অ্যাক্সেন্টে। আমরা যখন কলকাতার বাংলা বলি একটা টান থেকে যায়। হ্যাঁ, যারা অ্যাক্সেন্টে খুব ভালো তাদের ক্ষেত্রে বোঝা যায় না ঠিকই, তবে এই আমার মতো যাদের অ্যাক্সেন্ট এখানকার তাদের শুদ্ধ বাংলায় খাস বাংলা টানটা আপনি ঠিক ধরে ফেলবেন।

রামানুজ হাসল। বলল, "তা বটে। একটু কীরকমভাবে যেন বলছেন আপনি। তবু আমার ভালো লাগছে যে আপনারা এখানে বাংলায় কথা বলেন। হিন্দিতে কথা বলতে হবে না।"

দাসবাবুও এবার হাসলেন। হেসে বললেন, "ও স্যর হিন্দি এখন সব জায়গায় কারণে অকারণে বলে বাঙালিরা। কলকাতার এবার গিয়েও তাই দেখলাম আর আমাদের ত্রিপুরাতেও এখন এই উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

"উপদ্রব?"

দাসবাবু এবার একটু লজ্জাই পেলেন বোধহয়। রামানুজই আবার বলল, "আসলে বাঙালি তো, বাঙালিদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে ভালো লাগে। কোনো ভাষাই উপদ্রব নয়, তবে মার্তৃভাষার প্রতি সহজাত টানটা তো থাকবেই।"

"তা তো ঠিকই স্যর।"

রামানুজ বাকি রাস্তায় কিছুক্ষণ গান শুনল। মাঝে একবার জিগ্যেস করল, "শুনেছি গ্রামটা অদ্ভুত, আপনার কী মত দাসবাবু?

এই প্রথম রামানুজ লক্ষ করল হাসিখুশি দাসবাবুর মুখের রদবদল। একটা কালো ছায়া নেমে এল মুখের মধ্যে। বললেন, "গ্রাম, গ্রামের মানুষজন সবাই অদ্ভুত। মেরে কেটে হাজার লোকের বাস এই গ্রামে। মূল শহরের সঙ্গে তফাত মাত্র দেড় ঘণ্টা। অথচ আজকের দিনেও কেউ মূল শহরে এসে চাকরি বাকরি করে না। জুম চাষই মূল জীবিকা। উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ওরা। এই রাজ্যের বহু মানুষ উপজাতি। এটা আলাদা কোনো ব্যপার নয়। কিন্তু ওই গ্রামের উপজাতিরা সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওদের রুচি সংস্কার সমস্তটাই অতীব তীব্র। এই ট্রাইবটা শুধু এই গ্রামেই রয়েছে, এর বাইরে আর কোথাও নেই। এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর ভীতু গ্রামবাসী আমি জীবনেও দেখিনি।"

"ভীতু?"

"হ্যাঁ, জঙ্গলকে ওরা ভয় পায়। ভয় পায় ওদের দেবতাকে।"

"কে ওদের দেবতা?"

"জানা নেই। ওরা দেবতার মূর্তি দেখতে দেয় না।"

"কী? কী দেবতা তবে কী করে বুঝবো! কত যে গোপন কুসংস্কার রয়ে

চলছে আদিবাসীরা!"

দাসবাবু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়িটা থেমে গেল। ড্রাইভারকে দাসবাবু জিগ্যেস করলেন, "কী অজিত, কী হল?"

"লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

রামানুজ সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কথার মাঝে দাসবাবু লক্ষই করেনি যে সেই গ্রামের কাছে এসে পড়েছে ওরা। দাসবাবু একবার বাইরে তাকিয়ে বললেন, "আমরা প্রায় এসে গেছি স্যর। ওরা ওই অদ্ভুত গ্রামেরই বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ওদের জঙ্গলের ভাগ্য নির্ধারণ করতে আসছে এটা ওরা জানে। তাই হয়তো..."

রামানুজ এসব ঘটনা আগেও দেখেছে। তার কাছে এসব নতুন কিছু না। সে গাড়ির লক খুলে ফেলল। তা দেখে দাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "আরে স্যর করছেন কী? ওরা ক্ষেপে আছে। আপনি গাড়ি থেকে বেরোবেন না।"

রামানুজ খুব শান্তভাবে তাকে হাত দেখিয়ে নিজে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলল। বাইরে বেরিয়ে এল সে। শার্ট আর জিন্স পরা সরকারি ফরেস্ট অফিসারকে প্রথমবার দেখল এই গ্রামের অধিবাসীরা। তার জন্যেই এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল তারা। তারা শুনেছে এই অফিসারের কলমের উপরেই নাকি জির্ভর করছে তাদের জঙ্গলের ভবিষ্যৎ। এত সহজে যে তারাও তাদের আরাধ্য অরণ্যদেবকে দিয়ে দেবে না, তা বোঝাতেই এই রাস্তা ঘেরাও।

রামানুজ গাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল সামনে। বাধ্য হয়ে দাসবাবু আর ড্রাইভার অজিতও গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। রামানুজ এগিয়ে যেতে একজন গ্রামবাসী এগিয়ে এল। মাথায় উপজাতি টুপি, তাতে ময়ূরের পালক গোঁজা রয়েছে। দেহ নিরাভরণ, কটিদেশে সাদা ধুতি। গলায় বিভিন্ন রঙিন পুঁতির মালা।

"ওয়েলকাম ওয়েলকাম।"

রামানুজের চোখ ছোটো হল এই অভ্যর্থনায়। কিন্তু প্রথা মাফিক সে হাত জোর করে নমস্কার করল। লোকটাই সম্ভবত এই গ্রামের মোড়ল। মুখে চোখে উপজাতিদের সহজাত সৌন্দর্যের বদলে তার বলিরেখায় বীভৎসতাই প্রকট।

"আপনারা কি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর বলল, "হ্যাঁ স্যর, আপনার জন্যেই আমরা জমায়েত হয়েছি। আমরা দেখতে চাইছিলাম আমাদের জঙ্গল, জঙ্গলের দেবতা আর আমাদের ভবিষ্যৎ কার হাতে নির্ভর করছে।"

এবারে লোকটা কেটে কেটে কথাগুলো বলল। রামানুজ তার পিছনে ফুঁসে-ওঠা জনতার ভিড় দেখে নিল। তারপর বলল, "অকারণেই ব্যস্ত হচ্ছেন আপনারা। আমি সময় মতো নিজেই দর্শন দেবো। রাস্তায় অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে ঘরে ঢুকে কথা বলে আসবো। এখন রাস্তাটা ছাড়ুন।"

লোকটা রামানুজের এরকম ডাকাবুকো উত্তর আশা করেনি। সে ভেবেছিল রামানুজ ভয় পাবে ভিড় দেখে। সে এবার অন্য রাস্তা নিল।

"আমাদের তো সরিয়ে দেবেন। দেবতাকে তো সরাতে পারবেন না। জঙ্গল নিয়ে বেশি উৎসাহ দেখালে দেবতার ভোগে পরিণত হতে হয়।"

রামানুজ এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল, যেন লোকটা খুব হাসির কথা বলেছে। তারপর হাসতে হাসতেই গাড়ির দিকে ফিরে গেল। দাসবাবুকে বলল, "চাবিটা দিন তো। আপনারা পিছনে বসুন। আমি এগোই।"

দাসবাবু আমতা আমতা করছিলেন। রামানুজ এবার একটা ধমক দিল।

"কই চাবি দিন।"

অজিতকে ইশারা করতে সে চাবিটা এগিয়ে দেয়। রামানুজ গাড়িতে উঠে বসে। দাসবাবু আর অজিত পিছনে উঠে পড়ে। রামানুজ গাড়ি স্টার্ট করে। শান্ত পাহারি রাস্তায় ইঞ্জিনের বিকট শব্দ হয়। তারপর গাড়িটাকে ব্যাক গিয়ারে নিয়ে একটু পিছনে যায় সে। গ্রামের মোড়ল স্থানীয় লোকটা দ্রু

কুঁচকে সমস্ত দেখছিল। বাকি গ্রামবাসীদের মধ্যেও ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। ওরা নিজেরা রাস্তা প্রায় আগলে দাঁড়িয়ে আছে। খেলনা গাড়িও গলার রাস্তা নেই।

রামানুজ ইঞ্জিন চালু রেখেই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে।

"অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশ ফোর্সকে খবর দিয়ে দিচ্ছি। যারা আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন তারা যদি কেউ চাপা পড়েন বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে অসুবিধে হবে না।

কথাটা শেষ করে আর দেরি করল না সে। গাড়ি সোজা চালিয়ে দিল। গ্রামবাসীর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মোড়ল একজন ফরেস্ট অফিসারের এহেন আচরণ আশা করেনি। গাড়ি এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে। রাগে ক্ষোভে মোড়ল চোখ বন্ধ করে তড়িদগতিতে চোখ খুলল। নির্দেশ দিল, "রাস্তা ছেড়ে দাও।"

গ্রামবাসীদের কেউ কেউ রুখে দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মোড়লের কথার উপর আর কথা চলে না। জায়গা ছেড়ে দিল ওরা। রামানুজের গাড়ি দ্রুতবেগে তাদের পেরিয়ে চলে গেল বাংলোর দিকে। মোড়ল রাস্তার উপর থুতু ফেলে নিজের ক্ষোভ মেটালেন।

এদিকে দাসবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রামানুজ কাচের মধ্যে এটা দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কী দাসবাবু, এতেই ঘেমে নেয়ে গেলেন?"

দাসবাবু কষ্টে হাসলেন।

"এসেই যা খেল দেখালেন! না এবার আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এই গ্রামবাসীদের খেল এবারেই খতম।"

"অতি আত্মবিশ্বাসী হবেন না। ওরা ঠিক ছোবল মারবে আমাকে। যাই হোক আর কতটুকু?

"এই তো এসেই গেছি।

দাসবাবুর দেখানো একটা ডানহাতের মোড়ে মিনিট খানেক এগিয়ে গাড়ি

থামল। ছিমছাম সরকারি বাংলো। গাড়ি ভিতর ঢুকতেই দু-জন লোক এগিয়ে এল। একজন বাঙালি পুরুষ, পঞ্চাশের ওপারে বয়স। দাসবাবু বললেন, ''ইনি হচ্ছেন রাধামাধব। দারুণ রান্না করেন।''

রামানুজের চোখ ছিল অন্য লোকটার উপর। লোক না বলে যুবক বলাই ভালো।

দাসবাবু বললেন, ''এ হচ্ছে কাঞ্চন। এই গ্রামের প্রথম অধিবাসী যে গ্রামের জুম চাষের বাইরে কিছু করার কথা ভেবেছে। এই বাংলোর কেয়ার টেকার সে।''

রামানুজ কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দাসবাবুর দিকে তাকাল। দাসবাবু কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেন বিষয়টা।

''এই স্যারের লাগেজগুলো স্যারের রুমে দিয়ে আয়।''

কাঞ্চনকে নির্দেশ দিয়ে রামানুজের কাছে এলেন তিনি। বললেন, ''গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকলেও ওদের মতো নয় সে। এখানের খবর ওখানে পাচার করবে না। বিশ্বস্ত ছেলে।''

রামানুজ তখনকার মতো সম্মতি দিল মাথা নেড়ে। তারপর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বাংলোর চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল। পিছনে দাসবাবু সমস্ত কাজ কর্ম সমাধা করতে লাগলেন।

রামানুজ দেখল বাংলোটা আসলে একটা উঁচু টিপি কেটে তৈরি করা হয়েছে। মূল রাস্তা থেকে তাই অনেকটা উঁচুতে রয়েছে এই বাংলো। যেখানে গ্রামবাসীরা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটাও এই উঁচু বাংলো থেকে কিছুটা দেখা যায়। গাছপালার ফাঁকে অবস্থানটা বোঝা যায়। রামানুজ লক্ষ করল কিছু গ্রামবাসী তার বাংলোর আশেপাশে ধীর পায়ে এসে তার দিকে লক্ষ রাখছে।

''দাসবাবু, ও দাসবাবু।''

দাসবাবু উপর থেকে নেমে এলেন।

''বলুন স্যার।''

"আমার যন্ত্রটা একটু দিন তো।"

দাসবাবু অদ্ভুতভাবে তাকালেন তার দিকে।

"কই দিন।"

দাসবাবু দৌড়ে বাংলোর উপর তলায় উঠে গেলেন। তারপর নিয়ে এলেন যন্ত্রটা। রামানুজ সেটা হাতে নিলো। রামানুজের সার্ভিস রিভলভার। তারপর আকাশের দিকে উঁচু করে ফায়ার করল। গাছের ডালে যত পাখি ছিল সব ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল। আর দৌর লাগাল বাংলোয় চোখ-রাখা কতিপয় গ্রামবাসী।

"ওই দেখুন।"

দাসবাবুকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল রামানুজ। আর সেই গুড়গুড়িয়ে গ্রামবাসীদের দৌড় দেখে তার কী হাসি। দাসবাবুও একসময় হেসে দিলেন।

"স্যার আপনি পারেন বটে। নিন এখন চলুন, লাঞ্চটা করে নিন। রাধামাধবের হাতের রান্না খেলে ভুলবেন না কোনোদিন।"

"চলুন চলুন।"

বাংলোর দিকে মুখ করে ফেরাতেই কাঞ্চনকে দেখতে পেল তারা। অদ্ভুত চোখে তাদের দেখছে সে। মূলত কাঞ্চনের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে রামানুজের রিভলভারের দিকে।

দাসবাবু অস্বস্তি কাটাতে বললেন, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন? খাবারের ব্যবস্থা কর জলদি। স্যার খাবেন এখন।"

সেদিনে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। হঠাৎ ঝুপ করে সন্ধে নেমে গেল। সম্পূর্ণ পাহারি অঞ্চল কুয়াশার চাদরে ঢেকে এক সময় হারিয়ে গেল।

* * * * * * * * * * *

(৩)

গ্রামটা এমনিতেই অন্ধকারে ডুবে থাকে। তার উপর অমাবস্যার রাত হলে তো আর কথাই নেই। চারদিকে জনপ্রাণী বিশেষ কেউ থাকে না। এই গ্রামে আলাদাভাবে নজরদারি করার কেউ নিযুক্ত নেই। আর যদি থেকেও থাকে এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।

গ্রামবাসীরা একে একে নিজের কুড়ে ঘড় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। রাত তখন তিনটে। গ্রামের ঠিক মাঝখানের অংশটায় একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে আসনে বসে আসেন এই গ্রামের হামন্তাই। হামন্তাই শব্দের অর্থ যিনি পুজো করবেন। শুভ্র সাদা বসনে তিনি যজ্ঞ কুণ্ডের আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন। ঠিক সামনেই রয়েছে এই গ্রামের আরাধ্য দেবতার মন্দির। একে একে গ্রামবাসী এসে জড় হতে শুরু করল। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ওরা এবার সমগ্র পূজা পদ্ধতির প্রয়োগ দেখবেন। হামন্তাই তার সামনে পোঁতা বিভিন্ন গাছের ডালের পুজো শুরু করেছেন। দু-জন সহকারী রয়েছে হামন্তাইয়ের পাশে। সে মাঝে মাঝে শিঙার মতো দেখতে একটা বাদ্যযন্ত্রে ফুঁ দিচ্ছে। ফলে তা থেকে জোরালো শব্দ বেরুচ্ছে। অপর সহকারী একইরকম দেখতে আরেকটি যন্ত্রে ফুঁ দিচ্ছে, তা থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। এর মাঝেই হামন্তাই তার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় গাছেদের পূজার্চনা করছে। পূজাপোকরণে রয়েছে ঘী, মধু, দুধ, ফল, বনজ ফুল এবং বিভিন্ন প্রকার গাছের ডাল।

কিছু সময় পর গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে কিছু মানুষ এসে উপস্থিত হল। তাদের বেশভূষা সৈনিকদের মতো। ওদের হাতে রয়েছে অস্ত্র শস্ত্র। কারো হাতে কুঠার, কারো হাতে তীর ধনুক, কারো হাতে ধারালো অস্ত্রাদি। ওরা জঙ্গলের দিকে মুখে করে এবং অস্ত্র তাগ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের

উদ্দেশ্য ঠিক কী, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ওরা উপস্থিত তা বোঝা গেল না। ওরা আসতেই গ্রামবাসীরা কয়েক কদম পিছিয়ে গেল।

সকলের নজর তখন হেমন্তাই-এর উপর। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তার হাতে একটা ছোট ঝুড়ি। ঝুড়ির মুখ বন্ধ। সহকারিরা ততক্ষণে তড়িদগতিতে শিঙায় ফুঁ দিচ্ছে। অগ্নি এবং শব্দ তেজিয়ান হচ্ছে। যজ্ঞের আগুনের লেলিহান শিখা ততক্ষণে প্রায় দশ ফুট উপরে উঠে গেছে। শীতের রাতেও হেমন্তাই সহ সকলে দরদর করে ঘামছেন। সিপাহীরা অত্যন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ চোখ রেখেছেন জঙ্গলের দিকে। ঠিক এমনই এক সময়ে হামন্তাই ঝুড়ির ঢাকনা খুলে দিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডে ঝড় ঝড় করে কিছু একটা পড়ল। পটপট শব্দ হতে লাগল অগ্নিকুণ্ড থেকে। অগ্নিশিখা আরও বড় আকার নিল। রুক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে হামন্তাই তাকিয়ে রইলেন শিখার দিকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধে চারদিক ভরে উঠল। সমস্তগ্ঘগ্রামবাসী নিজের নাক চেপে ধরল। সৈনিকেরা তাদের শিরস্ত্রানের সঙ্গেই একটি কাপড় বেঁধে এনেছিলেন। সেটা দিয়েই নাক ঢেকে নিলেন। এরপর শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই। কীসের অপেক্ষা কেন অপেক্ষা বোঝা গেল না। হেমন্তাই মন্দির কক্ষের বাইরে একটা পাথরের তৈরি উঁচু আসনের উপর বসলেন। তার সহকারিরা আগের মতোই শিঙায় ফুঁ দিতে থাকল।

এভাবে কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা সময়। এগুনের রেখা ধীরে ধীরে নীচে আসছে। গন্ধবপ্রায় সহ্য হয়ে এসেছে সবার। তবুও কেউ মুখে থেকে কাপড় সরায়নি। অমাবস্যার নিশুতি রাতকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানের উপাচার এক অন্য মাত্রা যোগ করছে।

গ্রামের বাচ্চাদের ঝিমুনি আসছে। কিন্তু তাদেরকে মাতা পিতারা কাছ ছাড়া করছে না। সবাই অপেক্ষা করছে এক ভয়ংকর মুহূর্তের। এই মুহূর্ত কেটে গেলে আবার অনেক দিনের শান্তি।

আগুনের শিখার তেজ কমে আসায় হেমন্তাই তাঁর জায়গা থেকে উঠলেন। কাঠের বড় হাতা দিয়ে ঘি ঢাললেন আগুনে। পোড়া কাঠগুলো আবার ঘিয়ের ছোঁয়া পেয়ে জ্বলে উঠল। সহকারীরা তাতে নতুন জ্বালানি কাঠ দিলে সে আগুন আবাত তেজ ফিরে পেলো। আর ঠিক তখনই জঙ্গল কাঁপিয়ে শব্দটা হল।

শব্দটা হতেই গ্রামবাসীরা ভয়ে আরও কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান গ্রামবাসীদের। তারা জানে আগামী কয়েক মুহূর্ত তাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একদল মানুষ যেন গোঙাচ্ছে। খুব জোরে এই গোঙানি, কিন্তু আর্তনাদ নয়। ক্ষিদে পেলে যেরকমভাবে কোনো জানোয়ার সেই ক্ষিদে প্রকাশ করে, লড়াই শেষে যেভাবে যুদ্ধ জয়ী খুশিতে চিৎকার করে উঠে সেরকম মিশ্র এই গোঙানি। যেন কোনো বোবা জানোয়ার এই প্রথম একসঙ্গে অনেক শিকার দেখতে পেয়েছে। যত মুহূর্ত এগল, তত এই শব্দ বাড়তে থাকল।

সিপাহীরা ততক্ষণে তীর ধনুক থেকে শুরু করে বর্শা, তলোয়ার যার কাছে যে অস্ত্র আছে তা উঁচিয়ে ধরেছে। হেমন্তাই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের দেবতার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছেন। সহকারীদ্বয় শিঙা রেখে দু'টো তলোয়ার নিয়ে মন্দির দ্বারের কাছে পাহারায় ব্যস্ত। আর যাই হোক, নিরস্ত্র হেমন্তাই-কে বাঁচাতেই হবে। তার কিছু হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গ্রামে পুজো বিধি আর কেউ জানে না। হেমন্তাই এই পুজো শেষে পুজো বিধি কাউকে শিখিয়ে তারপর চিরতরে বিশ্রামে যাবেন। পুরো জীবনে এই পুজো একজন একবারেই করতে পারে। আর পুজো শেষের আগে এই বিধি কাউকে শেখানো যাবে না। যদি তা করা হয়, তবে এই পুজোর গুণ নষ্ট হবে অভীষ্ট কখনোই পূর্ণ হবে না।

এদিকে শব্দ বাড়তে বাড়তে চরমে পৌঁছেছে। যে কোনো সময় দেখা যাবে এই তীব্র গোঙানির উৎস। আর বেশি অপেক্ষা করতে হল না।

উপস্থিত হল শব্দের উৎসরা। একজন দু-জন নয়। বারোজন উৎস, বারোজন মানুষ। আদৌ মানুষ ওরা!

জঙ্গলের এক কোণায় এসে জমা হয়েছে ওই প্রাণীগুলো। দেখতে অবিকল মানুষের মতো। দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ ইত্যাদি। শুধু ভাবখানা পশুর মতো। পরনে এক খণ্ড কাপর, সাদা রঙের। সাদা আলখাল্লাওকে এরকম্ভাবে পরেছে ওরা যেন ডান হাতটা উন্মুক্ত থাকে। যোখ মুখে ওদের জান্তব অভিব্যক্তি। প্রত্যেকে প্রায় পশুর মতো তাকিয়ে আছে সমস্ত গ্রামবাসীর দিকে। সিপাহীরা সবাই ততক্ষণে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা মানুষের রক্ত পান করতে ইচ্ছুক। সিপাহীরা সে কাজে বাঁধা দিতে গেছে দেখে ওরা গোঙানি বাড়িয়ে দিল। লাল বিস্ফারিত চোখ থেকে যেন রক্তের মতো জল গড়াচ্ছে। হাত-পাগুলো সাদা সাদা ছোপ ছোপে ভর্তি। ওদের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বীভৎস লাগছে ওদের দেখতে। শরীর মুচরে ওরা এগিয়ে আসছে সামনে।

হেমন্তাই মন্দিরের ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "নিধন।"

সিপাহীরা যেন এই নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হই হই চিৎকার করে ওরা এগিয়ে গেল ওই মনুষ্যরূপী শয়তানগুলোর দিকে। বারোজনের চারজন তীরে বিদ্ধ হল। তীরগুলো লাগল মাথার ঠিক মাঝখানে। লুটিয়ে পড়ল চারজন। বাকি আটজনের গায়ে তীর লাগল, মাথায় লাগল না। ওদের কিছুই হল না সেরকম। শুধু যন্ত্রণায় তীব্রভাবে চিৎকার করে সামনে যে সিপাহীদের পেল তাদের আক্রমণ করল ওরা। তলোয়ার দিয়ে দু-জন সিপাহীর মাথা কেটে ফেলল বটে, কিন্তু তৃতীয়জনের মাথা কাটার আগেই তার গলায় কামর বসিয়ে দিল একটা জানোয়ার। এক সিপাহীর বর্ষা কেড়ে নিয়ে তার বুকেই ঢুকিয়ে দিল অন্য এক মনুষ্যবেশি জানোয়ার। তারপর মাটিতে বসে তার ঘাড়ে কামড় বসাল সে। এরই মধ্যে অন্য একজন সিপাহী এসে তার মাথা বরাবর ঢুকিয়ে দিল একটা বর্ষা। সে বর্ষা শয়তানের মুণ্ডিত মস্তক ভেদ করে

পৌঁছালো নীচে কামরে ধরা সিপাহীর চোখে। চিৎকার করে উঠল দু-জনেই। মানুষ সিপাহীর মৃত্যু ঘটল তৎক্ষনাৎ। জানোয়ারটা কাতড়াতে কাতড়াতে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকল চার সিপাহী আর এক শয়তান। অন্য এক সিপাহী বেঁচে ছিল কিন্তু ঘাড়ে অসহ্য কামর নিয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

যে শয়তানটা বেঁচে গেল সে জঙ্গলের সীমা টপকে গ্রামের সীমায় প্রবেশ করল। চারজন সিপাহী দৌড়ে এসেও তাকে ধরতে পারল না। গ্রামবাসী ভয়ে অনেকটা পিছিয়ে গেল। হেমন্তাই চিৎকার করে বললেন, "কেউ হুলস্থুল করবেন না। সব মরেছে, এটাও মরবে।"

শয়তানটা ঠিক মন্দিরের সামনে এসে থামল। হেমন্তাই উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরের পাহারায় থাকা দুই সহকারি তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শয়তান এবার স্থির হল। চারদিকে তাকাল সে। যারা জীবনে প্রথম এই দৃশ্য দেখছে তারা দেখল এ মধ্যবয়সী এক মনুষ্যই বটে। তবে এর আচরণ আর বোধবুদ্ধি অন্য মানুষের মতো নয়। এ যেন এক যন্ত্রমানব। এর নিয়ন্ত্রক আর সেই মস্তিষ্ক নয় যে মস্তিষ্ক নিয়ে সে জন্মেছিল। এক নিয়ন্ত্রক এখন অন্য কেউ। তাই এই সম্পূর্ণ মানুষটা পালটে পরিণত হয়েছে শয়তানে। এর চোখে মণি সাদা, এর শরীর হাড়গোড় প্রায় সমস্তই ভাঙা। তবুও এ দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও এ সমস্ত দেখছে। এর গায়ের জোর এতক্ষণ সবাই দেখেছে। বাকি শয়তানদের থেকে এ অনেক বেশি সুচতুর। প্রায় সমস্ত সিপাহীর মৃত্যুর কারণ এই শয়তানটাই। সবাইকে শেষ করে এ এখন হেমন্তাইকে মারার কথা ভাবছে। তাতে আগামীদিনে আর কেউ তাদের উপর নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তাও করতে পারবে না। ক্রিয়া চলাকালীন হেমন্তাইয়ের মৃত্যু মানে এই শয়তানদের অমর হয়ে যাওয়া।

শয়তানটা ইলাস্টিকের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। সিপাহীরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সবার হাতেই তলোয়ার। তীর ধনুক বা বর্শাধারী সকলেরই মৃত্যু ঘটেছে। এখনও সবাই

নাকে মুখে কাপড় দিয়ে রেখেছে। গ্রামবাসীরাও সারা মুখে কাপড় জড়িয়ে রেখেছেন।

গ্রামবাসীদের দিকে চেয়ে-থাকা অবস্থাতে ঠিক উলটোদিকে যেখানে মন্দিরের ভিতর হেমন্তাই আছে সেদিকে লাফ দিল শয়তানটা। সহকারীদ্বয় বুঝতেও পারল না। কারণ ওরা ভাবছিল শয়তানটা গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে আছে। রবারের মতো উলটোদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে যে তাদের আক্রমণ করবে তা ওরা মুহূর্তের অসতর্কতায় ধরতে পারেনি। তারই খেসারত দিতে হল একজনকে।

মুহূর্তের মধ্যে একজনের তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তা ঢুকিয়ে দিল অন্যজনের গলা বরাবর। কণ্ঠনালী দুই ভাগ হয়ে যাওয়ায় চিৎকার অব্দি করতে পারল না সে। মন্দির প্রাঙ্গণে পড়ে কাতরাতে লাগল। অসহনীয় দৃশ্য! অন্যজন নিরস্ত্র অবস্থায় ছিল। সিপাহীরা ছুটল তাকে বাঁচাতে। ওদিকে হেমন্তাই তখন একা মন্দিরের ভিতরে। দ্রুততার সঙ্গে তিনি মন্দিরের লোহার দরজাটা লাগানোর চেষ্টা করলেন। এখন বীরত্ব দেখানোটা মূর্খামি হবে সেটা তিনি জানেন। কোনো কারণে তিনি আহত হলে, সমস্ত কিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে। শয়তানটা সেদিকেই ধেয়ে গেল। দ্বিতীয় সহকারী কোনো উপান্তর না দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জড়িয়ে ধরল শয়তানটাকে। গ্রামবাসীদের অনেকে চিৎকার করে উঠল, "ধরো না ওকে, ধরো না ওকে।

কিন্তু হেমন্তাইকে বাঁচাতে হলে শয়তানকে আটকানো জরুরি ছিল। ততক্ষণে সিপাহীরা চলে এল। শয়তান ঘাড় ঘুড়িয়ে প্রথমেই সহকারীর মাথায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। সে তার শেষ কার্যটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আঘাতে মৃত্যু হল তার। ততক্ষণে সিপাহীরা আর কাল বিলম্ব না করে শয়তানের মাথায় আঘাত করল। পরপর চারটে তলোয়ার কোপ এসে পড়ল মাথায়। মস্তক চারভাগ হয়ে তরমুজের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সগর্বে চিৎকার করে উঠল সিপাহীরা। গ্রামবাসীরাও উল্লাসে ফেটে পড়ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন হেমন্তাই। কিন্তু খুশির দমকে গা

ভাসালেন না। মন্দিরের লোহার দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। প্রাঙ্গণে পড়ে-থাকা রক্তাক্ত একটা তলোয়ার তুলে নিলেন। একবার তাকালেন মাটিতে পড়ে থাকা শয়তানটার দিকে। সাদা পোশাকের উপর টাটকা রক্তের দাগ মিশে গিয়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মৃতদেহটা। অগ্নিকুণ্ডের আলো পিছলে পড়ছে সেই রঙে। তলোয়ার হাতে চারদিকে তাকালেন তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে সমস্ত মৃতদেহ।

গ্রামবাসীদের চোখে এখন খুশির ঝলক। তাদের উদ্দেশ্যে হেমন্তাই বললেন, "বিজয়ম।"

ব্যস, আর দেখতে হল না। পুরো গ্রাম একত্রে হুল্লোর করে উঠল। গর্জন উঠল গ্রামে।

"বিজয়ম, বিজয়ম, বিজয়ম।"

সবাই গর্জে ওঠার পর হাত দেখিয়ে থামতে বললেন হেমন্তাই। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে সমস্ত মৃতদেহের সামনে গেলেন তিনি। প্রত্যেকটা মৃতদেহ পরখ করে দেখবেন এখন। পরখ করতেই করতেই বললেন, "কেউ মুখ থেকে কাপড় সরাবেন না। শয়তানগুলো মরেছে, জীবাণু মরেনি। ডোমদের ডাকুন আর যারা পরিষ্কার করবেন জায়গাগুলো তারাও এগিয়ে আসুন। আপনাদের জন্য বরাদ্দ পোশাক পরিধান করে এগিয়ে আসুন।"

কথা বলছেন আর একটা একটা করে মৃতদেহ উলটে পালটে দেখে অপরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছন পিছন সিপাহীরাও যাচ্ছে তাঁর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে। হেমন্তাই বললেন, "সিপাহীরা, তোমরা হচ্ছ এই যুদ্ধে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা। তোমরা আছো বলেই আমরা আছি। কিন্তু এই যুদ্ধের শেষে আমাকেও কিছু অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়। তোমরা যারা বেঁচে আছো তারা একটু নিজের শরীর পরীক্ষা করো। কোথাও কোনো কাটা বা ক্ষত আছে কি? থাকলে আমাকে জানাও, আমাকে দেখাও। তলোয়ারের ক্ষত হলে কিছু হবে না, শয়তানগুলোর দাঁত

বা নখের আঁচড়ের ক্ষত থাকলে আমাকে দেখাও। শুশ্রূষা করে দিচ্ছি।

সিপাহীরা প্রত্যেকেই একবার করে নিজের সর্বাঙ্গ দেখে নিল। তারপর জানাল, "না হেমন্তাই। আমাদের গায়ে জানোয়ারগুলোর দাঁত বা নখের কোনো ক্ষত নেই। যে ক্ষতগুলো আছে সেগুলো যুদ্ধকালীন তলোয়ার বা বর্ষা লাগার ক্ষত। সেগুলো আমাদের নিজেদের অস্ত্রের দ্বারা হয়েছে।"

হেমন্তাই নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তখনই কিছু দূরে শুয়ে থাকা এক সিপাহী, যাকে একটা শয়তান কামড়ে দিয়েছিল সে অনেক কষ্টে কথা বলল, "হেমন্তাই, আমার শুশ্রূষা করুন। আমাকে কামড়েছে ওরা।"

হেমন্তাই সজাগ হলেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। বাকিরাও এগিয়ে গেল। সত্যিই খুব বাজেভাবে কামড়ে দিয়েছে ওই শয়তানগুলো ওকে। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষতস্থান দিয়ে। হেমন্তাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "শরীরে কীরকম অনুভূতি হচ্ছে তোমার?"

সেই সিপাহী তার বুজে আসা গলায় বলল, "মাথাটা ঘুরছে। মনে হচ্ছে রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে আমার।"

"হুম! তোমার ওষুধের প্রয়োজন। তুমি কি উঠতে পারবে নিজে থেকে নাকি কেউ ধরলে সুবিধে হবে!"

"চেষ্টা করছি হেমন্তাই, একা উঠতে চেষ্টা করছি।"

"হ্যাঁ, আসলে তুমি ওদের সংস্পর্শে এসেছো তো, তাই তোমাকে এই মুহূর্তে ছোঁয়াটা উচিত হবে না।"

হেমন্তাই কথা শেষ করে অপেক্ষা করতে লাগল। সিপাহী অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। তার কাঁধ অনেকটি বেঁকে গেছে। তার যে কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে তা বোঝা যাচ্ছিল। ঘাড়ের অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলুন হেমন্তাই।

হেমন্তাই গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ফিরে তাকালেন। তারপর বললেন, "সবাই শুনুন। যদি কখনো কোনো শয়তান দুর্ভাগ্যবশত আপনাকে কামড়ে দেয় বা তাদের রক্ত আপনাদের কারো রক্তে মিশে যায় তবে তৎক্ষনাৎ

বাকিরা তাকে এই শুশ্রূষাটা দেবেন যেটা আমি এখন আমাদের এই বীর সিপাহীকে দেবো। মনে রাখবেন এটাই একমাত্র শুশ্রূষা। এর বাইরে আর কোনো ওষুধ কাজ করবে না।"

গ্রামবাসীরা এক বাক্যে বলে উঠল, "ঠিক আছে হেমন্তাই।"

ক্ষত চিহ্ন নিয়ে সিপাহীটি পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল এসব। জীবনে প্রথমবার তাকে দেখিয়ে কেউ কিছু নির্দেশ দিচ্ছে দেখে গর্বে তার বুকটা বড় হচ্ছিল। ব্যথা সহ্য করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল হাসি হাসি মুখ করে। কিন্তু হাসিটা ঠিক মতো ঠোঁটে আনার আগেই হেমন্তাইয়ের ধারালো তলোয়ারের আঘাতে তার মাথাটা ধর থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ধর ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

এক ঝটকায় সম্পূর্ণ গ্রাম আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই, সামান্য আবেগটুকুও আসার অবকাশ মিলল না। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এই বিপর্যয়, তাও খোদ হেমন্তাইয়ের হাতে। হেমন্তাই তলোয়ারটা রেখে দিলেন মাটিতে। তারপর বললেন, "তাহলে বোঝা গেল শুশ্রূষা! শয়তানের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত যেকোনো মানুষের একটাই শুশ্রূষা, তাকে যথা শীঘ্র মস্তক ছেদন করে হত্যা করো। না হলে সেও একটা শয়তানে পরিণত হবে। আর এই পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হয়। এই জীবাণু একবার কারো রক্তে প্রবেশ করলে সেই ব্যাক্তিকে আমরা মৃত বলে ধরে নেবো। তখন তাকে মারতে আমাদের আর হাত কাঁপবে না। আর যদি আমরা তা না করতে পারি, এই গ্রাম হোক বা এই শহর বা এই মানবসভ্যতা "কোনোটাই শেষ হতে বেশি দেরি লাগবে না। আমি কি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি।"

হেমন্তাই কথা শেষ করার পরেও গ্রামবাসী আগের মতো উচ্ছ্বাস আর দেখাতে পারল না। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রত্যেকের মনই উদ্‌বেল হয়ে পড়েছে। আবেগশূন্য দৃষ্টি নিয়ে শুধু মাথা নাড়ছে সবাই। হেমন্তাই ব্যপারটা ধরতে পেরে এবার গর্জন করে উঠলেন, "এবার সম্পূর্ণ বিজয়ম।

বিজয়ম!”

এবার সকলের সম্বিত ফিরল। সকলে তারস্বরে গর্জন করলেন, “বিজয়ম। বিজয়ম। বিজয়ম।”

হেমন্তাই মন্দিরে ফিরে গেলেন। পরবর্তী দু-ঘণ্টায় ডোমেরা প্লাস্টিকের পোশাকে এসে দাহ কার্য শুরু করল। গ্রাম পরিষ্কারের দায়িত্ব যাদের হাতে তারা প্লাস্টিকের পোশাক এবং মুখোশ পরে গ্রাম পরিষ্কার শুরু করলেন। ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে এল।

যখন শ্মশানে প্রায় সমস্ত চিতা জ্বলে উঠল হেমন্তাই পুনরায় গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, “এবারে সময় উপস্থিত। ওদের নিয়ে আসুন।”

শ্মশানক্ষেত্র খুব দূরে নয়। গ্রামেরই এক অংশে এই শ্মশান। এতগুলো মৃতদেহ চিতায় জ্বলছে। ফলে চারদিকে ধোঁয়া বাড়তে লাগল। এরই মধ্যে হামন্তাইয়ের নির্দেশ পালনের প্রস্তুতি শুরু হল। ইতিমধ্যে বারোজন উপজাতি তাদের স্বদেশীয় বেশভূষায় উপস্থিত হল। কটিদেশে রামধনু রঙের বস্ত্র, উর্ধাঙ্গে উপবিতের মতো পরিহিত এক খণ্ড বস্ত্র, হাতে বাজুবন্ধ, গলায় মালা, মাথায় ময়ুরপঙ্খী টুপি।

হেমন্তাই সবাইকে দেখে নির্দেশ দিল, “আমাদের ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, তাদের সসম্মানে এখানে উপস্থিত করো। আজই ওদের আমাদের সঙ্গে শেষ রাত। মায়ার বন্ধন ত্যাগ করে ওদের যেতে হবে। ওদের প্রাপ্য সম্মানে যেন কোনো ঘাটতি না থাকে। যাও ওদের নিয়ে এসো।”

বারোজন উপজাতি পুরুষ গ্রামের উত্তরদিকে রওনা হল। প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে যাবার পর একটা আবাসগৃহ চোখে পড়ল। সেখানে একজন গুরুদেব অপেক্ষায় ছিলেন। মুণ্ডিত মস্তক সেই গুরুদেব বারোজন উপজাতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। তারপর বললেন, “আপনারা যাদের নিতে এসেছেন তারা তৈরি। সমস্ত শিক্ষায় ওরা শিক্ষিত ও পারদর্শী। ওদের সসম্মানে নিয়ে যান।”

বারোজন উপজাতির প্রত্যেকের কাছে একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল। ছোট একটি

ড্রাম ও বাঁশি। ওরা সেগুলো বাজাতে আরম্ভ করলেন। একই সুর একই তালে বাজতে লাগল প্রত্যেকের বাদ্যযন্ত্র। শব্দ হবার মিনিটখানেকের মধ্যে আবাসন থেকে বেরিয়ে এল বারোজন যুবক। ওদের হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে যে শয়তানদের কিছুক্ষণ আগে হত্যা করা হল ওরা যেন তারাই। সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই সাদা আলখাল্লা, একটা নিরাভরণ। শুধু পার্থক্য এই যে ওরা সম্পূর্ণ মানুষ আর শয়তানগুলো ছিল রাক্ষস। ওদের বরং যুব সাধকদের মতো দেখাচ্ছে।

একেকজন উপজাতির কাছে একেকজন মুণ্ডিত মস্তক যুব সাধক এসে দাঁড়ালেন। আবাসনের গুরুদেব এসে সবাইকে একে একে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সবার উদ্দেশ্য বললেন, "শুভ মস্তু।"

একেকজন উপজাতি একেকজন যুব সাধককে সসম্মানে সঙ্গে নিয়ে সারা রাস্তা ড্রাম ও বাঁশি বাজাতে বাজাতে নিয়ে এল। রাস্তার দু-ধারে গ্রামের মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা এই বারোজন যুব সাধকের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। যতক্ষণ তারা রাস্তায় হেঁটে হেমন্তাইয়ের কাছে পৌঁছালেন ততক্ষণ বাজনা ও পুষ্পবৃষ্টি চলতে লাগল।

হেমন্তাই ওদের দেখে খুশি হলেন। প্রাণ ভরে ওদের দেখতে লাগলেন। ওরা এসে হেমন্তাইয়ের সামনে অগ্নিকুণ্ডের কাছে পাতা বারোটি আসনে বসল। তারপর হেমন্তাই উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ধরে বারোজনকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। একসময় মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দিলেন। আগুন পুনরায় বলবান হয়ে উঠল। লাল শিখা নিয়ে জ্বলতে লাগল আগুন। হেমন্তাই নির্দেশ দিলেন, "ভোজনম।"

এই নির্দেশেরই অপেক্ষায় ছিল যেন সকলে। থরে থরে সাজানো থালা এসে হাজির হতে লাগল যুব সাধকদের সামনে। বারোজনকে বারোটি থালা দেওয়া হল। একেকটি থালার ব্যাসার্ধ যেন পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও বড়। কী ব্যঞ্জন নেই সেই থালায়। নিরামিষ, আমিষ, ফল, মিষ্টান্ন— পৃথিবীর

প্রায় সমস্ত খাবার সেখানে উপস্থিত। পরবর্তী এক ঘণ্টা ওদের খাওয়ার সময় নির্ধারিত হল। যতক্ষণ ওরা খেল ততক্ষণ হেমন্তাই মন্ত্র পড়লেন এবং পুজো দিলেন। দেবতাকে খুশি করতেই এই সমস্ত আয়োজন। দেবতার গ্রাস ও যুব সাধকদের গ্রাস প্রায় একত্রে সম্পন্ন হল।

হেমন্তাই আবার নির্দেশ দিলেন, "মিলনম।"

এবার এই পর্বের সবচেয়ে দুঃখজনক ধাপের শুরু হল। এই বারো যুব সাধকের পরিবারের সকলে এসে একে একে দেখা করতে লাগল এদের সঙ্গে। প্রত্যেকেই প্রায় ছলছল নয়নে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে এই জীবনের শেষ আবেগপূর্ণ কথাগুলো বললেন। বারোজন যুব সাধকদেরও দেখা গেল একটু আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছেন তারা। হেমন্তাই যখন এটা লক্ষ করলেন সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "বিয়োগম।"

হেমন্তাই জানেন সামনে কঠিন সংঘর্ষ। তাই যুব সাধকদের দুর্বল হতে দিলে চলবে না। বিয়োগম বলা-মাত্র পরিবারকে নিষ্কাশিত করা হল ওদের

সামনে থেকে। এবার মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলেন হেমন্তাই। বাইরে এসে দেখলেন বারোজন যুব সাধকের সামনে বারোটি হাড়ি এনে রাখা হয়েছে। তিনি নিজে একটি ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন মন্দির থেকে। হেমন্তাই প্রত্যেক হাড়ির সামনে গেলেন এবং তাতে মিশিয়ে দিলেন ঝুড়ি থেকে বের করা এক মুঠো পদার্থ। এটা যে কী বস্তু তা একমাত্র হেমন্তাইয়েরাই জানেন। বারো হাড়িতে বারো মুঠো মিশিয়ে দেবার পর নিজে এগিয়ে গেলেন প্রত্যেকের কাছে এবং সেই হাড়ির জলে প্রত্যেককে স্নান করালেন নিজ হাতে। এই শীতের সাত-সকালে হাড়ির মিশ্রণে স্নান করে ভিজে একসা হয়ে গেল যুব সাধকেরা। তবুও ওদের দেখে মনে হল না ঠান্ডায় ওরা কষ্ট পাচ্ছে। এরকম আরও অনেক বিদ্যাই ওদের আবাসনে ওদের গুরুদেব ওদের শিখিয়েছেন। এর চেয়ে খারাপ অবস্থাতে থাকার বিদ্যেও এদের রপ্ত আছে।

স্নান কর্ম শেষে হেমন্তাই বারোজনকে প্রণাম করলেন, "প্রস্থানম।"

গ্রামবাসী সকলে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। বারোজন যুব সাধক পিছনে ফিরেও তাকাল না। নিজেদের আসন ত্যাগ করে সোজা জঙ্গলের দিকে রওনা দিলেন তারা। পিছন পিছন অনেকটা দূর অব্দি গ্রামবাসীরা এল, উলুধ্বনির শব্দ শোনা গেল পুরো জঙ্গল জুড়ে। একসময় জঙ্গলের এক কিলোমিটার অঞ্চল ওরা পেরিয়ে আরও ভিতরে প্রবেশ করল। ধীরে ধীরে সাদা ভিজে পোশাক পরিহিত যুব সাধকেরা জঙ্গলে হারিয়ে গেলেন। গ্রামবাসীরাও ফিরে এল গ্রামে।

ফিরে এসে দেখল হেমন্তাই নিজের মাথার হেমন্তাই টুপি খুলে ফেলেছেন। তিনি আর হেমন্তাই রইলেন না। নতুন হেমন্তাইয়ের খোঁজ চলবে এবার।

জঙ্গলের দেবতার সামনে প্রণিপাত হয়ে শুয়ে আছেন প্রাক্তন হেমন্তাই।

* * * * * * * * * *

(৪)

গতকাল বাংলোয় আসার পর থেকে এখনও অব্দি বেরোয়নি রামানুজ। দিল্লিতে গতকাল রাতেই কথা হয়েছে। কথা হয়েছে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গেও। এস পি রাকেশ সিনহা নিজে সরেজমিনে সাহায্য করবেন কথা দিয়েছেন। আজ সকাল থেকেই রামানুজের মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে আছে। নিজের ফরেস্ট অফিসারের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে সে। সামনে যতদূর চোখ যাচ্ছে সবুজের সমারোহ। ত্রিপুরাকে যে পার্বত্য রানি বলা হয়, সে কথা যে মিথ্যে নয় একদিনে বুঝে গেছে রামানুজ। বড়মুড়া পাহার রেঞ্জটা দিনে দিনে আরও ভালো করে দেখতে হবে। খুব সুন্দর এই অঞ্চল। তবে সমস্যা একটাই, মোবাইলের নেটওয়ার্ক সবসময় সমানভাবে থাকে না। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে অসুবিধে হচ্ছে।

বাংলোর বাইরে ব্রেকফাস্ট টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই বসে আছে রামানুজ। দাসবাবুও চলে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। ভদ্রলোককে আসা ইস্তক ফর্মাল পোশাকেই দেখে আসছে রামানুজ। এত ফর্মালিটির মধ্যে থাকলে আসল কাজের ইনফরমেশন পেতে অনেক সময় দেরি হয়। তাই রামানুজ আজ কিছুটা হালকা চালেই কথা শুরু করে।

"গুড মর্নিং দাসদা।"

বসের মুখে দাদা শব্দ শুনে দাসবাবু কিঞ্চিত সংকুচিতই হয়ে গেলেন। বললেন, "গুড মর্নিং স্যর।

"অফ ডিউটি আমাকে রামানুজ বলতে পারেন, অসুবিধে নেই।"

রামানুজ যতই আন্তরিকভাবে বলুক না কেন, দাসবাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন। বললেন, "তা হয় না স্যর। আচ্ছা গতকাল খাবার দাবার ঠিক লেগেছে তো?"

"দারুণ হয়েছিল। পাঁঠার ঝোলটা মুখে লেগে আছে।"

"হ্যাঁ স্যর। এই অঞ্চলে কচি পাঁঠাই পাওয়া যায়। শুধু এখানে নয় পুরো ত্রিপুরাতেই। এখানে খাসির চল নেই বিশেষ।"

"বাহ! তাহলে মাঝে মাঝেই এই ব্যবস্থাটা হোক। আর শুনুন, সারাদিন মানে বাড়িতে থাকলেও যে আপনাকে এরকম ফর্মাল পোশাকে আমার সামনে ঘুরতে হবে তার মানে নেই। অফিস আওয়ারের বাইরে আপনি স্বচ্ছন্দে বাড়ির পোশাক পরতে পারেন। আর এই কথাটাও যদি অনুরোধ করে বলছি মনে করেন তবে ভুল করবেন।"

বলেই একটা কড়া চাহুনি দিল রামানুজ। তাতে দাসবাবু ঢোক গিললেন। দাসবাবুর চেহারা দেখে রামানুজ হাসি আটকাতে পারল না। হেসে উঠল দু-জনেই।

ব্রেক ফাস্ট চলে এল। বেতের ঝুড়ি ভর্তি ডিম টোস্ট, সবড়ি কলা, গ্রীন টি, ক্রিমক্রেকার বিস্কুট। ডিম টোস্টটার স্বাদই আলাদা। সত্যি রাধামাধবের রান্নার হাত দারুণ!

চা খেতে খেতো দাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আজকের প্ল্যান অফ অ্যাকশান কী স্যর?"

রামানুজ মোবাইল ঘাটতে ঘাটতে বলল, "কিছু না। যাবো গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলবো। এটুকুই।"

দাসবাবু কিন্তু রামানুজের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। গতকাল তিনি যা ট্রেইলার দেখেছেন তারপর থেকে ভয়ে আছেন যে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র ঠিক কেমন হতে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বাংলো থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"অজিতদাও বাংলোয় থাকছেন নাকি!" গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করল রামানুজ।

"হ্যাঁ, ওকেও থাকতে বলেছি নীচের ঘরে। আপনার কখন গাড়ির দরকার পড়ে তো বলা যায় না।"

রামানুজ খুশি হল। বলল, "ভালো করেছেন।"

মূল রাস্তা থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে গ্রামে ঢুকতে হল। এত বড় গাড়ি গ্রামের ভিতরে ঢোকা-মাত্র গ্রামবাসীরা যে যা কাজ করছিলেন তা থামিয়ে দিল। গাড়িটার দিকেই ওদের দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হল। রামানুজ সেসবকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। আজ তার কাঁধে একটা রাইফেলও আছে। সেটা সে গাড়ি থেকে নামার সময় কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। পরনেও খাঁটি কেমোফ্লাজ ফরেস্ট অফিসারের ইউনিফর্ম। এই বেশে তাকে দেখে গ্রামবাসীদের কৌতূহল হলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে এল না। সে তার নিজের মতো গ্রামের এ মাথা ও মাথা হেঁটে দেখতে লাগল। পিছন পিছন দাসবাবু হাঁটতে লাগলেন।

রামানুজ দেখল গ্রামের ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ নাভিস্থলে রয়েছে এক মন্দির। উচ্চতায় বড় জোড় কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু, তাতেও একটা ছোট চূড়া বর্তমান। সম্পূর্ণ মন্দিরটা একটা বট বা অশ্বত্থ গাছের নীচে অবস্থিত। বট বৃক্ষটাই মন্দিরটার আচ্ছাদন। মন্দিরের সামনে একটা ছোট প্রাঙ্গণ। মন্দিরের রঙ লাল, এমনকি মন্দির প্রাঙ্গণের মেঝে থেকে শুরু করে সমস্তটাই লাল রঙের। মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল রামানুজ।

মন্দিরের গেট পেরিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকতে যাবে এরকম সময়ে কেউ একজন পিছন থেকে নির্দেশ দিল, "ভিতরে ঢুকবেন না।

রামানুজ থেমে গেলে। পিছনে ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দেখল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গতকালের মোড়ল-স্থানীয় লোকটা। হঠাৎ করে দেখলে তাকে হিন্দি চলচ্চিত্রের ভিলেন ডেনি সাহেবের মতো দেখতে লাগে। শরীরটাও একইরকম পেটানো। সে এদিকেই এগিয়ে এল। তারপর আবার বলল, "আপনি মন্দিরে প্রবেশ করবেন না।"

রামানুজ রোদ-চশমা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

লোকটা যারপরনাই রুষ্ট হয়ে বলল, "আপনি গ্রামের কেউ নন। আমাদের গ্রামবাসী তথা আমাদের জাতের উপজাতি ভিন্ন আমরা দেবতার

মুখ কাউকে দেখতে দিতে পারি না।"

রামানুজ কথাটা হাসিতে উড়াবার কথা ভেবেও সংযত থাকল। হাজার হোক ডিউটিতে আছে এখন। বলল, "স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে এই দেবতা দর্শন পড়ে না?"

লোকটা কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, "আপনার কাজের অংশ নিশ্চয়ই এটা নয়। কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত করার কাজ ভারত সরকার বা ভারতের সংবিধান করে বলে আমি জানি না।"

রোদ-চশমাটা পুনরায় পরে ফেলল রামানুজ। ধর্মানুভূতির উপর কথা চলে না ভারতবর্ষে। এই একটা জায়গায় সবার হাত পা বাঁধা। সে বলল, "ঠিক আছে। সে না হয় না-ই বা দেখলাম। কিন্তু জঙ্গলটা তো দেখতে হবে। জঙ্গল পরিষ্কারও করতে হবে। সরকার তরফে এইটুকু করতে পারি?"

শেষের কথাগুলো যে ব্যাঙ্গাত্মক তা একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে। মোড়ল আজ নিজেকে সংযত করে ফেলেছে গতকালের অভিজ্ঞতার পর। এই অফিসার যে আর যা-ই হোক বাকিদের মতো নয় বা একে যে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যাবে না তা সে বুঝে গেছে। সে বলল, "জঙ্গলে ঢুকবেন না স্যর। তাতে আপনারই অমঙ্গল হবে।"

রামানুজ হাত দেখিয়ে থামাল তাকে, "এটা কি হুমকি? তাও অন ডিউটি অফিসারকে?"

"না স্যর, এটা আপনার খেয়াল রেখেই বললাম। আপনি আমাদের গ্রামে অতিথির মতো। আপনি আমাদের গ্রামের বিষয়ে কিছুই জানেন না। সে জায়গায় আপনাকে হুমকি দেওয়া আমার সাজে না। আপনি নিশ্চয়ই আপনার উর্ধতনের আদেশ মোতাবেক আপনার কাজ করতে এখানে এসেছেন। স্থানীয় হিসেবে আমার দায়িত্ব আপনাকে সাহায্য করা। জঙ্গলে আপনাকে ঢুকতে দিলে, না আপনার সাহায্য হবে না আমাদের। তাই বারণ করছি।"

মোড়ল থামলে রামানুজ গদগদ হয়ে বলল, "উফ দারুণ। এই না হলে আতিথিয়েতা! আপনি যে আমার কথা এভাবে ভেবেছেন ভেবেই আপ্লুত হচ্ছি। কিন্তু আমাকে যে আমার কাজ করতেই হবে।"

লোকটা এবার অনুনয় করতে শুরু করল, "স্যর এই কাজটা করবেন না। অনর্থ হয়ে যাবে। কেউ বাঁচবো না আমরা।"

"তোমাদের কিছু হবে না। আমরা তোমাদের গ্রাম নেবো না। বরং তোমরা এখানে অনেক কর্মসংস্থান পাবে।"

আপনির সহবত ছেড়ে এবার রামানুজ তুমিতে চলে এল। তার আর এসব কুসংস্কার ভালো লাগছিল না। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। রামানুজ একটু জঙ্গলের দিকে মুখ করে হাঁটতেই লোকটা দৌড়ে সামনে চলে এল। হাত জোড় করে বলল, "স্যর, জঙ্গলে যাবেন না। বিপদ আছে।"

"আরে মশাই আমাদের জঙ্গল নিয়েই কাজ। পশুপাখি কিছু এলে এই বন্দুক দিয়েই ঠান্ডা করে দেবো। কই দাসবাবু চলুন। একটু ভিতর থেকে ঘুরে আসি।"

লোকটা এবার উপায়ান্তর না-পেয়ে রামানুজের পা ধরে ফেলল। গ্রামবাসীরাও পিছু পিছু আসছিল। ওরা এই দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল। কয়েকজন স্বাস্থ্যবান উপজাতি গ্রামবাসী মন্দিরের পাশেই একটা কুঁড়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল তৎক্ষনাৎ।

"আপনি ভিতর যাবেন না স্যর। অনর্থ হয়ে যাবে। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি আপনাকে জঙ্গলের ভিতরে যেতে দিতে পারি না।"

রামানুজ দেখল এত আজব সমস্যা। লোকটা পাগল নাকি! জঙ্গলে এরকম কী আছে যার জন্য এত তামাশা করছে লোকটা। এতে করে তার কৌতূহল আর জেদ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। সে লোকটাকে দুই হাত দিয়ে টেনে উঠাবার চেষ্টা করে।

"আপনি পা ছাড়ুন আমার। উঠুন আপনি। এসব কী করছেন! সরকারি কাজে এভাবে বাঁধা দেবেন না। এবার কিন্তু আমি আপনাকে গ্রেফতার

করতে বাধ্য হবো।"

"দয়া করে যাবেন না জঙ্গলে। দেবতা রুষ্ট হবেন। আমাদের মানবসভ্যতার বিনাশ হয়ে যাবে।"

"কী আবোলতাবোল বলছেন। দাসবাবু ওকে তুলুন। নইলে আমি গুলি চালাতে বাধ্য হবো।"

দাসবাবু এসে মোড়লকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তোলার চেষ্টা করলেও তিনি অনড় থাকলেন। রামানুজের পা ধরে বসে রইলেন মাটিতে। রামানুজ এবার বাধ্য হল কাঁধ থেকে রাইফেল হাতে নিতে। মোড়লের দিকে তাগ করে বলল, "আপনি উঠবেন নাকি আমি আপনাকে ঘায়েল করবো?"

"যা ইচ্ছে করুন, আমি আপনাকে জঙ্গলে যেতে দেবো না।"

এদিকে মোড়লের উপর এভাবে বন্দুক তাগ করতে দেখে কয়েকজন শক্ত সামর্থ উপজাতি, যারা একটা কুঁড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল চিৎকার করে এগিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে ওরা ঘিরে ফেলল রামানুজকে। ওদের প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক। গোল বেষ্টনীর ঠিক মাঝখানে রাইফেল হাতে রামানুজ, তার পায়ে জড়িয়ে ধরা মোড়ল এবং কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দাসবাবু। গোল বেষ্টনী করা উপজাতি যুবকের তীরের ফলা তাগ করে আছে রামানুজের মাথা।

মোড়ল চিৎকার করে বলল, "ওরে, তোরা কিছু করিস না।

কে শোনে কার কথা।

"নিজের লোকেদের এভাবে লেলিয়ে দিয়ে ভালোমানুষি করার কী দরকার! অন ডিউটি অফিসারের গায়ে হাত দিচ্ছো তোমরা। পুরো গ্রাম জেলে পঁচবে।"

রামানুজের হুঙ্কারে যুবকদের একজন বললেন, "আমাদের গ্রামের হেমন্তাইয়ের জন্য আমরা প্রাণ অব্দি দিতে পারি, প্রাণ নেওয়া এমন আর কি।"

রামানুজ অবাক হল, "হেমন্তাই, মানে?"

মোড়ল বলল, "ওরে তিনি এসব কিছু জানেন না। তোরা থাম। অস্ত্র সংবরণ কর।"

কিন্তু মোড়লের কথাতে কোনো কাজ হল না। এ এক বিষম পরিস্থিতি। একদিকে পাঁচ উপজাতি যুবক তীর তাগ করে আছে রামানুজের দিকে, অন্যদিকে রামানুজ রাইফেল তাগ করে আছে মোড়লের দিকে, মোড়ল পা আঁকড়ে বসে আছে আর দাসবাবু চারদিকে তাকাচ্ছেন চোখে মুখে ভয় নিয়ে।

ঠিক তখনই গুলির শব্দটা হল। ডুমুর গাছের মাথার উপর এক ঝাঁক পাখি বসেছিল, সবগুলো একত্রে উড়ে গেল। গ্রামবাসী চমকে উঠল। দাসবাবুর হৃদস্পন্দন প্রায় থেমে গেল।

"তোমরা তীর ধনুক হাত থেকে ফেলে দাও। হেমন্তাই মহারাজ আপনি রামানুজবাবুর পা ছাড়ুন।"

এস পি রাকেশ সিনহা ফোর্স নিয়ে এসেছেন। পুলিশ ফোর্স এসে উপজাতিদের তীর ধনুক কেড়ে নিল। মোড়ল লোকটাও এবার পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রামানুজ রাইফেলটা পুনরায় কাঁধে চালান করল।

"সরি স্যর, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।"

রাকেশ সিনহা প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন রামানুজের কাছে। তারপর বললেন, "এরা একটু স্পর্শকাতর নিজের দেবতা ও জঙ্গল নিয়ে। তাই এরকম ঘটনা আকছার ঘটে। তবে এভাবে আপনাকে ঘেরাও করবে জানলে আমি শুরু থেকেই ফোর্স মোতায়েন করে দিতাম। এক্সট্রিমলি সরি স্যর।"

রামানুজের জীবনে এরকম ঘটনা প্রথম নয়। সে সামলে নিয়েছে। বলল, "এসব ছাড়ুন। জঙ্গলে ঢোকার প্ল্যান করছিলাম। ফোর্সও যখন এসে গেছে, চলুন ঢুকে পড়ি।"

সিনহা সাহেব চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে রামানুজকে একটু কিনারে নিয়ে গেলেন, বাকিদের থেকে দূরে। তারপর বললেন, "হুট করে ঢুকে যেতেই পারি ভিতরে। কিন্তু স্যর, আজ হোক বা কাল এই প্রোজেক্ট করতে

হলে গ্রামবাসীদের সাহায্য যে লাগবে আপনি তো জানেনই। আজকে এইরকম মারমুখী একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর জঙ্গলের ভিতরে না-গেলেই ভালো। তবুও আপনি যদি নেহাত যেতে চান তবে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

রামানুজ কথাটা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখল। তারপর ভাবল সিনহা কথাটা মন্দ বলেননি। এমনিতেও এখানে অনেকটা সময়ই থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। যাওয়া যাবে আরেকদিন। সে বলল, "বেশ তবে আরেকদিনই যাবো না হয়।"

সিনহা খুশি হলেন। হাসিমুখে বললেন, "চলুন আগরতলাটা ঘুরে আসি। এই অনভলটাও একটু ঘুরে দেখুন। স্থানীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োজনে কাজে লাগবে।"

"চলুন।"

গ্রাম থেকে বের হবার পথে রামানুজ দেখল মোড়ল আর উপজাতি যুবকদের পুলিশ এক কোনায় আটকে রেখেছে। সেদিকে এগিয়ে গেল রামানুজ।

"ছেড়ে দিন ওদের। সব মিলিয়ে ঘটনাটা ঘটেছে। এক পক্ষকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না।"

রামানুজের এহেন কথায় শুধু এস পি নন, অবাক হল মোড়লও। সিনহা সতর্কবার্তা দিলেন, "স্যারের উপরে ভবিষ্যতে একটা ছোট আক্রমণও যদি হয় এই গ্রামের সবাইকে জেলে পুড়ব। কথাটা যেন মনে থাকে। তারপর সাধের জঙ্গল কে সামলাবে দেখব। কী হেমন্তাইজী, মনে থাকবে তো।"

মোড়ল লোকটাই যে হেমন্তাই রামানুজ এতক্ষণে বুঝে গেছে। সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

রামানুজ শুধু তার দিকে তাকিয়ে একটি কথাই বলল, "যদি সাহায্য করেন আমার তরফ থেকে সমস্ত সাহায্যের হাত বাড়ানো থাকবে। আর যদি না করেন, সেক্ষেত্রেও আমাকে দায়িত্ব করতেই হবে। আপনারা ভাবুন।"

পরপর সমস্ত গাড়ি নিয়ে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। রামানুজ বেরোবার পথে দেখল গ্রামের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর কেয়ারটেকার কাঞ্চন। কাঞ্চনও তাকিয়ে রইল রামানুজের দিকে। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে গেল আগরতলার দিকে।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল। সিনহা সাহেব জাতে মণিপুরি। ঠোঁটের উপর হালকা গোঁফ ও সাবেকী কথাবার্তার ধরন জাতিগত পরিচয় বহন করে বৈকি। রামানুজ এটা খেয়াল করেছে।

সিনহা সাহেব হালকা চালে বললেন, "চলুন ত্রিপুরা ঘুরে দেখি আমরা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পরা যাক।"

রামানুজ আগ্রহ দেখাল। বলল, "খুব ভালো হয়। আর কি বলুন তো, জায়গা শুধু দেখা নয়, আমার টান আছে সেই জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে জানারও। সেরকম যদি কিছু জায়গা থাকে যার স্থান মাহাত্ম্য বা ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় তবে আমি সেইসব জায়গা ঘুরে দেখতে বেশি আগ্রহী।"

দাসবাবুও এই গাড়িতেই উঠেছিলেন। বললেন, "তাহলে তো স্যার এখানে সেরকম অনেক জায়গাই আছে। ধীরে ধীরে দেখা যাবে না হয়। আপনি তো আছেন ক-টা দিন।"

রামানুজ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, তা তো যদ্দিন না সরেজমিনে তদন্ত করে একটু হেস্তনেস্ত করতে পারছি আছিই। আজকেই যা হল, তারপর মনে হচ্ছে এ অঞ্চলে কাজ করাটা সমস্যার। ধরুন আমি জঙ্গল দেখে সার্টিফাই করে দিলাম যে এই জঙ্গল উপযুক্ত। তারপর যেসকল কন্ট্রাক্টর জঙ্গল সাফ করতে আসবে, এরও অনেক পরে যেসব ব্যবসায়ী আসবে তাদেরও তো এইসব আদিবাসীরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে দেবে বলে মনে হয় না। আমি ত্রিপুরার প্রায় সমস্ত রবার বাগানের রিপোর্ট দেখেছি। এর চেয়ে নিরুপদ্রবে ব্যবসা আর কোথাও হয় না। কিন্তু এখানেই তো ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে যাবেন। ফলে আখেরে তো প্রোজেক্টটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ মন বলছে এই অঞ্চল রবার চাষের অত্যন্ত উপযোগী। এত হাজার হাজার

একর অরণ্য বছরের পর বছর নষ্ট হবে, নিদেনপক্ষে চাষবাসের উপযোগীও হবে না শুধুমাত্র অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। না এরকমটা ঠিক হতে দেওয়া যায় না। আপনাদের কী মতামত?"

রামানুজের বক্তব্য শেষে এস পি সিনহা মাথা নাড়লেন। বললেন, "আপনি যা বলছেন তা সর্বোতভাবেই সত্য। কিন্তু আমি আপনাকে বলি, সমগ্র ত্রিপুরায় শুধুমাত্র আমরা এই জঙ্গলটাতেই পেনিট্রেট করতে পারিনি। বাকি সমস্ত উপজাতিরা নিজেদের জায়গায় আমাদের সমস্ত সুবিধেসহ কাজ করতে দিয়েছে। কিন্তু এখানেই আমরা বাঁধা পেয়েছি। এরকম নয় যে বাঁধা পেয়ে আমরা দমে গিয়েছি। আমরা চোরাপথে জঙ্গলে ঢুকেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা ঢুকেছিলেন তাদের কাউকে আমরা আর নিজের চোখে দেখতে পাইনি। আর এখানেই এই গ্রামবাসীদের বক্তব্যকে সমর্থন করার মতো যুক্তি পাওয়া যায়।"

রামানুজ কথার মাঝেই বললেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান, এটা কীভাবে যুক্তি হতে পারে! যদি আমাদের ফোর্সের লোক নিখোঁজ হয়েই থাকেন তবে সেটা নিয়ে তদন্ত হল না কেন? এই গ্রামবাসীরাই তো খুনি সাব্যস্ত হতে পারে। তাই নয় কী!"

সিনহা মাথা নাড়লেন। বললেন, "অত কাঁচা কাজ কী আমরা করবো? এই জঙ্গলের প্রথম কিলোমিটার অব্দি অঞ্চলে যাওয়া যায়। তারপর থেকে যে অঞ্চল শুরু হয় সে অঞ্চল ভয়াবহ। এই দেখুন মানচিত্র।"

সিনহা গাড়ির ভিতর থেকে একটা মানচিত্র বের করলেন। বড় গাড়ি। মানচিত্র মেলে ধরতে অসুবিধে হল না।

"এই দেখুন এটা হচ্ছে গ্রাম। এই হচ্ছে জঙ্গল। জঙ্গলের এক অংশ গিয়ে ঠেকেছে বাংলাদেশে। কিন্তু সেই অংশ এবং বাংলাদেশ বর্ডারের মধ্যে দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটারের বেশি। অর্থাৎ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দেখলেও এই গ্রামের মতোই ব্যপার। সাইডের অংশ স্বাভাবিক, ভয়-ডরহীন এলাকা। কিন্তু যেই জঙ্গলের গর্ভে আমরা প্রবেশ করি সঙ্গে সঙ্গে চারদিক দিয়ে

অন্ধকার জাপটে ধরে। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, যারা এক কিলোমিটার অঞ্চল পার হবার পর ফিরে আসতে পেরেছিলেন তাদের বক্তব্য সেখানে টর্চ কাজ করে না। মোবাইল অস্বাভাবিক আচরণ করে। তাই সমস্তটাই ধোঁয়াশা। সার্চ পার্টি যারা নিখোঁজ হয়েছিল তাদের খুঁজতে হলে একদম ভিতরে প্রবেশ করতে হতো। সেখানে ঢোকার সাহস দ্বিতীয় দল দেখিয়েছিল। কিন্তু তারাও নিঁখোজ হবার পর তৃতীয় দল সাফ ভিতরে ঢুকতে অস্বীকার করে। আর শুরুর এক কিলোমিটারে তাদের কোনো হদিশ আমরা পাইনি। গ্রামের লোক তখনও এক টানা বলে গিয়েছে যে অনর্থ হয়ে যাবে। আপনারা ভিতরে ঢুকবেন না।"

সিনহা চুপ করল। রামানুজ মন দিয়ে মানচিত্র দেখছে। মাঝে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে গ্রামবাসীরা কোনো অনৈতিক ব্যবসা বা কোনো র‍্যাকেট ইত্যাদি চালাতে পারে কি?

সিনহা পত্রপাঠ মাথা নেড়ে অস্বীকার করল, "অসম্ভব। এদের প্রত্যেকে জুমচাযের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকটা টিলা জমি আমাদের সরকারি বাংলোর আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওদের যেন একটাই উদ্দেশ্য, এই জঙ্গলকে রক্ষা করা। নিজেরাও এই জঙ্গলে প্রবেশ করে না।"

"ওদের কি একটা দেবতার ব্যাপারে শুনছিলাম গতকাল। আজ দেখতে গিয়ে দেখতেও পেলাম না। সে ব্যাপারে কিছু জানেন।"

রামানুজের প্রশ্নে সিনহা বললেন, "জন্মেও নাম শুনিনি। এই অঞ্চলে এসেই প্রথম শুনেছিলাম— 'গন্দবেরুন্দা'। দেবতা দেখতে গেলে ওরা দেখাবে না। প্রয়োজনে আজকের মতো সিন ক্রিয়েট করে ফেলবে, তবুও নিজেদের দেবতার ঘরে ঢুকতে দেবে না।"

দাসবাবু এরই মাঝে বললেন, "গতকাল স্যারকে ওরা বলছিল, দেবতার ভোগে পরিণত হবে সবাই।"

সিনহা হেসে বললেন, "ওদের বিশ্বাস জঙ্গলে ওদের দেবতা স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন।"

গাড়িতে উপস্থিত সকলে একপ্রস্থ হেসে নিল। এরকম কুসংস্কারকে আজকের দিনে মান্যতা দেবার মতো নির্বোধ ওরা নয়।

গাড়ি এসে থামল আগরতলার প্রাণকেন্দ্র শকুন্তলা মার্কেটের কাছে। সিনহা বললেন, "চলুন আজকে আপনাকে আগরতলার অন্যতম প্রাচীন দোকানের মোঘলাই খাওয়াবো।"

রামানুজ সাগ্রহে রাজী হল। এতক্ষণে তার ক্ষিদেও পেয়ে গিয়েছিল। দুপুরের দিকে লাঞ্চ টাইমে মোঘলাই দিল্লিবাসীদের কাছে স্বাভাবিক ব্যপার। গাড়ি থেকে নেমে ওরা এগিয়ে গেল সামনে।

"এই হচ্ছে অশোকা রেস্টুরেন্ট।"

ভিতরে প্রবেশ করল ওরা। রামানুজ দেখল হোটেলটা বেশ বড় আকারের। সামনেও বসার জায়গা রয়েছে, পিছনেও। পিছনের অংশগুলোতে আবার দুই ভাগ। সিড়ি দিয়ে উপরে গিয়েও চাইলে এখন বসা যায়। দিনের এই সময় খুব ভিড় না-হলেও মাঝামাঝি ভিড় লক্ষ করতে পারল রামানুজ।

পিছনের দিকের ঘরগুলোর একটায় বসে দাসবাবু বললেন, "একটা সময় ছিল যখন আগরতলাবাসী যেখান থেকেই আসুক না কেন এই অঞ্চলে কেনাকাটা করতে আসাকে বলতো টাউনে যাচ্ছি। অথচ দেখবেন কাছের কোনো এলাকা থেকেই এসেছে ওরা। অথচ এটাই ছিল ওদের টাউন। বিশ তিরিশ বছর আগের কথা। যা-ই হোক, তখন এই এলাকায় এসে কেনাকাটা করে যাবার পথে অশোকার মোঘলাই না খেয়ে কেউ ফিরতো না। দামও ছিল তখনকার হিসেবে কম। এখন যে মোঘলাই দুশো আড়াইশো টাকা সেটাই তখন ছিল তিরিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা। তখন এত শত রেস্তোরাঁ, ক্যাফে এসব ছিল না।"

সিনহা সম্মতি দিলেন। তারপর বললেন, "তখন অশোকাই ছিল। বন্ধুবান্ধব নিয়েও কত এসেছি। এর বাইরে ছিল উজ্জ্বলা বিরিয়ানি। বটতলা সুপারমার্কেটে ঢোকার রাস্তার মুখে। সেটাও একদিন নিয়ে আসবোখন।"

অর্ডার দেওয়া হল। মোঘলাই চলে এল। রামানুজ খেয়ে বলল, "সত্যি

দারুণ খেতে। এত সুস্বাদু মোঘলাই লক্ষনোউ বা দিল্লির বাইরে কোথাও পাওয়া যায় জানতাম না। কলকাতার মোঘলাই পরোটা খেয়েছি। ভালো লাগে না আমার।"

"যাক, এত যে গুণগান করলাম, নাকটা কাটতে দেয়নি ওরা।"

সিনহা সাহেবের কথায় সবাই হেসে উঠল।

ফেরার পথে আগরতলা শহরের রাস্তাঘাট, নতুন তৈরি হওয়া ফ্লাইওভার, শহরের প্রাণকেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো ঘুরে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ দেখে বাংলোর পথ ধরল গাড়ি।

"আজ পুলিশ কর্তা সমস্ত ফেলে আমাকেই সময় দিলেন সারাদিন। শহরে আশা করি লুটপাট কিছু হয়নি।"

রামানুজের রসিকতা ধরতে পারলেন সিনহা। বললেন, "সরকারের আদেশ। আপনার সঙ্গে থাকার। এখন এটাই দায়িত্ব। বাকি শহর দেখার জন্য লোক তো রয়েইছে। সেরকম গুরুতর কিছু হলে না হয় আমিও যাবো।"

"তাহলে আর কি, বাংলোতেই চলে আসুন। কাল রাতের দিকটায় বেশ বোর হচ্ছিলাম। কথাবার্তায় কেটে যাবে সময়। আর তাছাড়া জঙ্গলে পেনিট্রেট করার প্ল্যানও ছকে ফেলা যাবে।"

রামানুজের প্রস্তাবে হাসলেন সিনহা। কিছু বললেন না। রামানুজ আন্দাজ করে বলল, "পরিবার! তা না হয় আমিও বাড়ি গিয়ে বউঠানদের সঙ্গে একটু আত্মীয়তা করে আসবো। আশা করি তারপর তিনি কয়েকদিনের জন্য আপনাকে এই অঞ্চলে পাঠাতে বারণ করবেন না।"

সিনহাবাবু এবার লাজুক হাসি হাসলেন। বললেন, "আচ্ছা আমি দেখছি।"

রামানুজ এবার একটা অন্য কথা বলল, "দাসবাবু, এই কাঞ্চন ছেলেটিকে আমার সুবিধের লাগছে না। আজকেও যখন গ্রাম থেকে আমরা বেরোলাম দেখলাম ও গ্রামে ঢোকার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

দাসবাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

রামানুজের সন্দেহ হল। স্বভাবসুলভ মসকরা করা ঢঙে বলল, "দাসবাবু, ও দাসবাবু, কিছু কইবা?"

ত্রিপুরায় ভাষাটা রামানুজের মুখে বেশ মিষ্টি শোনালো। দাসবাবু না হেসে পারলেন না। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, "নিজের পিতার গায়ে কেউ রাইফেল ঠেকালে পুত্র সেখানে উপস্থিত না হয়ে পারে? তবুও তো সে আপনাকে এসে আটকায়নি, এটা ভাবুন।"

রামানুজের মাথা এই এক কথাতেই ঘুরে গেল। সোজা টানটান হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াট? কাঞ্চন ওই বুড়ো মোড়ল মানে ওই হেমন্তাই নাকি ওর ছেলে?"

দাসবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"মাই গড! আর আপনি এরকম একটা মানুষকে আমার বাংলোর কেয়ার টেকার করে রেখেছেন? আপনার কি মাথায় দোষ আছে? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!"

দাসবাবু হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, "আরে আপনি শুনুন না। ওকে গ্রামবাসীরা ভালো চোখে দেখে না।"

রামানুজ এসব শুনতে রাজি নয়। সে বেশ নির্দেশ সুলভ কণ্ঠে বলল, "আমি এসব জানতে চাই না। ও বাংলোতে থাকলে আমার প্রোজেক্ট কমপ্রোমাইজ হতে পারে। আমি আমার সুরক্ষার কথা ভাবছি না, সে আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সে গ্রামে গিয়ে সরকারের প্ল্যান ফাঁস করতে পারে। এই রিস্ক আমি নিতে চাই না। এক্ষুনি বাংলোতে ফিরে আপনি ওকে বরখাস্ত করবেন। এটাই আমার অর্ডার।"

দাসবাবু আরও কিছু বলে হয়তো বোঝাতেন রামানুজকে। কিন্তু এরপর আর কথা চলে না। তিনি হতাশ সুরে শুরু বললেন, "ইয়েস স্যর।"

রামানুজ বাকি রাস্তায় আর বিশেষ কথা বলল না। গাড়িতে হঠাৎ করেই একটা থমথমে পরিবেশের সৃষ্টি হল। সিনহা সাহেব এটা আন্দাজ করেই গাড়িতে একটা গান চালিয়ে দিলেন। বাইরে হলকা হালকা বৃষ্টিপাতও শুরু

হল। ঠান্ডাটা আজ জাঁকিয়ে পড়বে। গান বাজতে লাগল,

"ইয়ে রাতে ইয়ে মোসম নদী কা কিনারা ইয়ে চঞ্চল হাওয়া।"

লুপে চলতে লাগল গানটা। গাড়ি এগোতে লাগল পাহাড়ি পথে বৃষ্টি কেটে কেটে।

বাংলোর গেটের সামনে যখন গাড়ি পৌঁছাল তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। গানটা বন্ধ করলেন সিনহা সাহেব।

রামানুজ এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছেন এই পরিবেশ আর গান শুনে। মজা করে বললেন, "খুব রসিক মানুষ আপনি। 'দিল্লি কা ঠগ' সিনেমার গান চলিয়েছিলেন আমার জন্য। আসলে সব ঠগ বসে আছে ত্রিপুরাতেই। আর এটা কোনো পলিটিক্যাল জোকস নয়।"

সবাই একত্রে হেসে উঠলেন। দাসবাবুর দমফাটা ভয়টাও উধাও হয়ে গেল নিমেষে। গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে লন বরাবর এগোতেই থেমে গেল।

সিনহা সাহেব ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ি থামালে কেন এখানে? এখানে নামলে তো সবাই ভিজে যাবো।"

ড্রাইভার বলল, "মাটিতে কেউ একজন পড়ে আছে, সম্ভবত রক্তাক্ত অবস্থায়।"

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রামানুজ এবং সিনহা নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। পিছন পিছন দাসবাবুও দৌড়ালেন।

সবাই সামনে গিয়ে দেখল একজন মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে লনের মেঝেতে। বৃষ্টিতে গায়ের রক্ত ধুঁয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সিনহা মানুষটাকে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ করলেন এবং উপরে রামানুজের দিকে তাকালেন। রামানুজ বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল কেউ কনিষ্ককে বেধড়ক মেরে বাংলোতে ফেলে দিয়ে গেছে।

দেহে প্রাণ আছে কিনা কে জানে!

* * * * * * * * * * *

(৫)

আগরতলার এক বেসরকারি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে কাঞ্চন। রামানুজ বেডের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ সিনহা। ডাক্তার দেখে জানিয়েছেন যে এ যাত্রায় বেঁচে গেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাথার ভিতরে বা শরীরের ভিতরে কোথাও রক্ত জমা হয়নি। এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনকে।

দাসবাবু হন্তদন্ত হয়ে কেবিনের ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকে বললেন, "আমরা চলে আসার পর গ্রামবাসীরাই ওকে মেরেছে। আমাদের উপরের রাগটা গিয়ে পড়েছে ওর উপর।"

রামানুজ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আর ওর বাবা নিজের ছেলেকে এভাবে মার খেতে দেখল?"

রামানুজের চোখ লাল। মিঃ সিনহা ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "ওদের কাছে জঙ্গল আর ওদের দেবতা আগে, সন্তান পরে। কাঞ্চন তো আপনার বাংলোতেই ঘুমোয়। নেহাত কাল খবর পেয়ে ওখানে ছুটে গেছিল। আমাদের লোক ভেবে ওকে একা পেয়ে পিটিয়েছে।"

রামানুজ বলল, "ওদের সবক-টাকে তোলা যায় না?"

"ভারতবর্ষে গণপ্রহারের এটাই সুবিধে। কাউকে তোলার নেই। ওখানে গেলে গ্রামবাসী ওর নামে চুরির অপবাদ দিয়ে দেবে। ব্যস, কেস ওখানেই শেষ।"

মুখ থেকে বিচ্ছিরি গালাগালি বের করল রামানুজ। বাকিরাও ফুঁসছে। কাঞ্চন ছেলেটাকে যেভাবে মারা হয়েছে তা চোখে দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার যদিও বলেছে দু-দিন রেখে ছেড়ে দেবে। ওষুধ চলবে।

দাসবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন, "স্যার, বলেছিলাম না। ছেলেটা মন্দ

নয়। আমাদের খবরও ওর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ওকে বাঁচার শেষ সুযোগ ওরা এভাবেই দিয়েছিল। ও আপনার বা আমাদের ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে টু শব্দটি করেনি। তারপরেই...”

রামানুজ এবার দাসবাবুর দিকে। নিজের উপরেই রাগ হল তার। বলল, “এই চাকরিটাই এমন। ভালো মন্দ সবাইকে সন্দেহ করতে হয়। প্রোটোকল সবার আগে।”

পরের দু-দিন রামানুজের ওখানেই কেটে গেল। সে নিজে হাসপাতালে থেকে বাকিদের চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু রামানুজের মতো উচ্চপদস্থ অফিসারকে ফেলে কীভাবে আর যাওয়া যায়! সবার দু-দিন মোটামুটি হাসপাতালেই কাটল।

তৃতীয়দিন যখন ছুটি হল ততক্ষণে কাঞ্চন আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ। সেলাই ট্রনে শরীর তাজা। ওষুধও সময়ে পড়েছিল বলে অনেকটাই ভালো বোধ করছে সে। রামানুজ এগিয়ে গেল, তার পাশে বিছানায় বসল।

“কেমন আছো?”

কাঞ্চন মাথা নেড়ে হাসল।

“সেদিন যদি গ্রামের কোনায় দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়তে তাহলে এই মারটা খেতে হতো না। বদলে সিনহা সাহেবের অশোকার মোগলাই খেতে পারতে।

ঘরে উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। কাঞ্চনও হাসল।

“আচ্ছা কাঞ্চন, ওইদিন আমরা চলে যাবার পর ঠিক কী হয়েছিল?”

রামানুজের প্রশ্ন শুনে কাঞ্চন এবার দাসবাবুর দিকে তাকাল। দাসবাবু বললেন, “তিনি সব জানেন। তুমি নির্দ্বিধায় বলো।”

কাঞ্চন বলল, “আপনারা চলে গেলেন। গ্রামবাসী ধীরে ধীরে নিজের কাজে মন দিল, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে গেলাম। দেখলাম টানা হেঁচড়া করতে গিয়ে বাবার কিছু কিছু জায়গা কেঁটেছড়ে গেছে। বাবা ওখানে নিজের বানানো মলম লাগাচ্ছে। বাবা

(৫)

আগরতলার এক বেসরকারি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে কাঞ্চন। রামানুজ বেডের পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ সিনহা। ডাক্তার দেখে জানিয়েছেন যে এ যাত্রায় বেঁচে গেছে। রক্তক্ষরণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাথার ভিতরে বা শরীরের ভিতরে কোথাও রক্ত জমা হয়নি। এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনকে।

দাসবাবু হন্তদন্ত হয়ে কেবিনের ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকে বললেন, "আমরা চলে আসার পর গ্রামবাসীরাই ওকে মেরেছে। আমাদের উপরের রাগটা গিয়ে পড়েছে ওর উপর।"

রামানুজ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আর ওর বাবা নিজের ছেলেকে এভাবে মার খেতে দেখল?"

রামানুজের চোখ লাল। মিঃ সিনহা ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "ওদের কাছে জঙ্গল আর ওদের দেবতা আগে, সন্তান পরে। কাঞ্চন তো আপনার বাংলোতেই ঘুমোয়। নেহাত কাল খবর পেয়ে ওখানে ছুটে গেছিল। আমাদের লোক ভেবে ওকে একা পেয়ে পিটিয়েছে।"

রামানুজ বলল, "ওদের সবক-টাকে তোলা যায় না?"

"ভারতবর্ষে গণপ্রহারের এটাই সুবিধে। কাউকে তোলার নেই। ওখানে গেলে গ্রামবাসী ওর নামে চুরির অপবাদ দিয়ে দেবে। ব্যস, কেস ওখানেই শেষ।"

মুখ থেকে বিচ্ছিরি গালাগালি বের করল রামানুজ। বাকিরাও ফুঁসছে। কাঞ্চন ছেলেটাকে যেভাবে মারা হয়েছে তা চোখে দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার যদিও বলেছে দু-দিন রেখে ছেড়ে দেবে। ওষুধ চলবে।

দাসবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন, "স্যার, বলেছিলাম না। ছেলেটা মন্দ

নয়। আমাদের খবরও ওর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ওকে বাঁচার শেষ সুযোগ ওরা এভাবেই দিয়েছিল। ও আপনার বা আমাদের ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে টু শব্দটি করেনি। তারপরেই...”

রামানুজ এবার দাসবাবুর দিকে। নিজের উপরেই রাগ হল তার। বলল, “এই চাকরিটাই এমন। ভালো মন্দ সবাইকে সন্দেহ করতে হয়। প্রোটোকল সবার আগে।”

পরের দু-দিন রামানুজের ওখানেই কেটে গেল। সে নিজে হাসপাতালে থেকে বাকিদের চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু রামানুজের মতো উচ্চপদস্থ অফিসারকে ফেলে কীভাবে আর যাওয়া যায়! সবার দু-দিন মোটামুটি হাসপাতালেই কাটল।

তৃতীয়দিন যখন ছুটি হল ততক্ষণে কাঞ্চন আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ। সেলাই ট্রনে শরীর তাজা। ওষুধও সময়ে পড়েছিল বলে অনেকটাই ভালো বোধ করছে সে। রামানুজ এগিয়ে গেল, তার পাশে বিছানায় বসল।

“কেমন আছো?”

কাঞ্চন মাথা নেড়ে হাসল।

“সেদিন যদি গ্রামের কোনায় দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়তে তাহলে এই মারটা খেতে হতো না। বদলে সিনহা সাহেবের অশোকার মোগলাই খেতে পারতে।

ঘরে উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। কাঞ্চনও হাসল।

“আচ্ছা কাঞ্চন, ওইদিন আমরা চলে যাবার পর ঠিক কী হয়েছিল?”

রামানুজের প্রশ্ন শুনে কাঞ্চন এবার দাসবাবুর দিকে তাকাল। দাসবাবু বললেন, “তিনি সব জানেন। তুমি নির্দ্বিধায় বলো।”

কাঞ্চন বলল, “আপনারা চলে গেলেন। গ্রামবাসী ধীরে ধীরে নিজের কাজে মন দিল, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে গেলাম। দেখলাম টানা হেঁচড়া করতে গিয়ে বাবার কিছু কিছু জায়গা কেঁটেছড়ে গেছে। বাবা ওখানে নিজের বানানো মলম লাগাচ্ছে। বাবা

আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন, আমি আপনাদের সম্পর্কে কিছু জানি কিনা। সরকার কী প্ল্যান করছে ইত্যাদি। আপনার সঙ্গেও তো আসার পর সেভাবে কথাই হয়নি, আর হলেও আমি কিছু বলতাম না। আমি কথাটা ঘুরিয়ে অন্য কথায় চলে গেলাম। বাবার পায়ে মলম লাগিয়ে দিলাম। বাবা আমাকে খেতে দিলেন। এভাবে কিছু সময় কাটার পর বাবার শিষ্যরা এল। ওরা আমাকে সহ্য করতে পারে না। আর বাবার কাছেও আমার থেকে ওদের কদর বেশি। ওরা এসেও আমাকে আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকল। আমি যত বলি যে আমি কিছু জানি না তারা বিশ্বাস করতে চাইল না। আমি তো গ্রামে যা-ই না, অনেকদিন পরে গেছিলাম। গ্রামবাসীও কোনো একটা কারণে আমাকে পছন্দ করে না। এতদিন পর আমাকে একা পেয়ে, তার উপর আপনাদের সেবার কাজে আছি দেখে আমাকে ঘর থেকে বের করে হেনস্থা করল। বাবাও চুপ করে থাকলেন। একসময় এই হেনস্থা থেকেই মারামারি। মূলত কিছু যুবক প্রহার শুরু করল, তারপর অনেকেই হাত দিয়েছিল। একটা সময়ের পর খেয়াল নেই আমার কিছু। কয়েকজন মিলে একটা ঠেলাগাড়ি করে বাংলোর সামনে এনে ফেলে দিয়ে গেছিল সম্ভবত। তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। রাধামাধবদাকে ডাকার ক্ষমতাটুকুও আমার ছিল না। ওখানেই সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাই।"

কাঞ্চনের কথা শেষ হওয়ার পরে হাসপাতালের কেবিনে পিন ড্রপ সাইলেন্স ছিল। কয়েক মুহূর্ত পর সিনহা বললেন, "স্যর চলুন।"

কাঞ্চনকে নিয়ে রামানুজ বেরল। এখনও কাঞ্চনের ঠোঁটের কাছে শুকিয়ে থাকা রক্তের দাগ।

গাড়ি যখন শহরকে পিছনে ফেলে পাহাড়ি রাস্তা ধরল তখনই রামানুজ বলল, "বাংলোয় ঢোকার আগে একবার গ্রামে ঢুকবো।"

সিনহা একবার বললেন, "ফোর্স নেই কিন্তু সঙ্গে।"

রামানুজ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "লাগবে না।"

সাদা রঙের এক্স ইউ ভি গাড়িটা গিয়ে থামল গ্রামের ভিতরে। ড্রাইভার

এত গতিতে ভিতরে ঢুকল যে ধুলো উড়ল চারদিকে।

কাঞ্চনকে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরুল রামানুজ। পিছনে সিনহা, দাসবাবু ও ড্রাইভার।

"তোমার ঘরটা কোনদিকে?"

কাঞ্চনকে জিজ্ঞেস করতেই কাঞ্চন আঙুল দিয়ে দেখাল দিকটা। কিন্তু সেদিকে যেতে হল না। হেমন্তাই বেরয়ে এলেন মন্দিরের ভিতর থেকে। কাঞ্চনের হাতটা ধরে তাকে নিয়ে রুদ্র বেগে এগিয়ে গেলেন রামানুজ। হেমন্তাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর চ্যালারা। সেদিকে দৃকপাত না করে রামানুজ সোজা হেনন্তাইকে বলল, "এ কেমন ভক্তি যেখানে সন্তানও গৌণ হয়ে যায়! খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার এই ভক্তি, এই দেবতা আর এই জঙ্গলকে বোঝার। ঠিক বুঝে নেবো। আপাতত মাথায় পট্টি বাঁধা আপনার সন্তানকে দেখুন। বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরেছি। আশা করি আপনার পাশেও দিনের শেষে এরকম কেউ রয়েছে।"

কথা শেষ করে কাঞ্চনকে নিয়ে ফিরে আসছিল রামানুজ। হেমন্তাই-র কথায় থামল। হেমন্তাই বলছেন, "ধর্ম পালন করতে হলে সন্তানকেও মাঝে মাঝে ত্যাগ করতে হয়। নইলে অবস্থা কী হতে পারে তা মহাভারতের দ্রোণ কিংবা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। আমি শুধু আমার ধর্ম পালন করছি।"

রামানুজ উত্তর না দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কাঞ্চনকে গাড়িতে উঠিয়ে নিজে উঠার সময় হেমন্তাইকে চিৎকার করে বলল, "আমাদের ব্যপারটা ধর্ম না অধর্ম, সেই সংজ্ঞাটা আগে জেনে যাই, পরিস্থিতিটা আগে বুঝে ফেলি, তারপর এর উত্তর দেবো। আপাতত আপনি আপনার ধর্ম সামলান, আমি আমার।"

গাড়ি ঘুরিয়ে বাংলোর দিকে ফিরে গেল ওরা। হেমন্তাইকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী জমায়েত করে দাঁড়িয়ে রইল।

পরের কয়েকটা দিন রামানুজ নিজের মতো করে ছক কষল। দিল্লিতে

ত্রিবেদীবাবুর সঙ্গে মত বিনিময় করল। এখানকার পরিস্থিতির সমস্ত ব্রিফ যা সে পেয়েছে বা অবিরত পাচ্ছিল তা সে দিল্লিতে ফোনের মাধ্যমে এবং অফিসিয়াল মেইলের মাধ্যমে পাঠাল। ভিতরে ভিতরে বহু বছর পর সে এরকম উত্তেজিত হয়েছে। তাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে চলেছে কী এমন কুসংস্কার হতে পারে যা এক পিতার কাছে সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়।

এদিকে মিঃ সিনহা ডিউটি শেষে রাতের বেলায় বাংলোয় চলে আসছেন। দাসবাবু, ড্রাইভার অজিত, কাঞ্চন, রাধামাধব ওরা তো আছেই। সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলোর সুরক্ষার জন্য তিনজন সশস্ত্র পাহারাদার। একদিনে কাঞ্চন অনেকটাই স্বাভাবিক। হাত-পায়ের ব্যথা বেদনাও অনেকটা কমে গেছে। মাঝে একদিন হাসপাতালে গিয়ে মাথার পট্টিটাও খুলে এসেছে। এখন সে দিব্বি সুস্থই বলা যেতে পারে। বাংলোর কাজকর্মও ধীরে ধীরে শুরু করে দিয়েছে।

এরকমই এক রাতে পাহাড়ি এলাকা কুয়াশায় ঢেকে গেল। রামানুজ গায়ে শাল জড়িয়ে নীচে এসে দেখল রাধামাধব রান্নাঘরে ব্যস্ত। তাকে সাহায্য করছে কাঞ্চন। দাসবাবু পত্রিকা পড়ছিলেন, মিঃ সিনহা মোবাইলে কিছু একটা করছেন। অজিত বাইরে দাঁড়িয়ে সিগরেট খাচ্ছে।

"আমার এখানে বিরক্ত লাগছে। এত বোরিং একটা জায়গা। এদিকে কাজও বিশেষ কিছু এগোচ্ছে না। আমি বরং ফিরে যাচ্ছি, আপনারা মোবাইল ঘাটুন, পত্রিকা পড়ুন আর রান্না করুন। হ্যাঁ কেউ কেউ সিগারেট টানতে থাকুন।"

রামানুজ হঠাৎ করে এসব কথা বলে উঠলে স্বাভাবিকভাবেই সবাই হতবাক হয়ে নিজের নিজের কাজ বন্ধ করল। সিনহা বললেন, "কী মজা করছেন স্যার! বলুন না কী করতে পারি আমরা। আমরাও বোর হচ্ছি।

দাসবাবু আর অজিতও এসে জুটল, "বলুন না কী করতে চাইছেন। আমরা আছি তো।"

রামানুজ গায়ের শালটা আরেকটু টেনে নিয়ে মেকি ক্রোধ দেখাল, "না

না, আমার চাই না। যা করছিলেন করুন।"

মিঃ সিনহা বললেন, "মাল খাবেন? বাইরে তো খুব ঠান্ডা আজ?"

মেকি ক্রোধ গলে হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল হাসি। রামানুজ বলল, "আছে?"

মিঃ সিনহা মাথা উপর নীচ করে মুখে মিশুকে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আছে তো? দাসবাবু আপনার চলে? অজিত?"

দাসবাবু অমায়িক হাসি হাসলেন। অজিতও তাই। বড়বাবুর সঙ্গে বসে এসব করা যেতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

দাসবাবু হাঁক পাড়লেন, "রাধামাধব। ও রাধামাধব।"

রাধামাধব রান্না ঘর থেকে ছুটে এল। "বলুন কত্তা।"

দাসবাবু বললেন, "মাংস আছে?"

রাধামাধব মাথা নেড়ে বলল, "আমি তো দুপুর থেকেই মেরিনেট করে রেখে দিয়েছি। ভাবলাম আজ আপনাদের কাবাব খাওয়াবো।"

রামানুজ বলল, "ওহ লাভলী। গরম গরম করে নিয়ে এসো। আমরা উপরে যাচ্ছি। আর শোনো সমস্ত কিছু সেরে তোমরাও উপরে চলে এসো। একসঙ্গে খানাপিনা সেরে তারপর ডিনার। ঠিক আছে?"

কাঞ্চন পাশেই ছিল। লাজুক হেসে বলল, "স্যার আমরা কীভাবে, মানে..."

রামানুজ বলল, "আমরা সবাই রাজা গানটা শোনোনি কখনো? যা বললাম সব কাজ সেরে এসে আমাদের জয়েন করো।"

হঠাৎই ঘরের মধ্যে একটা উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ল।

রামানুজ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার পথে সিনহাকে বললেন, "সিনহা সাহেব দেরি করবেন না। আপনার বন্দুকগুলো নিয়ে জলদি আসুন।"

সিনহা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, "বন্দুক?"

রামানুজ হেসে বলল, "এই শীতের দিনে ওই পানীয় বন্দুকের কাজ করে, বোঝেন না নাকি!"

সিনহা বেশ বিগলিত হাসি হাসলেন।

বাংলোর দোতলায় একটা বড় ব্যালকনি আছে। ব্যালকনির বাইরে যতটা চোখ যাচ্ছে শুধুই গাঢ় কুয়াশা। ব্যালকনিতে বাহারি আলো জ্বলছে। আধ ঘন্টার মধ্যে সকলেই উপরে চলে এসেছেন। শুধু কাঞ্চন আর রাধামাধব এখনও রান্নাঘরে আছে। রাধামাধব খবর পাঠিয়েছে রাতে আলাদা করে মাংসের ঝোল আর সাদা ভাত। দাসবাবু তো আনন্দের আতিশয্যে একবার বলেই ফেলেছেন, "হঠাৎ করেই যেন পিকনিক হয়ে গেল আমাদের।"

সবাই বেতের মাঝারি আকারের চেয়ারে বসে আছেন। মাঝে একটা সেন্টার টেবিল, সেটাও বেতের তৈরি। তার উপর রাখা আছে দামি স্কচের বোতল, প্রত্যেকের জন্য একটা করে কাঁচের বাহারি হুইস্কি গ্লাস, সোডার বোতল, ঠান্ডা জলের বোতল, বাদামের কুচো কুচো প্যাকেট, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি। কাঞ্চন এইমাত্র এসে প্রথম লটের চিকেন কাবাবের প্লেটটা রেখে গেল সেন্টার টেবিলের উপর।

"তাড়াতাড়ি চলে আয় তোরা।"

দাসবাবু তাড়া দিলেন। মিঃ সিনহা পেগ বানাচ্ছেন।

"স্যর আপনাকে জল কতটা?"

রামানুজ বলল, "টু ইস্টু ওয়ান। নো সোডা।"

সবার পেগ বানাতে বানাতে রামানুজকে সিনহা বললেন, "সেদিন আপনি ত্রিপুরার ইতিহাসের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না!"

রামানুজ মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ, জানার খুব ইচ্ছে।"

সিনহা মুখে দু-টো বাদাম পুড়ে বললেন, "আমাদের মধ্যে একজন ইতিহাস বিশারদ আছেন?"

"কে সে?"

রামানুজের প্রশ্নে সিনহা আঙুল দিয়ে অজিতের দিকে ইশারা করল।

"তাই?"

অজিত এতক্ষণ এমনিতেই কাঁচুমাচু হয়ে বসেছিলেন। বড়বাবুদের সঙ্গে

পানীয়ের অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। এরকম ঠান্ডার দিনে সে বারণও করতে পারেনি। কিন্তু এখন বড়বাবু যে কথাটা বললেন তাতে সে একেবারে মাটিতে মিশে গেল যেন। আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ, স্যর মানে... আমি ইতিহাসে এম এ।"

রামানুজের চোখ কপালে উঠল। সে প্রশংসা করে বলল, "মাই গড! দারুণ ব্যপার।"

অজিত হেসে বলল, "চাকরি নেই স্যর চাকরি নেই। সরকারি গাড়ি চালানোর চাকরিটা না জোটালে না খেয়ে মরতে হতো। পড়াশোনার মূল্য নেই।"

রামানুজ বিরোধ করল, "চাকরি নেই ঠিক, কিন্তু পড়াশোয়ার মূল্য নেই ভুল কথা। এই যে আজ আমি জানতে পারলাম আপনি ইতিহাসে এম এ, আমার চোখে আপনার সম্মান কয়েক গুণ বেশি বেড়ে গেল। পড়াশোনার মূল্য এখানেই। টাকা বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন করা যায়, কিন্তু সম্মান উপার্জন করতে পড়াশোনার একটা ভূমিকা তো আছেই। নিন এবার এসব ছাড়ুন, আমাকে বলুন ত্রিপুরা কী, ত্রিপুরা কেন? ত্রিপুরা নিয়ে আমি কিছুই জানি না। শিক্ষিত করুন আমাকে।"

রামানুজ কথা শেষ করে সুন্দর হাসল। ওর কথায়, হাসিতে একটা কিছু তো আছে। এভাবে কথা বললে যে কেউ সম্মানিত বোধ করে। অজিতবাবু মনে সেই সুন্দর অনুভূতিটা ছড়িয়ে পড়ল।

সিনহা সাহেব সবাইকে পেগ এগিয়ে দিলেন। সকলে মিলে সমবেত স্বরে বলে উঠল, "উল্লাস।

রামানুজ প্রথম ঢোক নিয়েই সোল্লাসে বলল, "দারুণ বানিয়েছেন সিনহাবাবু। কই অজিত, শুরু করুন।"

বাকিরাও বললেন, "হ্যাঁ, অজিত শুরু করো। আমরাও ত্রিপুরার ইতিহাসটা একটু জানি।"

অজিত স্কচ খেতে খেতে শুরু করলেন, "ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস

আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে। 'শ্রীরাজমালা'-র সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় বলেছেন, 'কিরাত দেশের অন্তর্নিবিষ্ট গোমতী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ যে অজ্ঞাত কারণেই হোক, ইতিহাসে অগোচর কাল হইতে ত্রিপুরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।' রাজমালার মতে পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরের নামানুসারে কিরাত দেশের নাম হয় ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরের স্বজাতীয়রা ত্রিপুর নামে পরিচিত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ত্রিপুরকে কিংবদন্তীমূলক এবং কাল্পনিক বলেছেন। সুতরাং এ যুক্তিটি খুব জোরালো বলে মনে হয় না। কোনো কোনো লেখকের মতে উদয়পুরে অবস্থিত পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নামানুসারে এ রাজ্যের নাম হয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং তার এগারো বছর পূর্বে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এক মুদ্রায় ধন্যমাণিক্য নিজেকে 'ত্রিপুরেন্দ্র' অর্থাৎ ত্রিপুররাজ বলে অভিহিত করেছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ত্রিপুর বা ত্রিপুরা নামটি পরিচিত ছিল এবং দেবীর নাম থেকে এ রাজ্যের নামকরণ ত্রিপুরা হয়নি তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বরং ত্রিপুরা রাজ্যের নাম থেকে দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো লেখকের মতে ত্রিপুরায় মহাদেবের মন্দির ছিল এবং মহাদেব ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারি নামে পরিচিত। এই ত্রিপুরেশ্বর বা ত্রিপুরারি নাম থেকে এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তির পিছনে এ রাজ্যের তিপ্রা ভাষার প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'যে অনার্য কিরাতদিগকে আমরা তিপ্রা (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে তুই বলে। এই তুই শব্দের সহিত প্রা সংযুক্ত করিয়া তুইপ্রা শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা এবং তিপ্রা হইতে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।' ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রিপুরা শব্দটি সম্ভবত ত্রিপ্রা নামক উপজাতির সংস্কৃত রূপ। তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির

নাম থেকেই এ রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়েছে, এই মতই বর্তমানে অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

"মধ্যযুগে মাণিক্যবংশীয় রাজারা ত্রিপুরায় একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রাকমাণিক্য যুগে প্রাচীনকালে ত্রিপুরায় কোনো সুসংগঠিত স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরার বেশ কিছুটা অংশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববাংলা ও সমতটের বিভিন্ন রাজবংশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘর গ্রামে সমতটের গুপ্তবংশীয় রাজা বৈন্যগুপ্তের (৫০৭/৮ খ্রিস্টাব্দ) ভূমিদান বিষয়ক যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় এ অঞ্চল সে সময় সমতটের অধীনে ছিল। বৈন্যগুপ্তের পরবর্তী যে সমস্ত সমতটের রাজার নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। এঁদের রাজত্বকাল মোটামুটি ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন পূর্ব বাংলার রাজ্য চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের আক্রমণে দুর্বল হয়ে যায়। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সমতটে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এই বংশের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে সে সময় সুবঙ্গ বা ত্রিপুরা অঞ্চলে নাথ বংশীয় সামন্তরাজারা রাজত্ব করতেন। তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বংশে লোকনাথ নামে এক সামন্তরাজা অন্যান্য সামন্তদের পরাজিত করেন ও নিজ প্রভুর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এই তাম্রশাসনে লোকনাথ ছাড়াও জীবধারণ ও জয়তুঙ্গবর্ষ নামে আরও দুইজন সামন্ত রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা সম্ভবত খড়গ ও রাত বংশীয় ছিলেন। এই সকল রাজবংশ ত্রিপুরা ও আশেপাশে রাজত্ব করছিলেন। এঁরা পরমেশ্বর উপাধিধারী কোনো শক্তিশালী রাজার অধীনে থাকলেও কার্যত স্বাধীন ছিলেন। এই 'পরমেশ্বর' কামরূপের রাজা নাকি সমতটের রাজা ছিলেন,

তা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায় না।

"সপ্ত শতাব্দীর শেষার্ধের আস্রফরপুর লিপি থেকে জানা যায় ত্রিপুরার একটি বড়ো অংশ খড়গ বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। চারজন খড়গ বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন, খড়গোদ্যম, জাতখড়গ, দেবখড়গ ও রাজরাজখড়গ। দেবখড়গের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় এঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্তবাসক যার সঙ্গে ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা নামক স্থানটি অভিন্ন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। চৈনিক বিবরণ থেকে জানা যায় ত্রিপুরা ছাড়াও প্রায় সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গ এঁদের অধীনে ছিল। খড়গ বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। খড়গবংশ ছাড়াও সে সময় রাত বংশীয় রাজা জীবনধারণ ও তাঁর পুত্র শ্রীধারণ ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। শ্রীধারণ নিজেকে সমতটের রাজা বলে প্রচার করেছেন। দেবপর্বতে এঁদের রাজধানী ছিল। এই দেবপর্বত ক্ষীরদা নদীর তীরে অবস্থিত। ক্ষীরাদ বা ক্ষীরানদী গোমতী নদীর শাখা এবং কুমিল্লার পশ্চিমে অবস্থিত। রাত বংশের পর ভবদেব এবং কান্তিদেব নামে দু-জন বংশীয় রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। এঁদের কাছ থেকেই চন্দ্র-বংশীয় রাজারা সমতট অধিকার করে নেন। চন্দ্র-বংশীয় রাজারা ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন পর্যন্ত সাতজন চন্দ্র উপাধিযুক্ত রাজার নাম পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লাহায়াচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র ও সুবর্ণচন্দ্র বিশেষ কোনো রাজকীয় উপাধি ধারণ না করলেও ত্রৈলোকচন্দ্রের সময় থেকে চন্দ্র-বংশীয় রাজাদের প্রকৃত গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। ত্রৈলোকচন্দ্র মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। চন্দ্র-বংশীয় রাজাদের রাজ্য পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গব্যাপী হলেও প্রথম দিকে তাঁদের রাজধানী, ছিল রোহিতগিরি অঞ্চলে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্রশালী এই রোহিতগিরি এবং কুমিল্লার লাল মাই অঞ্চল অভিন্ন বলে অভিহিত করেছেন। পালবংশীয় রাজা প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের বাঘউরা নামে বিষ্ণুমূর্তির উপর

খোদিত লিপি থেকে জানা যায় ত্রিপুরার একটি অংশ তখনও সমতটের অধীনে ছিল। প্রথম মহীপাল লাহায়াচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। সম্ভবত লাহায়াচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি পূর্ব বাংলার কিছুটা অংশ দখল করে নেন। কিন্তু এই অধিকার খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি তা ভারেল্লা গ্রামের মূর্তির লিপি থেকে জানা যায়। শ্রীচন্দ্রের শ্রীহট্ট জেলায় প্রদত্ত তাম্রলিপি থেকে মনে হয় যে শ্রীহট্ট জেলাও চন্দ্র-বংশের রাজাদের অধীনে ছিল। সুবর্ণচন্দ্রের সময় থেকে এই বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে চোলরাজা রাজেন্দ্র চোল পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। কালচুরিরাজ কর্ণ পূর্ববাংলা আক্রমণ করলে চন্দ্র-বংশীয় রাজাদের পতন ঘটে। চন্দ্র-বংশের বিপর্যয়ের সুযোগে কর্ণের জামাতা ও বজ্রবর্মণের পুত্র জাতবর্মণ পূর্ববাংলায় বর্মণ বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হলেও বর্মণ রাজারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমপুরে এঁদের রাজধানী ছিল। জাতবর্মণের পর তাঁর দুই ভ্রাতা হরিবর্মন ও সমালবর্মন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। সমালবর্মনের পুত্র ভোজবর্মন সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন। পরাক্রমশালী সেন রাজাদের আক্রমণে বর্মনরাজ্য দুর্বল হয়ে যায়।

"বিভিন্ন গ্রন্থে পট্টিকেরা নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পট্টিকেরা ত্রিপুরা জেলার ময়নমতী অঞ্চলে অবস্থিত টিলা ছিল। ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাস থেকে জানা যায় ব্রহ্মরাজ অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ) আরাকান আক্রমণ করে জয় করেন। আরাকানের চন্দ্র-বংশীয় রাজারা সেখান থেকে বিতারিত হলে তাদেরই এক শাখা সম্ভবত পট্টিকেরায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মদেশের কাব্যে পট্টিকেরা রাজপুত্রের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের রাজকন্যার প্রণয় কাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই পট্টিকেরা রাজাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। ময়নামতী লিপিতে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকেল দেব (১২০৩/০৪

খ্রিস্টাব্দ) নামে একজন পট্টিকেরা রাজার নাম পাওয়া যায়। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে সেন রাজবংশ দুর্বলতার সুযোগে পূর্ব বাংলার দেব বংশীয় রাজারা শক্তশালী হয়ে ওঠেন এবং পট্টিকেরা অঞ্চলও এঁদের রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।"

এতটুকু বলে অজিতবাবু থামলেন। ইতিমধ্যে গ্লাস দুই রাউন্ড ঘুরে ফেলেছে। রাধামাধব আর কাঞ্চনও এসে যোগ দিয়েছে এবার। রাধামাধব এসেই জানিয়েছিলেন, "ভাত-মাংস সব তৈরি হয়ে গেছে। এই নিন দ্বিতীয় রাউন্ডের কাবাব। আর কিন্তু কাবাব নেই এরপর।"

দাসবাবু অজিতকে বললেন, "এ তো এক অভূতপূর্ব ইতিহাস শোনালে হে অজিত। এত বছর ত্রিপুরায় আছি, মাণিক্য বংশের বাইরেও যে ত্রিপুরার এত বড় ইতিহাস আছে কিছুই জানতাম না। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ ত্রিপুরাবাসীই এই ইতিহাস জানেন না। সেপ্লন্‌ডিড!"

সিনহা সাহেবের চোখে হালকা আমেজ এসেছে। তিনিও বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের ত্রিপুরারও যে এত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস আছে তা আমি আজকে জানতে পারলাম।"

রামানুজ কিন্তু কিছুই বলল না। সে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তাকে আনমনা দেখে অজিতই জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, কিছু বলবেন!"

সম্বিত ফিরে পেল রামানুজ। বলল, "আপনার গল্প শুনতে শুনতে দেড় হাজার বছর পিছনে চলে গিয়েছিলাম। দারুণ লাগল এই ইতিহাস শুনে। আচ্ছা এই যে ওরা মাণিক্য বংশের কথা বলছেন এই রাজবংশ তো অতি বিখ্যাত। ওদের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলবেন না অজিতবাবু?"

অজিত এবার জিভ কাটলেন। বললেন, "স্যার আপনি আমাকে বাবু বলাটা বন্ধ করুন। অজিতই ঠিক আছে।"

রামানুজ হেসে বলল, "ঠিক আছে। বাকিটা বলুন, শুনে মুগ্ধ হই। কই এস পি, আমাকে তিন নম্বরটা দিন।"

সিনহা সাহেব আরেক গ্লাস রঙিন জল এগিয়ে দিলেন রামানুজের দিকে।

সুস্বাদু কাবাব চিবোতে চিবোতে গল্পের গাড়ি ছুটল আবার। বাইরে হিম শীতল ঠান্ডার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিকন হাওয়া।

অজিত গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন, ''ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে এঁদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পুরাণ বর্ণিত উত্তর ভারতের বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্যর বংশধর। দ্রুহ্য পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে ভারতের পূর্বদিকে ত্রিবেগে একটি রাজপাট স্থাপন করেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত শ্রীরাজমালায় এই ত্রিবেগের অবস্থান সাগর দ্বীপে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রুহ্যর বংশধর দৈত্য কিরাতভূমি অধিকার করে কপিল নদীর তীরে মানে বর্তমানে যেটা আসামের নওগাঁও সেখানে এক নতুন রাজপাট স্থাপন করেন এবং এই রাজ্যের নামও ত্রিবেগ রাখা হয়। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে দ্রুহাই কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগে রাজপাট

স্থাপন করেছিলেন। রাজমালায় এই ত্রিবেগ রাজ্যের সীমা এইভাবে দেওয়া আছে 'ত্রিবেগ রাজ্যের পূর্বে মেখলী দেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে আচরঙ নামক রাজ্য।' এই বর্ণনা অনুযায়ী দৈত্যের বা মতান্তরে দ্রুহ্যর পুত্র ত্রিপুর ছিলেন পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী রাজা। তিনি নিজ নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন ত্রিপুরা এবং তাঁর স্বজাতিরা ত্রিপুরি নামে পরিচিত হয়। ত্রিপুর শিবের হাতে নিহত হন। ত্রিপুরের মহিষী হীরাবতী শিবের বরে ত্রিলোচন নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ এখানে পুরাণকথা এসে মিশেছে ইতিহাসের সঙ্গে।"

এক টানে গ্লাসের তরল শেষ করে অজিত আবার বলতে শুরু করলেন, "এবার ইতিহাসে ফিরছি। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মাণিক্যবংশীয় রাজারা তিপ্রা বা ত্রিপুরা জাতি থেকে উদ্ভুত হয়েছেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার রাজবংশকে তিপ্রা জাতির জ্ঞাতি বলে মনে করেছেন। হান্টার সাহেবের মতে ত্রিপুরার রাজারা হচ্ছেন তিব্বতি বর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তিপ্রা জাতিকে ভাষাগত দিক দিয়ে বোড়ো জাতিভুক্ত বলেছেন। প্রাচীনকালে এই বোড়ো জাতি ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাস করতো। এদেরই বলা হত কিরাত। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে তিপ্রা, কাছাড়ি, মেচ, কোচ, গারো প্রভৃতি হল সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে তিপ্রা ও কাছাড়ি জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবয়ব, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে সামঞ্জস্য লক্ষ করে মেজর ফিশার তিপ্রা ও কাছাড়িদের একই বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন। কালক্রমে তিপ্রা ও কাছাড়িরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন পার্বত্য জাতির সঙ্গে একত্রে বসবাসে ফলে তিপ্রারা একটি ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিপ্রা ও কাছাড়িরা যে একই বংশোদ্ভূত তা রাজমালার বিবরণ থেকেও অনুমান করা যায়। রাজমালাতে বলা হয়েছে যে মাণিক্য রাজাদের পূর্বপুরুষ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র হেরম্ভ ফা কাছাড়ের রাজা হন এবং কনিষ্ঠপুত্রের বংশধররা বর্তমান ত্রিপুরার রাজা হন। মাণিক্য বংশীয় ত্রিপুরার

রাজাদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে শ্রী অলীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা তাঁর 'ত্রিপুরা সংহিতা' কাব্যে বলেছেন যে ত্রিপুরিরা আরাকানের ফ্রুহুং অঞ্চল থেকে এসেছে এবং ত্রিপুরিদের আরাকানবাসীরা ফ্রুহুং বলে থাকে এবং রাজাকে বলে ফ্রুহুং মুংগ। ঐতিহাসিক শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগের শ্যানবংশীয় রাজাদের একটি শাখা কামরূপের পূর্বাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই রাজবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হেরম্ব ফা বর্তমান কাছাড় রাজ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র কাছাড়ে উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। অর্থাৎ রাজমালার সঙ্গে এর হুবহু মিল রয়েছে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় রাজ্যটিই হল আমাদের প্রাচীন ত্রিপুরা। অর্থাৎ ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষেরা ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগে শ্যান বংশীয়দের উত্তর পুরুষ এবং কাছাড়ের রাজারা একই বংশের তা প্রমাণ হল।

"এবার বাকি থাকে রাজাদের নাম ইত্যাদি। এগুলো আপনারা সাধারণ আন্তর্জাল ঘাটলেই পেয়ে যাবেন। তাই আমি সেসব বলছি না। সেগুলো বাদ রেখে আমি মাণিক্যবংশের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্কটা নিয়েই আলোচনা করছি। এখানে আর একটা কথাই বলা বাকি থাকে। সিনহা স্যার, আরেক পেগ দিন না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

মিঃ সিনহা হাসিমুখে বানিয়ে দিলেন পেগ। ত্রিপুরার অনালোকিত ইতিহাস শুনতে পেরে সবাই গোগ্রাসে শুনছে। সিনহা স্যারের পেগ এক টানে বার গলায় ঢাললেন অজিত।

দাসবাবু বললেন, "নিজের আসল গুণটা আজকে দেখাচ্ছো বৎস। এতগুলো পেগ খেয়েও এভাবে গড়গড় করে নির্ভুল ইতহাস বলে চলেছো।"

রামানুজ ফোড়ন কাটল, "তাও আবার সন তারিখ সমেত।"

অজিত জিভ কাটল। অল্প জড়ানো গলায় বলল, "স্যার, ইতিহাস বিষয়টাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি আমার রাজ্যটাকেও। এই ইতিহাস

আমি ঘুমেও আপনাকে সঠিক বলবো। প্রয়োজনে সন তারিখ বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন।"

রামানুজ হালকা সুরে বলল, "সে বিশ্বাস তোমার উপর চলে এসেছে। শেষ পার্টটা বলো। তারপর মাংস ভাত অপেক্ষায় রয়েছে।"

অজিত শেষ অংশটা বলা শুরু করল, "মাণিক্যবংশীয় রাজারা ইন্দোমঙ্গোলীয় বা করাত ও ভাষাগত দিক থেকে বোরো জাতিভুক্ত তিপ্রা বা ত্রিপুরা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতে প্রাচীনকালে শক্তিশালী রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও তা সগৌরবে ঘোষণা করতে দ্বিধা করতেন না। রাজপুতানায় বহু খ্যাতনামা রাজবংশকে হুন প্রভৃতি বিদেশী জাতিভুক্ত হলেও ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত হয়েছিলেন এবং চন্দ্র ও সূর্য বংশীয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বিদেশ থেকে আগত গুর্জর প্রতিহাররা নিজেদের অযোধ্যার সূর্য বংশীয় বলে দাবী করতেন এবং দ্রাবিড় চালুক্যরা কখনো সূর্য কখনো চন্দ্র বংশীয়ও দাবী করতেন। সেদিক থেকে বিচার করলে ত্রিপুরার মাণিক্যবংশীয় রাজারাও ছিলেন ক্ষত্রিয় ও চন্দ্র বংশীয়। তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।"

অজিত থামলেন। দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল। রাতে সবাই কষা মাংস আর ভাত খেলেন তৃপ্তি করে। সকলেরই পা টলছে। রাধামাধবদা আর কাঞ্চন টলতে টলতেই সবাইকে খাবার এনে দিলেন। বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু সবাই ভেদাভেদ ভুলে একত্রে ভোজন শেষ করে শুতে গেল।

তারা কেউ জানতেও পারল না, একজন মানুষ এই কনকনে ঠান্ডায় কেবল একটা চাদর গায়ে দিয়ে তাদের বাংলোর আশেপাশে ঘুরছিল। প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে বাংলোতে ঢোকার রাস্তা খুঁজে পেল না সে।

* * * * * * * * * * *

(৬)

সকাল থেকে কুয়াশায় ঢেকে আছে ত্রিপুরা রাজ্য। হেমন্তাইসহ গ্রামের অনেকেই সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আগুনের কুণ্ড বানিয়ে হাত পা সেঁকে নিচ্ছেন। সূর্যের দেখা মেলেনি সকাল থেকে। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ আজ হেমন্তাইকে জিজ্ঞেস করছিল, "হেমন্তাই, জঙ্গলকে আমরা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবো তো?"

কেউ বলল, "ফরেস্ট অফিসারটা ভালো নয়। যা খুশি করতে পারে।"

হেমন্তাইয়ের চ্যালাদের মধ্যে একজন বলল, "কুঁপিয়ে ফেলব যদি জঙ্গলের ভিতরেও কেউ পা ফেলে।"

হেমন্তাই কোনো কথারই উত্তর দিচ্ছেন না। সেদিন অফিসারের হাত-পা ধরেও তিনি তাকে নিরস্ত্র করতে পারেননি। তারপর আবার কাঞ্চনের ব্যাপারটা। সব মিলিয়ে তার মাথা আর মন কাটাকুটি খেলায় ব্যস্ত। চারদিকে থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনগুলো যেন শুনতেই পাচ্ছেন না তিনি। এরই মাঝে কেউ একজন হাত ধরে ঝাঁকালো, "কী হল? কিছু ভাবলেন?

এবার গ্রামের হেমন্তাই জেগে উঠল যেন। তিনি হুঙ্কার দিলেন, "হেমন্তাই বেঁচে আছে তো এখনও, চিন্তা করো না কেউ। এই জঙ্গল আমাদের। কেউ এতে হাত দিতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না।"

গ্রামবাসী যেন বুকে বল ফিরে পেল। তাদের সমবেত উল্লাস জানান দিল তাদের একতার।

এই সময়টায় গ্রামবাসীরা এক ধরনের মিষ্টি পিঠা খেতে পছন্দ করে। এই পিঠের সঙ্গে ভাত পঁচানো মদ খেয়ে শীতের দিনগুলোতে এরা আমোদ করে। হাতে হাতে আজ পিঠে বিতরণ হচ্ছে। প্রায় প্রতি ঘরেই এই পিঠে বানানো হচ্ছে। ভাত পঁচা সাদা মদ দিয়ে খাচ্ছে সবাই। ঝিম ঝিম ধরা

মাথায়, কনকনে ঠান্ডায় বসে আগুন পোহাচ্ছে সবাই।

এমন সময় গাড়িটা এসে থামল। সবাই চকিতে তাকাল সেদিকে। কুয়াশায় দশ পনেরো ফুট দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকে। পিছন পিছন আরও একটা গাড়ি এসে থামলো। প্রথম গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন মি সিনহা আর রামানুজ। পিছনের গাড়িতে থেকে বেরিয়ে এল সশস্ত্র পুলিশ। দাসবাবু আজ অন্য কাজে গেছেন এদিকে আসতে পারেননি।

মিঃ সিনহাকে নিয়ে রামানুজ হেমন্তাইয়ের দিকে এগিয়ে এল। তারপর আসেপাশে একবার তাকাল। গ্রামবাসীদের অনেকেই খালি গায়ে আগুনের সামনে বসে আছে। দেখে কষ্ট হল তার। কিন্তু এখন ডিউটির সময়। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাই কাজ। গলা খাকারি দিয়ে সে বলল, "তিনদিন পর আমরা জঙ্গলে ঢুকব। আমাদের সঙ্গে আমাদের বিশাল ফোর্স ও সার্চ পার্টি থাকবে। আমরা চাইলে আপনাদের না জানিয়ে সরাসরিও এই কাজ করতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টা আপনাদের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর, তাই আপনাদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য আমরা তিনদিন সময় দিলাম।"

গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ একজন বলে উঠল, "কে মানছে আপনাদের কথা?"

কুয়াশায় দেখা গেল না কাউকে। রামানুজের মনে হল পিছন থেকে শব্দটা এসেছে। সে তাই পিছনে ফিরে বলল, "জানি আপনারা মানবেন না। তাই সরকারি শিলমোহরওয়ালা কাগজ আনিয়েছি সরকার থেকে। এতে লেখা আছে যদি আপনারা আমাদের বাঁধা দেন, তাহলে যে বা যারা আমাদের বাঁধা দেবে তাদের তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হবে। যদি পুরো গ্রাম বাঁধা দেয় পুরো গ্রামকেই আমরা গ্রেফতার করবো। জঙ্গলের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ গ্রামটাকে অধিগ্রহণও করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে জঙ্গল তো যাবেই, গ্রামটাও হারাবেন আপনারা। অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনারা পুনর্বাসন পাবেন অন্য কোথাও। কিন্তু এত বছরের সাধের গ্রাম থেকে দূরে গিয়ে নিশ্চয়ই

আপনারা থাকতে চাইবেন না। মন্দিরগুলোও সেক্ষেত্রে ভাঙা পড়বে।"

কয়েকজন গ্রামবাসী রামানুজের কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই তেড়ে এল তার দিকে। সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে এসে থামাল তাদের। চিৎকার শুরু করল সকলে। হইহল্লাসহ একটা গণ্ডগোল লাগার পরিস্থিতি সৃষ্টি হল।

রামানুজ দমল না। সে তার বাকি কথা সম্পূর্ণ করল। সে বলল, "আমাদের সুষ্ঠুভাবে আমাদের কাজ করতে দিলে আপনাদের পক্ষেই মঙ্গল। আমরা জঙ্গলে যাবো, ভিতরে ঢুকব, জঙ্গল পরিদর্শন করে বেরিয়ে যাব। আপনাদের কোনোভাবে বিরক্ত করব না আমরা। যদি আমরা জঙ্গলে যাবার ফলে কোনো ক্ষতি হয় সে গ্রামেরই হোক বা কোনো মানুষেরই হোক, তবে সেই ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন।"

রামানুজ কথা শেষ করলেন। চারদিক থেকে আওয়াজ আসছে, "তোর জিভ ছিঁড়ে নেবো।"

"আমাদের দেবতার মন্দির ভাঙার কথা মুখে আনলি কীভাবে?"

"জঙ্গলে ঢুকলে কেউ ফেরত আসে না। যা গিয়ে মর।"

নানান কথা ভেসে আসছে। ফোর্স চারদিকের বিশৃঙ্খলা আয়ত্তে আনতে রাইফেল তাগ করে আছে। মিঃ সিনহা অব্দি সার্ভিস রিভলভার বের করে রামানুজকে গার্ড করছেন। রামানুজ ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্তাই এবার উঠে দাঁড়ালেন। রামানুজ তার দিকেই এগিয়ে গেল। গিয়ে তাকে হাত জোর করে প্রণাম করল। মুখে বলল, "নিন ধরুন। আর সেদিন আপনার উপর রাইফেল তাগ করেছিলাম বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি এই গ্রামের মাথা। পারলে সবাইকে বোঝাবেন। তিনদিন সময় রইল হাতে। আসি।"

হেমন্তাই নীচু স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তিন দিনে লারবো তো আমি এত বছরের সংস্কার থেকে সবাইকে মুক্তি দিতে!"

রামানুজ এবার হেমন্তাইয়ের চোখে চোখ রাখল। অদ্ভুত এই দৃষ্টি। তাকানো যাচ্ছে না হেমন্তাইয়ে চোখের দিকে। একইসঙ্গে তেজিয়ান অথচ

ভীষণ অসহায় এই দৃষ্টি। এরই মাঝে একজন রামানুজকে তাগ করে একটা ছোট পাথর ছুড়ল। তার বুকে এসে লাগল পাথরটা। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সে। হেমন্তাই চিৎকার করে বললেন, "কেউ ওকে ছোঁবে না। কেউ পাথর মারবে না। ওদের সসম্মানে যেতে দাও।"

রামানুজ এবার অবাক হল। হেমন্তাই থেকে এই আচরণ সে আশা করেনি। আর দেরি করল না তারা। মিঃ সিনহা এসে তাড়া দিলেন।

"চলুন স্যর। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন সুরক্ষিত নয় এখানে থাকা।"

গার্ড করে রামানুজকে গাড়িতে তুলে দু-টো গাড়িই বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে। হেমন্তাইয়ের নির্দেশের পর আর কেউই ওদের উপর হামলা করল না।

ওরা চলে যাবার পর বাকিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি শুরু করল। বেশিরভাগই আবার নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ল। কিন্তু হেমন্তাই বসলেন না। তিনি হাতের কাগজটা নিয়ে সোজা হাঁটতে লাগলেন। তার গন্তব্যের অভিমুখ আবাসনের দিকে।

আবাসনের সামনে হেমন্তাই দেখলেন এই কুয়াশার মধ্যেই ছাত্ররা নিজের নিজের শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী পাঠাভ্যাস করছে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এই আবাসন। হেমন্তাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন সমস্ত ব্যবস্থাপনা। বেশ কিছুদিন পরে তিনি আবাসনে এসেছেন। আবাসনের গুরুদেব এখনও তাঁর আসার খবর পাননি। পেলে নিশ্চয়ই তিনি ছুটে আসতেন।

হেমন্তাই জানেন, তাঁর সমস্ত কিছু নির্ভর করে এই আবাসনের উপর। এই জঙ্গলকে রক্ষা করতে এই আবাসনের গুরুত্ব সর্বাধিক। তিনি একে একে আবাসনের প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে ঢুকতে লাগলেন।

এই গ্রামের গ্রামবাসীরা আলাদাভাবে কোথাও বিদ্যাভ্যাস করে না, কোনও সরকারি বিদ্যালয়ে যায় না। তারা নিজেদের মতো একটি বিদ্যালয় তৈরি করেছেন। এই আবাসনই সেই বিদ্যালয়। এখানে সাধারণ সিলেবাসভিত্তিক

পড়াশোনা করানো হয় না। তবুও পরীক্ষা দিতে হয় সকলকেই। এই আবাসনের ছাত্রছাত্রীরা সমবয়সী শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে পাল্লা দিতে পারবে, আবাসন সেভাবেই তৈরি করে একেকজন ছাত্রকে। আর আবাসনের লক্ষ্য শুধু বিদ্যালয় থেকে পাশ থেকে চাকরি করার মতো তুচ্ছ ব্যপার নয়, আবাসনে লক্ষ্য মানবজাতিকে রক্ষা করা। অনেক বেশি কঠিন এই শিক্ষাপ্রণালী।

ছোট বয়স থেকেই গ্রামের পিতা মাতারা তাদের বাচ্চাদের এই আবাসনে ভর্তি করে দেয়। একেকটা বাচ্চাকে তৈরি করতে দশ থেকে পনেরো বছর সময় নেয় আবাসনের গুরুমশাইয়েরা। প্রতি বারো বছর অন্তর এখান থেকেই বাছাই করা হয় সেরা বারোজনকে। এই বারোজনকেই সসম্মানে জঙ্গলে পাঠানো হয়। জীবনকে বাজি রেখে ওরা জঙ্গলে জীবনের শেষ বারো বছর কাটিয়ে দেন।

হেমন্তাই দেখলেন, কিছু শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের বোঝানো হচ্ছে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির উপায়। কিছু শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন পদার্থের ঔষধি গুণাগুণ শেখানো হচ্ছে। কোনো শ্রেণীকক্ষে ডাক্তারি পড়ানো হচ্ছে। কোথাও বা দেওয়া হচ্ছে অঙ্কের শিক্ষা। শারীরবিদ্যায় পারদর্শী হবার কৌশল শেখানো হচ্ছে কোনো কক্ষে। এগুলো সবই তুলনামূলকভাবে আঠারো বা তার চেয়ে বেশি বয়সের যুবকদের শেখানো হচ্ছে। যারা ছোট তাদের পড়ানো হচ্ছে সাধারণ বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান। বয়সানুযায়ী একেক বয়সের বাচ্চা, কিশোর বা যুবকদের সেরকম পড়াশোনা করানো হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে এই গ্রামে চলে আসছে এই রীতি। এখানকার গুরুমশাইয়েরাও এই আবাসনেরই ছাত্র ছিলেন। এই গ্রামের তুলনামূলক এই ছোট আবাসন পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমস্ত বিষয়ে কতটা উন্নত তা বহির্বিশ্বের কেউ বিশ্বাস করবে না। উপজাতি হয়েও যে এত সুন্দরভাবে ওরা কথা বলতে পারে বাইরের লোকেদের সঙ্গে, সমস্ত বিষয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, অস্ত্র চালনা করতে পারে— এ সবই পুরাকাল থেকে

এই আবাসনের কক্ষগুলোতে শিক্ষালব্ধ ফলাফল। উপজাতি রীতি অনুসারে যে জঙ্গল থেকে আগত শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, সেই তীর ধনুক কিংবা তলোয়ার চালনা শেখানো হয় এই আবাসনেই। আবাসনের ভিতরের দিকে রয়েছে বড় সর জায়গা। সেখানে মল্ল যুদ্ধ থেকে শুরু করে মুগুর ভাজা, তলোয়ার, বর্শা সহ বিভিন্ন অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়।

হেমন্তাই হাঁটতে হাঁটতে এখন চলে এসেছেন সেই খোলা জায়গায়। আবহাওয়া প্রতিকূল বলে আজ কোনো অস্ত্র শিক্ষা হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছু ছাত্র এখানে শরীরচর্চাসহ বিভিন্ন কার্যকলাপ করছে। এদের মধ্যেই কেউ ভবিষ্যতে জঙ্গলে প্রবেশ করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

হাঁটতে হাঁটতে এবার হেমন্তাই রওনা দিলেন আবাসনে অপর প্রান্তে। ওই প্রান্তটি গ্রামের ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ। বিদ্যাশিক্ষা সবার একত্রে হলেও কিছু বিশেষ শিক্ষা শুধুমাত্র ছাত্রীদের দেওয়া হয়। যেরকম ছাত্রদের জঙ্গলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর থেকে কীভাবে নিজেদের আত্মরক্ষাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করা হয় তেমনি ছাত্রীদের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে প্রতি বারো বছর অন্তর হেমন্তাই পরিবর্তন করার প্রক্রিয়ায়। এই গ্রামের পূর্বপুরুষেরা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যেই দু'টো আলাদা অথচ একই প্রকার জটিল কার্য নির্ধারণ করেছিলেন। আজকের দিনেও সেই রীতি পালন করা হচ্ছে। পুরুষ বা নারী কেউই এই গ্রামে একে অপরকে বলতে পারে না যে এর কাজটা সহজ ওর কাজটা কঠিন। দু-টো কাজই দিনের শেষে যুক্ত হলে পর গ্রামের কল্যাণ সাধন হবে। একা কেউ যথেষ্ট নয়। কারণ হেমন্তাই ছাড়া গ্রামের অমাবস্যা রাতের ক্রিয়াদি, বারোজন যুবকের জঙ্গলে প্রবেশ ক্রিয়া সমস্ত অচল। এদিকে হেমন্তাই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেরা ছাত্রীরা অংশগ্রহণ না করলে হেমন্তাই নির্বাচিত হবে না। সমস্তটাই একটা ক্রমাগত ঘটে-চলা ক্রিয়ার অংশ। যেকোনো একটা অংশকে তার স্থানচ্যুত করলে সম্পূর্ণ সিস্টেমটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হেমন্তাই ছাত্রীদের অংশে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানেও ছাত্রীরা নির্দিষ্ট

শারীরবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যস্ত। হেমন্তাই নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে কাউকেই ব্যস্ত সমস্ত করলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন হেমন্তাইকে দেখে আবাসনের গুরুদেবকে জানিয়েছিলেন। গুরুদেব খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হলেন হেমন্তাইয়ের কাছে। এসেই প্রণাম করলেন।

"আপনি পরিদর্শনে আসবেন আগে জানালে আমি আপনাকে আনার জন্য কাউকে পাঠাতাম।"

হেমন্তাই হাসলেন। বললেন, "হঠাৎই এলাম। পূর্বপরিকল্পিত নয়। চারদিকে খুব নিষ্ঠা ভরে কাজ হচ্ছে দেখে মন শান্তিতে ভরে উঠল।"

গুরুদেব বললেন, "আপনি কার্যালয়ের দিকে চলুন। সেখানে বসে কথা হবে।"

হেমন্তাই এবার একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, "দিন তো এগিয়ে এল। প্রস্তুতি কীরকম?"

গুরুদেব চিন্তিত হলেন না। বললেন, "ইতিমধ্যে বাছাই পর্ব সম্পূর্ণ। সেরা বারোজন ছাত্র আমরা পেয়ে গেছি।"

কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন হেমন্তাই। পরক্ষণেই ফুটে উঠল চিন্তার ভাঁজ, "আর ছাত্রী?"

গুরুদেব এবারেও তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন, "সেরা ছাত্রীর চয়নও সম্পূর্ণ।"

হেমন্তাই এবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "আমি কি তাদের সঙ্গে এখন একবার দেখা করতে পারি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন। আমাকে কিছুক্ষণ সময় দিন দিন। ওদের তৈরি করে আলাদা কক্ষে পাঠাচ্ছি।"

কথাটা বলেই গুরুদেব সহকারী একজন শিক্ষককে নির্দেশ দিলেন। হেমন্তাই কিছুটা আপন মনেই বলতে লাগলেন, "আসলে এবারের পরিস্থিতি খানিক জটিল। বন-দপ্তরের যে লোকটা এবার দায়িত্বে আছে সে লোক তার দায়িত্বের প্রতি যত্নবান। লোক মন্দ নয়। কিন্তু তাতে তো

আমাদের কাজে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে বেশি। এদিকে বারো বছরও সম্পূর্ণ। অমাবস্যার আর দিন সাতেক বাকি। সেই অফিসার একটু আগে এসে আমাকে এই কাগজটা দিল। সরকারি নোটিশ। তিনদিনের মাথায় জঙ্গল পরিদর্শন করবে বাহিনী নামিয়ে। কীভাবে যে এদের আটকাই বুঝতে পারছি না। এদিকে মনটা হয়ে উঠেছে চঞ্চল। হেমন্তাই হবার শেষ সাতটা দিন খুব ধকল যাবে মনের উপর।"

হেমন্তাই থামলে গুরুদেব বললেন, "আপনি শুধু ক্রিয়াদির কথা ভাবুন। তিনদিনের মাথায় ওরা আসবে তাই তো! আচ্ছা দেখছি।"

গুরুদেবের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেন হেমন্তাই। কিছুক্ষণের মধ্যে কক্ষে সকলে উপস্থিত হলে একজন সহকারী এসে গুরুদেবকে তা জানালো। গুরুদেব বললেন, "চলুন। সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।"

একটা বড় কক্ষে উপস্থিত হল সবাই। একটা সরলরেখায় সকলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একটা ছোট মঞ্চ। সেখানে হেমন্তাই আর গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। ছাত্ররা সকলেই পরে আছে আবাসন অনুমোদিত সাদা থান বস্ত্র। ছাত্রদের উদ্দেশে হেমন্তাই বললেন, "আপনারা সবাই সৌভাগ্যবান। আমাদের গ্রামের সকলে জীবনভর যে কার্য করার জন্য ছেলেবেলা থেকে প্রাণপাত করে আপনাদের সে কার্য সাধনের জন্য চয়ন করা হয়েছে। আপনাদের উপর গুরু দায়িত্ব থাকবে শুধু আমাদের গ্রাম নয়, সম্পূর্ণ মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার। আপনাদের পূর্ববর্তী সকলেই যে কার্যে অসফল থেকেছেন আমি আশা করব আপনারা সে কার্যে সফল হবেন।"

ছাত্র তাঁদের ডান হাত তাঁদের বুকের বাঁ-দিকে ছুঁয়ে হেমন্তাইকে অভিবাদন জানাল। এবার হেমন্তাই কক্ষে উপস্থিত একমাত্র ছাত্রীর দিকে তাকালেন। সেও এক খণ্ড থান বস্ত্র পরিহিতা। কিন্তু বিশেষ উপায়ে থান বস্ত্রটিকে শাড়ির আদলে পরিধান করেছে সেই ছাত্রী। তারও ডান হাত উন্মুক্ত। কোনো বক্ষবন্ধনী সে পরেনি। ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে হেমন্তাই চোখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ খুলে গুরুদেবের দিকে তাকালেন। গুরুদেব তাঁর

কানের কাছে মুখ এনে অতি নিম্ন স্বরে বললেন, "সে-ই ছাত্রীদের মধ্যে এই কার্য সম্পাদনে শ্রেষ্ঠ। আমি সর্বপ্রকার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

হেমন্তাই নিজেকে যথাযথ সংযত করলেন। তারপর ছাত্রীটির উদ্দেশে বললেন, "সফলতার সঙ্গে এই উচ্চতায় উপনীত হবার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আপনিও সৌভাগ্যবতী। শুধু সৌভাগ্যবতী নন, আপনি নারীশ্রেষ্ঠা। আমাদের গ্রাম পুরুষ ও নারীতে ভেদাভেদ করে না। এই বারোজন পুরুষ বারো বছর ধরে অধ্যাবসার পর আগামী বারো বছর যে কার্যে ন্যস্ত থাকবে আপনাকে একদিনে সেই কার্যের আধার নির্মাণ করতে হবে। সে হিসেবে আপনি একাই এই বারোজন ছাত্রের সমকক্ষ। আপনার উপর নির্ভর করবে এই গ্রামের ভবিষ্যৎ। পরবর্তী হেমন্তাই চয়নের ক্রিয়া খুবই ভয়াবহ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই আপনি এই কর্মের জন্য নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করেছেন বলে।"

হেমন্তাই সকলের উদ্দেশে প্রণাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা দিলেন। তাঁর মনটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

* * * * * * * * * *

সেদিন বিকেলের দিকে রামানুজ ভাবল আশেপাশের এলাকা একটু হেঁটে দেখবে। সেই মতো অন্ধকার নামার আগেই সে বাংলো থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। রক্ষীরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে থাকল। সিনহা একটু থানায় গেছেন। দাসবাবু একটু রেস্ট করছেন। বললেই তিনি উঠে চলে আসবেন। কিন্তু রামানুজের একটু একা হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে ছিল। রক্ষীদের সে বারণ করল না কারণ একসঙ্গে সকল প্রোটোকল ভাঙাটা উচিত হবে না।

এদিকটায় রাস্তা আঁকা বাঁকা, পাহাড়ি পথে যেরকম হয় আর কি। একদিকে জঙ্গল অন্যদিকে খাদ। তবে খাদ এদিকটায় এতটা গভীর নয়।

যত এগোচ্ছে সড়ক খাদ তত গভীর হচ্ছে। টিলা জমিতে চাষবাসের ব্যবস্থা, জুম চাষ বলে এই পদ্ধতিকে। টিলা জমিকে ভাগে ভাগে কেটে এই চাষের ব্যবস্থা করা হয়। কিছু গ্রামবাসী এখন ফসলে জল দিচ্ছে। স্প্রিন্টার চালু করে দিয়েছে তারা। স্প্রিন্টার ঘুরছে আর প্রতিবার চারদিকের ফসলে জল ছিটে পড়ছে। সুন্দর ব্যবস্থা। শীতের দিনের প্রায় সকল ফসলই চোখে পড়ছে। রামানুজ আল বেয়ে জুমের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সুন্দর নিটোল বাঁধা কপি, ফুলকপিদের দেখে এখনই সবজি বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে তার। একজায়গায় এক চাষি মুলো তুলে বড় বাক্সে রাখছে। সাদা সাদা মুলোগুলি এত তরতাজা আর নধর দেখতে যে জিভ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে যেন। বিভিন্নরকম শাক সবজির চাষ হচ্ছে ভাগে ভাগে। আগামীকালকের বাজারের জন্য কিছু সবজি তোলা হচ্ছে। বাকিগুলোর পরিচর্যা করা হচ্ছে। থরে থরে সাজানো সজনে ডাটা, ঝিঙা, বেগুন, মটরসুটি। ছোট ছোট ঠেলাগাড়ি করে সেগুলো গ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। রামানুন এরকম এক চাষিকে বলল, "কিছু সবজি কেনা যাবে?"

গ্রামবাসী লোকটা রামানুজকে চিনতে পারল। সে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "কী কিনতে চান?'

"যা যা আছে সবই কিনতে চাই। দু-দিনের হিসেবে আর দিনে সাত আটজনের হিসেবে বাংলোতে দিয়ে এসো।"

রামানুজের এই কথায় কিছুটা ক্ষেপে গেল লোকটা। বলল, "কিন্তু আমরা তো ঢুকি না বাংলো-তে? পাহারা বসিয়ে আমাদের বাংলোর যেতে বলছেন!"

রামানুজ বুঝল সে ভুল করে ফেলেছে। সে স্বর নরম করে বলল, "আরে সে সবার জন্য নাকি! আচ্ছা এক কাজ করো। ওই যে আমার রক্ষীরা ওখানে আছে। ওদেরকে ঝোলায় ভরে দিয়ে দাও। আর শুধু আজকে নয়, প্রতি দু-দিনে এরকম তাজা সবজি তুমি আমাকে দিয়ে

আসবে।"

রামানুজ কথা বলতে বলতে ওয়ালেট বের করে দু-টো পাঁচশো টাকা তার হাতে দিল। সে ভেবেছিল সবরকমের তরকারি, তার উপর দু-দিনের বাজার, সাত-আটজন খাবার লোক। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আবার ক্ষেপে গেল।

"ইয়ার্কি করছেন! নাকি আমাকে কিনতে চাইছেন?"

রামানুজ এবার অবাক হয়ে বলল, "আরে কী মুশকিল, সবজি কিনতে চাইছি শুধু। এত রকমের তরকারি। তার উপর দু-দিনের বাজার।"

লোকটা বলল, "এটা একটা বাজার নাকি! দু-শো টাকাও তো হল না।"

রামানুজ আকাশ থেকে পড়ল, বলল, "ক... কী... কী! এত সবজি দু-শো টাকাও হয়নি।"

"না হয়নি।"

লোকটা এবার সবজি গোছাতে মন দিয়েছে। পাঁচ ছ-টা ছোট ছোট ব্যাগে সব সবজি গুছিয়ে বলল, "নিন, একশো পঁচিশ টাকা হয়েছে।"

রামানুজ এবার আশ্চর্য হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সে পকেটে থেকে খুচরো বের করে এগিয়ে দিল। মুখ ফসকে একবার বলল, "এদিকে এত সস্তা!"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, একটু সস্তা এদিকে। নাহলে আপনি আমাদের গ্রামের অকল্যাণ করতে এসেছেন, আপনাকে আরও কাটা উচিত ছিল। নেহাত সে বিদ্যে জানি না আমরা।"

রামানুজ দেখল প্রসঙ্গ অন্যদিকে যাচ্ছে। সে রক্ষীদের একজনকে ডেকে বলল, "বাজারগুলো কেউ বাংলোতে নিয়ে যাও।"

রক্ষী বলল, "কিন্তু আপনাকে একা ছাড়ার অনুমতি নেই। অন্তত দু-জনকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে।"

রামানুজ এসব প্রোটোকল জানে। সে বলল, "বেশ। একজন গিয়ে রেখে এসো বাজারটা।"

রক্ষী সমস্ত কিছু একটা বড় ব্যাগে ঢুকিয়ে চলে গেল। লোকটা বলল,

"নতুন ব্যাগ দিয়েছি। আমার নিজের ব্যাগ। বাংলোয় গিয়ে নিয়ে আসবো পরশু দিন। দেখবেন, আবার পুলিশ ছুঁইয়ে দেবেন না।"

রামানুজ হো হো করে হেসে উঠল। মুখে বলল, "নির্ভয়ে এসো।"

ওরা চলে যেতে রামানুজ এই পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর এগোনো উচিৎ হবে না। তবু রামানুজ একটা অন্য উদ্দেশ্যে আরও খানিকটা এগোচ্ছে। জঙ্গলটা এদিক দিয়ে কতটা গভীর অব্দি দেখা যায় দেখাটাই তার উদ্দেশ্য। এই জায়গাটা মূল সড়ক থেকে অনেকটাই উপরে। আরেকটু এগিয়ে গেলে এই অংশের পাহাড়ি অঞ্চলের শেষ প্রান্ত। সেখান থেকে জঙ্গলের ভিতরের একটা গোটা দৃশ্য চোখে পড়ার কথা। এখন আর আশেপাশে কেউ নেই। প্রায় সবাই ফিরে গেছে গ্রামের দিকে। এদিকটা জনশূন্য। তবুও মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে দেখে নিচ্ছে রামানুজ। উপজাতিদের বিশ্বাস নেই। নলে ফুঁ দিয়ে বিষ-মাখা ফলা চালনাতেও ওরা সিদ্ধ হস্ত। এর থেকে বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তে নিজের হাঁটা পথটা অল্প করে পালটে পালটে হাঁটছে সে। মূলত ঘাড়ের অংশটাকে রক্ষা করতেই ক্রমাগত ঘাড় নাড়াচ্ছে সে। একসময় একদম শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল সে।

খাদের শেষ অংশ থেকে শুরু করে সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বনভূমি। এই সেই জঙ্গল যা ভিতরে প্রথম শ করে সমস্ত সমাধান করার জন্যেই তার ত্রিপুরা আগমন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত প্রাণ ভরে সবুজের সমারোহ দেখল রামানুজ। এত বড় এলাকা জুড়ে জঙ্গল যে যেখানেই চোখ যাচ্ছে সেখানেই আটকে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে এলেও সূর্য একেবারে ডুবে যায়নি। দিগন্তের শেষ প্রান্ত লাল আভায় ছেয়ে আছে। বনভূমির উপরের ফাঁকা শূন্য স্থানে পেঁজা তুলো মেঘ এসে স্থান ভরাট করেছে। যেন বনভূমির লজ্জা নিবারণের চেষ্টার আছে এই মেঘ। রামানুজের সামনেই এক খণ্ড মেঘের টুকরো ভাসছিল। বিভোর হয়ে রামানুজ তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেদিকে। সে এমনিতেই দাঁড়িয়ে ছিল খাদের প্রান্তে। আরও দু-পা

এগোতেই পায়ের নীচের পাথর কেঁপে উঠল। তাতে ভ্রুক্ষেপ করল না সে। বরং আরেকটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আর এক দু ইঞ্চি। তাহলেই মেঘ রূপী ঘন ঠান্ডা কুয়াশায় হাত লেগে হাত ভিজে উঠবে তার। আর এক ইঞ্চি।

অবশেষে মেঘের গায়ে আঙুল ঠেকল রামানুজের। আর তখনই পায়ের নীচের পাথরটা গেল ভেঙে। চেতনা ফিরল রামানুজের। সে টাল সামলাতে পারল না। নীচে তার জন্য অপেক্ষা করছে প্রায় কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। নিশ্চিত মৃত্যু উপস্থিত।

হাঁটু ভেঙে সামনের দিকে পড়ার মুহূর্তেই কেউ যেন পাশ থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দিকে। রামানুজকে নিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল পিছনের দিকে।

"স্যর আপনি কি পাগল নাকি! এক্ষুনি মারা পড়তেন।"

পাথরের শক্ত জমিতেও হালকা সবুজ ভেজা ঘাসের রাশি। পাথরের সঙ্গে যেখানে মাটি মিশেছে সেখানেই শিকড় খুঁজে নিয়েছে আশ্রয়। দু-জনের গায়ে হাতেও লেগে গিয়েছে সেই ভিজে সবুজ ঘাস। রামানুজ এই অবস্থাতেও মুচকি হেসে বলল, "ফরেস্ট অফিসার হয়ে যদি জঙ্গল আর প্রকৃতির প্রেমে পাগলই না হলাম তবে ওদের রক্ষা করবো কীভাবে। আর এই দেখো, প্রকৃতি তোমাকে পাঠালো আমাকে রক্ষা করার জন্য।"

কাঞ্চন এসব কাব্যিক কথায় গলল না। সে নিজের হাতে পায়ের ছড়ে যাওয়া অংশ দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়াল। বলল, "না এরকম করবেন না আর। আমাদের জঙ্গলের সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। সে আপনাকে বশে নিয়ে এসব করাচ্ছে।"

রামানুজও এবার উঠে দাঁড়াল। শরীর ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "সম্মোহনী ক্ষমতা না থাকলে কি আর দিল্লির এসি রুম ছেড়ে এই এখানে আমাকে টেনে নিয়ে আসে! যা-ই হোক, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ। আসলেই অসাধারণ সৌন্দর্য, দেখে আত্মবিস্মৃত ঘটেছিল আমার।"

কাঞ্চন এবার জিজ্ঞেস করল, "এখানে কেন এসেছিলেন?"

রামানুজ জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "তোমরা তো ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছ না। ভাবলাম এখান থেকেই একটু দেখি। কিন্তু সে গুড়েও তো বালি।"

কাঞ্চন এতক্ষণে হাসল। হেসে বলল, "প্রথমত আমি আর ওই গ্রামবাসীরা আলাদা। আমি আপনাকে জঙ্গলে ঢুকতে আটকাইনি। আর দ্বিতীয় উত্তর হল, আমাদের জঙ্গল নিজেকে প্রথম এক কিলোমিটারের পর এতটাই গভীর করে ফেলেছে যে আপনি ভিতরের কিছু দেখতে পাবেন না। শুধু গাছের মাথাগুলো দেখতে পাবেন, তাও সেভাবে কিছু বোঝা যায় না।"

রামানুজ মাথা নাড়ল। তারপর দু-জনেই ফেরার রাস্তা ধরল। ফেরার পথে কৌতূহলবশত রামানুজ কাঞ্চনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাঞ্চন, তুমিও তো এই গ্রামের মানুষ। তোমার বাবা এই গ্রামের প্রধান। হেমন্তাইয়ের ছেলে হয়েও তুমি গ্রামের বাইরের লোক হলে কীভাবে? এই গ্রামের কেউ চাষবাসের বাইরে কোনো কাজ করে না। সেখানে তুমি আমাদের সরকারি বাংলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়েছো। ব্যাপারটা আমায় বলবে? দেখো আমি তোমার বড় ভাইয়ের মতো। আমাকে তুমি নিঃসংকোচে বলতে পারো।"

কথাটা বলে কাঞ্চনের পিঠে হাত দিল রামানুজ। শুরুর দিকের কথাগুলোতে কাঞ্চনের ভ্রু জোড়া কুঁচকে থাকলেও শেষের কথাটায় কাজ হল। কাঞ্চনের মনে হল বহু বছর পর কেউ তার খোঁজ নিচ্ছে। রামানুজকে তার আত্মীয়ের মতো মনে হল। সে বলল, "স্যর অনেক বড় গল্প। এত বড় গল্প বলার ধৈর্য্য নেই আমার।"

রামানুজ হেসে বলল, "সে না হয় আসল অংশগুলোই বলো। আর শোনো, তোমাকে এই একটু আগেই নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো বললাম, ভাই ভাইকে স্যর কেন বলবে। তুমি আমাকে দাদা বলতে

পারো।”

কাঞ্চনের মতো যারা পরিবারহীন, তাদের কাছে এসব কথা মূল্য অনেক। কাঞ্চনের চোখে জল আসত আরেকেটু হলে। নেহাত শক্ত-পোক্ত হৃদয়ের মানুষ। সামলে নিল নিজেকে। হাসি মুখে বলল, “ঠিক আছে দাদা। ঘরে চলো। একটা দারুণ কফি বানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। খেতে খেতে বলছি।”

বাংলোয় ফিরে নিজের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল রামানুজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া উঠা কফি মাগ নিয়ে হাজির হল কাঞ্চন। কফি খেতে খেতে সে বলল, “দাদা, আমি সম্পূর্ণ কাহিনি জানলেও সম্পূর্ণ কাহিনি আপনাকে বলবো না। কারণ সেটা সঠিকভাবে বলার মতো যোগ্য লোক আমি নই। তবে আমি নিশ্চিত যে কেউ-না কেউ এর মধ্যেই জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকা রহস্যসহ আরও নানাবিধ ব্যাপারে আপনাকে জানাবে। আমি শুধু আমার অংশটাই আপনাকে বলছি যে কী কারণে আজ আমি গ্রামে ব্রাত্য।”

রামানুজ এসব ক্ষেত্রে খুব একটা কথা বলে না। সে জানে যা-ই সে জানতে পারবে তা-ই নতুন তথ্য। সে মাথা নেড়ে নিজের কাহিনি বলতে বলে কাঞ্চনকে। কাঞ্চন শুরু করে, “আমাদের গ্রামে একটি আবাসন আছে। আমরা সকলে সেখানেই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ করি। ছাত্র ছাত্রী সকলেই একই আবাসনের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রীদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কর্মের জন্য আলাদা একটা ভাগ রয়েছে, যদিও অন্যান্য শিক্ষাদান ছাত্রছাত্রী উভয়ের একত্রেই। আমরা কখনো বাইরের কোনো বিদ্যালয়ে বা কলেজে যাই না। আমাদের সমস্ত কিছুই এই আবাসনে। এই আবাসনের শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো কোনো জায়গায় বাইরের পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার থেকেও উন্নত। আর তাছাড়া আমরা কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষালাভ করতে চাইনি। তাই আমাদের এখানেই সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের রীতিনীতি মেনে। এবার এই আবাসনের একটা বড় ভূমিকা আছে যা আমাদের জঙ্গল রক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। আমাদের গ্রামে প্রতি বারো বছর অন্তর একটি ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই গ্রাম যতদিন ধরে এখানে আছে, গ্রামের মানুষ যতদিন

ধরে এখানে বাস করে এই ক্রিয়ার বয়সও ঠিক ততই। অনাদি-অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এই রীতি। এই রীতি অনুসারে বারোজন যুবকের প্রয়োজন। এই যুবকেরা পড়াশোনা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদিতে তো শ্রেষ্ঠ হবেই, এর বাইরেও এরা শারীরিকভাবে হবে সুঠাম দেহের অধিকারী। অস্ত্রবিদ্যা থাকবে এদের নখদর্পনে। এই বারোজনকে সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হয় এই আবাসনের ভিতরে। ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের এই আবাসনে পাঠানো হয়। বারো-পনেরো বছরের নিরলস সাধনার পর সমগ্র গ্রামের সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বারোজনকে আবাসনের গুরুদেব চয়ন করেন এই ক্রিয়ার জন্য।"

রামানুজ কাঞ্চনকে থামাল, জিজ্ঞেস করল, "ক্রিয়াটা ঠিক কী?"

কাঞ্চন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আগেই তোমাকে বলেছি দাদা, সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। হ্যাঁ, তবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি এই বারোজনকে জঙ্গলে পাঠানো হয়। তারাই জঙ্গলকে তথা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।"

রামানুজ এই উত্তর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু আর কোনো কথা বলে না। কাঞ্চন বলতে থাকে, "আমাকেও আমার বাবা এই আবাসনে পাঠিয়েছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল আমিও একদিন এই গ্রামের সেরা বারোতে পরিণত হবো। বাবা নিজে সবসময়ই হেমন্তাইদের সঙ্গ করতেন। হেমন্তাই হবের স্বপ্ন তার দীর্ঘকালীন। এই গ্রামে তার প্রভাব যে কম নয় তা তো তুমি দেখেছোই। হেমন্তাই হবার পর এই প্রভাব আরও বেড়েছে সঙ্গত কারণে। কিন্তু আগেও কম ছিল না। যা-ই হোক, এই কারণেই বাবা চেয়েছিলেন আমিও তার দেখানো পথে হাঁটি। আর এখানেই গোলমাল হল। আমি কখনোই নিজে ওই বারোজনের একজন হতে চাইনি। আমি জানি ওই বারোজন সর্ব বিষয়ে পণ্ডিতমণ্য হলেও ওদের নিজস্ব কোনো জীবন নেই। গ্রামের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই ওদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমার সেই উদ্দেশ্য ছিল না। আমি সুস্থ স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিলাম।

গ্রামের বা মানবসভ্যতার কল্যাণের জন্য নিজেকে শহীদ করার মতো বড় মানসিকতা আমার ছিল না। তাই অল্পকালের মধ্যেই আবাসনের গুরুদেব এবং আমার বাবা বুঝে গেলেন আমার দ্বারা এসব হবে না। প্রতিবছর বাছাই চলতে থাকে। আমি প্রথম বছরেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলাম। ছিটকে গেলাম বটে, কিন্তু আবাসনে সাধারণ শিক্ষা আমার চলতে লাগল। সেই আবাসনে দুর্গা বলে একটি মেয়ে পড়তো। আমারই সমবয়সী। গ্রামে আমাদের ঘর থেকে দুর্গাদের ঘরের দূরত্বও খুব বেশি ছিল না। তাই আমি দুর্গাকে আগে থেকেই চিনতাম। আবাসনে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হল। আমরা ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে পড়াশোনা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত খেলাধূলা একসঙ্গেই করতাম। ছোটবেলা এসব করলে কেউ কিছু করতো না। কিন্তু সমস্যা বাড়তে লাগল যখন আমরা বড় হতে শুরু করলাম। কিশোর বয়সে এসে মোটামুটি একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমত আমি কোনোভাবেই সেরা বারোর আশেপাশেও নেই। এদিকে দুর্গা এই দৌড়ে রয়েছে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট। এই বারোজনের ব্যাপারটা তো শুধু ছাত্রদের মধ্যে ছিল। এখানে দুর্গা এল কী করে?"

রামানুজ আবার কাঞ্চনকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল। কাঞ্চন এবারে বেশ সপ্রতিভভাবে জানাল, "আমাকে সবটা বলতে দাও। সব বুঝে যাবে।"

রামানুজ মাথা নেড়ে ইশারায় তাকে কাহিনি চালু রাখতে বলে। কাঞ্চন বলতে থাকে, "ছাত্রদের ক্ষেত্রে বারোজনকে বাছাই করা হয় যে কাজের জন্যে সেই কাজের ক্ষেত্রে হেমন্তাইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার হেমন্তাই ছাড়া কাজ হবে না, আবার একসময়ে দু-জন হেমন্তাইও হতে পারবে না। একজন হেমন্তাই প্রতি বারো বছর অন্তর যে ক্রিয়া হয় তা সমাপন করার পর পরবর্তী হেমন্তাইয়ের চয়ন হবে। যদি এর মাঝে কোনো হেমন্তাইয়ের কোনো কারণে মৃত্যু ঘটে, তবে সম্পূর্ণ ক্রিয়া সেখানেই শেষ। কারণ ততক্ষণে আর অন্য কোনো হেমন্তাই উপস্থিত নেই গ্রামে। একবার

ক্রিয়া সমাপ্ত হলেও নতুন হেমন্তাইকে সমস্ত কিছু শিখিয়ে দিতে পারবেন পরবর্তী হেমন্তাই। আর এখানেই আবাসনের শ্রেষ্ঠ ছাত্রীর ভূমিকা। প্রতিবার যিনি হেমন্তাই হবেন সেই হেমন্তাই নির্বাচনের সবচেয়ে কঠিন অংশটি পালন করে সেই ছাত্রী। আমাদের গ্রামে পুরুষ নারী সকলের সম্মান সমান। কোনো ভেদাভেদ নেই। এবার সমস্ত ক্রিয়ার কথা ভাবুন। আবাসন ছাড়া ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা হবে না, বারোজন ছাত্র ছাড়া জঙ্গল রক্ষা হবে না, হেমন্তাই ছাড়া বারোজন ছাত্রের মধ্যে শক্তি সঞ্চালন হবে না আর শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছাড়া হেমন্তাই নির্বাচন হবে না। যেকোনো একটি অংশ কেটে দিলে সম্পূর্ণ ক্রিয়াটি সম্পন্নই হবে না। এবার বুঝলেন ব্যাপারটা।"

কাঞ্চনের প্রশ্নে রামানুজ সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, "যিনিই এই চক্রটি বানিয়েছিলেন তিনি অসম্ভব ক্ষুরধার মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন। সকলকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়ে গেছিলেন।"

কাঞ্চন সহমত পোষণ করে বলল, "তা তো বটেই। এই চক্রের সাফল্যের উপরেই সমস্ত কিছু নির্ভর করে প্রতিবার। যাক, এবার আসি দুর্গার ব্যাপারে। এবার দুর্গা ছিল সেই শ্রেষ্ঠ ছাত্রীর দৌড়ে অন্যতমা। আর যারা এই দৌড়ে থাকত, তাদের আবাসন কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে রাখত। তাদের যত্ন আত্তি থেকে শিক্ষা সমস্তই হত আলাদাভাবে। বাইরের যে কেউ চাইলেই যে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতে পারবে সেরকম উপায় ছিল না। তাই আমরা যত বড় হলাম বিশেষত আমাদের কৈশোর যখন শুরু হল ততদিনে আবাসন আর আমার বাবা আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। আর এখানে একটা মজার ব্যাপার ছিল, আমি যেরকম ঐ বারোজনের অংশ হতে মন থেকে চাইনি। দুর্গা কিন্তু ওই শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হতে চেয়েছিল যে কিনা হেমন্তাই নির্বাচনের মতো কার্য সমাধা করতে চাইত। আর এইজন্য সে প্রচুর পড়াশোনা করত, শারীরিকভাবে প্রচুর পরিশ্রম করত। বিভিন্ন রকম জটিল শারীরবিদ্যা সে করায়ত্ত করতে শুরু করে। তাই একটা সময়ের পর আমি অনেক কষ্টে সুযোগ বের করলেও

দুর্গা ধীরে ধীরে আমার থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করল। এই সহজ সত্যটা আমি অনেক দেরিতে বুঝতে পারলাম। আমি ভাবতাম আবাসন আর আমার বাবার কড়া পাহারার জন্য সে দেখা করতে চাইছে না। গত বছর আমার ভুল ভেঙে গেল আর খুব বাজেভাবেই ভাঙল।"

এইটুকু বলে কাঞ্চন থামল। রামানুজের হাতে কফি ফুরিয়েছে অনেক্ষণ। সে অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "থামলে কেন? কী ঘটেছিল গত বছর?

কাঞ্চন ম্লান মুখে বলল, "ক্ষতগুলোর কথা ভাবলে ক্ষতগুলো আবার তাজা হয়ে যায়।"

এসব কথার কোনো উত্তর হয় না। চুপ করে বসে থাকে রামানুজ। কাঞ্চন আরও কিছুক্ষণ পর বলে, "আমাদের গ্রামে একটা ছোট খেলার মাঠ আছে। আবাসনের সেরা ছাত্রছাত্রীদের মাসে একদিন আবাসনে বাইরে ঘোরার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি সেবার তক্কে তক্কে ছিলাম। সেরা ছাত্রীরা এই খেলার মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে ছোট ঝরনার দিকটায় চলে যায়। ওখানে ওরা সময় কাটায়। সেদিন যখন ছাত্রীরা মাঠ পেরিয়ে ঝরনার দিকে যাচ্ছিলো আমি পথের মাঝে রুখে দাঁড়ালাম। একেবারে দুর্গার সামনে গিয়ে বললাম, "চলো আমরা পালিয়ে যাই।"

দুর্গা স্বভাবতই চারদিকে তাকিয়ে বলল, "কী করছো এসব? রাস্তা ছাড়ো। সবাই দেখছে।"

আমি আসেপাশে তাকিয়ে দেখলাম সত্যি বাকি মেয়েরা দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। বিব্রত বোধ করলাম তবুও সেদিন আমি নাছোড়বান্দা ছিলাম। মনে হচ্ছিল আর এমন সুযোগ পাবো না। সুর নরম করে বললাম, "ঠিক আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াও। কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

দুর্গা কী ভাবল কে জানে, এগিয়ে গিয়ে তার বান্ধবীদের কী যেন বলল। ওরা আমার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে ঝরনার দিকে হাঁটতে থাকল। আমি এসবকে খুব একটা পাত্তা না দিয়ে মাঠের এক অংশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুর্গাও আমার সঙ্গে এল। সেখানে আমরা খুব বেশি হলে পাঁচ

মিনিট কথা বলার সময় পেয়েছিলাম। সেই পাঁচ মিনিটেই দুর্গা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই মুহূর্তে তার কাছে গ্রামের শ্রেষ্ঠা হওয়া ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন নেই। আমি তখনও বিশ্বাস করিনি। বিভিন্নভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমরা একসঙ্গে সংসার করলে আমি তাকে কতটা ভালো রাখতে পারবো। আসলে আমি তখনও স্বপ্নের দুনিয়ায় ভাসছিলাম। স্বপ্নটা ভেঙে গেল যখন আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যে গ্রামের শত শত লোক এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আবাসনের গুরুদেব থেকে শুরু করে আমার বাবা কে আসেনি সেদিন। লজ্জায় আমি মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম যেন। বাবাই প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হচ্ছে এখানে? কাঞ্চন তুমি দুর্গাকে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

আমি উত্তর দেবার আগেই দুর্গা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আসলে তার ভয় ছিল, এই কারণে না তাকে সেরা ছাত্রীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সে আমার আগে উত্তর দিয়েছিল, 'কাঞ্চন আমাকে জোর করে এখানে টেনে এনেছে।'

এই একটা কথাতেই আগুন ধরে গিয়েছিল জনতার মধ্যে। দুর্গার বান্ধবীরা এসে জানাল যে আমিই নাকি তাকে জোর করে এখানে টেনে এনেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়ে তার অসম্মান করেছি। পবিত্র ক্রিয়ার জন্য চয়ন করা গ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠাকে এভাবে অপমান করার জন্য গ্রামবাসী মারমুখী হয়ে উঠল। বাবা সে যাত্রায় আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। সেদিনই গ্রামে আমার শেষ দিন ছিল। কয়েকদিন আগে আমার উপর দিয়ে যেটা গেল এটা আসলে এক বছর ধরে পুষে রাখা রাগের বহিঃপ্রকাশ। তুমি শুধু অনুঘটকের কাজ করেছিলে।"

এতটুকুবলে কাঞ্চন থামল। রামানুজ তার পিঠে স্নেহের পরশ রাখল। "আর দুর্গার কী হল?"

কাঞ্চন শুকনো হেসে বলল, "সেদিন বাস্তবের সম্মুখীন হবার পর থেকে আর দুর্গার সম্মুখীন হইনি। হয়তো এতদিনে সে শ্রেষ্ঠা হয়ে গেছে। জানি

না আমি। তবে হ্যাঁ, যে জেদ সে দেখিয়েছে তাতে তার পক্ষে শ্রেষ্ঠা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।"

"হুম। ভাই এসব জানতে চেয়ে খুব দুঃখ দিয়ে ফেলেছি তোমাকে।"

"না দাদা, মাঝে মাঝে রোমন্থন করা ভালো। তাতে মাথাটা, মনটা সঠিক কাজ করতে পারে।"

"তোমার বাবা আর যোগাযোগ করে না?"

"না সেভাবে যোগাযোগ প্রায় নেই। পুরো এক বছর পর সেদিনই প্রথম গ্রামে যাই। একসঙ্গে খেয়েছিলাম আমরা সেদিন। হেমন্তাইকে এতটা অশক্ত এর আগে দেখিনি।"

রামানুজ কাঞ্চনের শেষ কথাটায় তার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বলল, "আরেক কাপ কফি এনে দাও।"

কাঞ্চন চলে গেল। রামানুজ একটা সিগরেট জ্বালল। ধোঁয়া ছেড়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। বহু প্রশ্ন জমা হচ্ছে মনে। জঙ্গলে কেন যাচ্ছে ওই বারোজন যুবক। কী আছে জঙ্গলে যা থেকে বারবার মানবসভ্যতাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবী করছে গ্রামবাসীরা। এমনকি কাঞ্চনও তো তাই মনে করে। হেমন্তাই নির্বাচনের প্রক্রিয়াটাই বা কী? আবাসনে ভিতরে এত উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অথচ বহির্বিশ্বের কেউ কিছুই জানে না। নাহ, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আরও ডিটেইলে জানতে হবে এসব। কিন্তু কে তাকে বিশ্বাস করে এসব বলবে? গ্রামের কেউ তো তাকে বিশ্বাসই করে না। বিশেষ করে কাঞ্চনের বাবা, হেমন্তাই।

কিন্তু কথায় আছে সবচেয়ে জটিল প্রশ্নের সমাধানটাও হয় আচমকা। তেমনি এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানটা রামানুজ পেয়ে গিয়েছিল হঠাৎ করেই। একদম অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হাজির হয়েছিল একদিন পর, সঙ্গে জুটেছিল আরও অনেক প্রশ্ন।

* * * * * * * * * * *

(৭)

আগের রাতেই ঠিক হয়েছিল আজ যেহেতু গ্রামে কোনো কাজ নেই এবং রবিবার পড়েছে তাই আজকে রামানুজকে উদয়পুরের মাতাবাড়ি দর্শন করাতে নিয়ে যাওয়া হবে। শীতের দিনে বিশেষত এই ডিসেম্বরের শেষ দিকটায় ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে ভিড়টা বাড়তে থাকে। ত্রিপুরায় এই দিনে শীতের দিনে সদলবলে পিকনিকে বেরিয়ে যাবার একটা রেওয়াজ আছে। সিপাহিজলা অভয়ারণ্য থেকে শুরু করে নীরমহল, রুদ্রসাগর, বিভিন্ন ইকো টুরিজম পার্কগুলোতে গ্যাস সিলিন্ডার, শাকসবজি, মুরগী-পাঁঠা সমস্ত কিছু নিয়ে হাজির হয় পিকনিক পার্টিগুলো। সারা রাস্তা লাউড মাইকে গান বাজাতে বাজাতে ওরা এগিয়ে চলে। সে এক দেখার বিষয়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে মোটামুটি সাজো সাজো রবে এসব পালন করা হতো। এখন উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তরা বাইরে ঘুরতে চলে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র স্তরের মানুষেরা এখনও ত্রিপুরার এই ট্র্যাডিশান বয়ে নিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম তো আছেই, কিন্তু সত্যি এটাই যে ত্রিপুরা ধীরে ধীরে কলকাতা হয়ে যাচ্ছে।

সকাল সকাল বড় এক্স ইউভি গাড়িতে সকলে রওনা দিলেন মাতাবাড়ির উদ্দেশে। রামানুজ বসলো সামনে, অজিত চালাচ্ছিলেন গাড়ি। সিনহা, দাসবাবু বসলেন মাঝে। রাধামাধব আর কাঞ্চন শেষে।

সুন্দর একটা গান বাজছিল। কিন্তু রামানুজের আবার ইতিহাস জানার খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। সে গানটা বন্ধ করে অজিতকে বলল, "অজিতদা, আজকে পৃথিবী বিখ্যাত ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে যাচ্ছি। যেতে যেতে আগরতলার ইতিহাস কিছু শুনবো না, তা হয়?

অজিত দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। বলল, "স্যার, গাড়ি চালাতে চালাতে

বলতে পারব না ইতিহাস। সিপাহীজলা পেরোলেই আঁকা বাঁকা রাস্তা শুরু হয়ে যাবে।"

সিনহা লুফে নিল কথাটা। বললেন, "একদম ঠিক কথা। গাড়ি আমি চালাচ্ছি। তুমি পিছনে এসে বসো আর গল্প শুরু করো। সেদিন তো একেবারে জমিয়ে দিয়েছিলে হে।"

অজিত কোনোমতেই বড়বাবুকে গাড়ি চালাতে দেবে না। এদিকে রামানুজসহ সকলেই আগরতলার ইতিহাস শুনতে চায়। শেষে অজিত সংখ্যাধিক্যের চাপে পড়ে মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে স্টিয়ারিং ছেড়ে পিছনে এসে বসলেন। সিনহা গাড়ি চালাতে লাগলেন।

রামানুজ তাড়া দিল, "আর দেরি করো না। দু-ঘণ্টার রাস্তা এমনিই কেটে যাবে।"

অজিত শুরু করলেন, "আমার শহর আগরতলার বয়স বেশি নয়। আজ থেকে মাত্র ১৮৫ বছর আগে, ১৮৩৮ সালে এর গোড়াপত্তন করেন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য। তখন পুরাতন আগরতলা এবং নতুন হাবেলি থেকে একযোগে রাজ কার্য চলতো। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বের শেষভাগে পুরাতন আগরতলা থেকে পাকাপাকিভাবে রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। মোগরা রোড যেটা বর্তমানে হরিগঙ্গা বসাক রোড নামে পরিচিত, আরও ভালোভাবে বললে যেটার উপর দিয়ে আমরা এখন যাব সেটা ছাড়া বড় রাস্তা তেমন ছিল না তখন। তাও এই রাস্তাটা ছিল কাঁচা রাস্তা। বীরচন্দ্রের সময়েই ১৮৭১ সালে আগরতলা পুরসভার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয় প্রথম ডাকঘর। ১৮৮৯ সালে রদ হয় সতীদাহ প্রথা। তার আগে ১৮৭৮ সালে বন্ধ হয় ক্রীতদাস প্রথা।

রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় থেকেই মূলত রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, স্কুলবাড়ি, হাসপাতালসহ একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। তাঁর সময়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আগরতলায় আসেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুসহ বহু প্রতিভাকে তিনি আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করেন। সে সময়ই

তৈরি হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল যা এইমাত্র আমরা পেরিয়ে এলাম। যদিও বাড়িটি তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক কাজের জন্য। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ার স্মৃতিসৌধ নির্মাণে দেশিয় রাজ্য ত্রিপুরার কাছে অর্থ সাহায্য দাবি করা হয়। সেই অর্থ না পাঠিয়ে অফিস বাড়িটি ভিক্টোরিয়ার নামে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয় ১৯০৪ সালে। এই যে উমাকান্ত অ্যাকাডেমি দেখছেন, আমি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। মাঝে এর নাম ছিল আগরতলা হাই স্কুল। একদম শুরুতে এর নাম ছিল নতুন হাবেলি বঙ্গ বিদ্যালয়। মহারানি তুলসীবতি বিদ্যালয়ের ছিল আগরতলা বালিকা বিদ্যালয় এবং বিজয়কুমার বিদ্যালয়ের নাম ছিল কৃষ্ণনগর পাঠশালা।

সেই সময়েই রাস্তার পাশে বাঁশের ডগায় হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময় কেরোসিনের হ্যারিকেনের বদলে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৫ সালে বীরবিক্রমের সময় 'আগরতলা ইলেকট্রিক্সাপ্লাই কোম্পানি' শহরে জেনারেটরের সাহায্যে শহরে আলোর ব্যবস্থা করে। বীরেন্দ্রকিশোরের সময় সর্বোচ্চ আপিল আদালত গঠিত হয়। খনিজ অনুসন্ধানে বার্মা অয়েল কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই সময়েই গড়ে উঠে চল্লিশটির মতো চা-বাগান। হাওড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে ১৯১৮ সালে প্রথম বটতলায় হাওড়ার উপর লোহার সেতু কারমাইকেল ব্রিজ দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় আগরতলা-বিশালগড় সড়ককে। তখন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার।

ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রমের সময়েই রাজ্যে একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার লক্ষ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জীবদ্দশায় তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তার নামাঙ্কিত এম বি বি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাঙ্গণ। তিনি দ্বিতীয়বারব ইউরোপ ঘুরে এসে রাজপথ সোজা এবং প্রশস্ত করার কাজে হাত দেন। তখনই তৈরি হয় আগরতলার বিখ্যা থামওয়ালা বারান্দা ফুটপাথ। একইসঙ্গে তৈরি করেছিলেন গোলবাজার, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বর্তমানে সেটি বিশাল এক বাজার এলাকা।

এক্ষেত্রে বলা যায়, উত্তর গেট থেকে রাজবাড়ির দিকে আসতে রাস্তার দু-ধারে এখনও থামওয়ালা বারান্দা দেখা যায়। এখানেই থাকত রাজাদের ঘোড়া। ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার জন্য ছিল গেটের পিছনে ময়দান যা আগরতলায় আস্তাবল ময়দান নামে পরিচিত। এই কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীও সেখানেই এসে ভাষণ দিয়ে গেছেন। বর্তমানে নাম স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান। আমার বাড়ি যেখানে, আগরতলার অন্যতম বাসিন্দা এলাকা রামনগর, সেটা একসময় ছিল ধানক্ষেত। বীরবিক্রমের সময় সমান্তরালভাবে এখানে রাস্তা নির্মাণ করে বসতি গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালে এখানে এক থেকে নয় নম্বর রাস্তা নির্মিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে উঠে আগরতলা বিমানবন্দর। সেই সিঙ্গারবিল বিমানবন্দর থেকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হল মাত্র দু-বছর আগে। উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সুন্দর বিমানবন্দর বর্তমানে আগরতলায় অবস্থিত। ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দরে উৎকৃষ্ট মানের বাঁশ বেতের কাজ দেখার মতো।

রাধাকিশোরের সময় আগরতলাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে আখাউড়া খাল, কালাপানিয়া খাল কাটা হয়। সঙ্গে তৈরিভয় আখাউড়া রাস্তাসহ অন্যান্য রাস্তা। এই আখাউড়া খাল দিয়েই ছিপ নৌকা আগরতলায় আসত বর্তমান বাংলাদেশ থেকে। ১৯২৪ সালে আখাউড়া রাস্তা ইটের মোরামে মুড়ে দেওয়া হয়। রাধাকিশোরের সময়েই সেন্ট্রাল রোড, মোগরা রোড ইটের মোরামে আচ্ছাদিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম আখাউড়া সড়কে পিচ ঢালাই হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী থেকে কারমাইকেল সেতু পর্যন্ত রোনাল্ডসে রোড ইটের মোরামে মুড়ে দেওয়া হয়। এই কারমাইকেল সেতুর জায়গাতেই বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় হাওড়া সেতু বা সুভাষ সেতু।

এই হল আমার শহর আগরতলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।"

এইটুকু বলে অজিত থামলেন। ততক্ষণে বিশ্রামগঞ্জ পেরিয়ে গেছে গাড়ি। বাকি রাস্তাটা পথ ঘাট পাহারি আঁকা বাঁকা দেখতে দেখতে কেটে গেল।

উদয়পুরে মাতাবাড়িতে গাড়ি এসে থামল। গাড়ি পার্ক করার সুব্যবস্থা আছে এই মন্দিরে। গাড়ি পার্ক করে সকলে চলে এল উত্তম পেড় ভাণ্ডারে। দাসবাবুর পরিচিত দোকান। এখানে আসার আগেই সমস্ত কিছু বলে রাখা ছিল। ঢুকতেই উত্তমবাবু সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, "আপনারা হাত মুখ ধুয়ে জুতো জোড়া এখানে রেখে মন্দিরে চলে যান। আরেকটু পর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগে মায়ের দর্শন করে নিন। আপনাদের ভোগের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

রামানুজেরা কেউ আর সময় নষ্ট করল না। মাতাবাড়ির পেড়া জগত বিখ্যাত। উত্তমবাবুর দোকানও পুরোনো। সেই সাবেকি ব্যপারটা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই দোকানের পেড়াসহ অন্যান্য পূজাসামগ্রী নিয়ে সকলে ছুটল মন্দিরে। কল্যান সাগর থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে সোজা বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। গরমের দিনে খালি পায়ে পা রাখা দায় হয়। শীতের দিনে সে সমস্যা নেই। আজকেও প্রচুর মানুষের ভিড় মন্দিরে। সকলে সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছল মন্দির প্রাঙ্গণে। টকটকে মিষ্টি লাল রঙের মন্দির। বিশাল জায়গা জুড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ। অন্তত তিন বিঘা তো হবেই। তার বাইরেও রয়েছে জায়গা যেখানে সংস্কার চলছে। মায়ের সামনে পৌঁছাতে লাইন ধরতে হল। লাইন ঘুরে মিনিট পনেরোর মধ্যেই মায়ের একদম সামনে পৌঁছল রামানুজ। পুরোহিতকে ভোগের মালসাটা এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করল। মায়ের মুখ দর্শন করল। সুন্দর লাল শাড়িতে সজ্জিতা ত্রিপুরাসুন্দরী মা। একইসঙ্গে প্রায় একইরকম দেখতে মায়ের দুই রূপ বর্তমান। পাঁচ ফুট লম্বা কালো পাথরের বিগ্রহটি ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর, ঠিক নীচে দুই ফুট লম্বা চণ্ডী মূর্তি। চণ্ডী মূর্তিটিকে সকলে ভক্তি ভরে ডাকে ছোট মা। কথিত আছে, এটা শক্তি পীঠের অন্যতম। এখানেই দেবী পার্বতীর ডান পা পড়েছিল।

সম্পূর্ণ মন্দিরটিকে কল্পনা করা হয়েছে একটা কচ্ছপের পিঠে অবস্থিত। সেই হিসেবে এই পীঠস্থানকে কূর্মপীঠও বলা হয়। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ। কল্যাণ সাগরের জলে প্রচুর মাছের সঙ্গে বয়স্ক কিছু কচ্ছপেরও দেখা পাওয়া যায়। দেবীকে প্রণাম করে রামানুজরা চলে গেল মন্দির প্রাঙ্গণের শেষভাগে। সেখানে শিবমন্দির রয়েছে। সেখানেও প্রণাম করে, চরণামৃত নিয়ে সকলে সিঁড়ি বেয়ে নামল কল্যাণ সাগরের কাছে। নামে সাগর হলেও আদতে বিশাল বড় পুকুর। পুকুরের পাড় বাঁধানো। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শনার্থীরা বসে আছে। কল্যাণ সাগরের মূল আকর্ষণ হল মাছ আর কচ্ছপ। বহু মানুষ মাছকে খাবার দেবার জন্য বিস্কুট, মুড়ি ইত্যাদি নিয়ে ঘুরছে। মাছগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যবসা। রামানুজ কিছু মুড়ি কিনে এগিয়ে গেল। একদম নীচের সিঁড়িতে পৌঁছে দেখল সিনহা আর দাসবাবুও চলে এসেছেন।

দাসবাবু বললেন, "মাছগুলোকে দেখুন। কী সুন্দর মুড়ি আর বিস্কুট খাচ্ছে।"

সিনহা মজা করে বললেন, "ওদের খেতে দেখে আমারও খিদে পেয়ে গেল। চলুন এখানে ভালো পরোটা সবজির পাওয়া যায়। গিয়ে খেয়ে আসি।"

রামানুজ বলল, "আরে আগে কচ্ছপের দেখা মিলুক।"

কাঞ্চন কখন এসে যোগ দিয়েছে বোঝা গেল না। বলল, "আরে দাদা, কচ্ছপের দেখা পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার। ওরা এত কাছে এখন আর আসে না। আমরা ছোট থাকতে অনেক কচ্ছপ ছিল। তখন দেখা যেত। আর তাছাড়া তুমি জানো, যেদিন এই কচ্ছপগুলো মারা যায় সেদিন ও সিঁড়ি বেয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।"

কাঞ্চনের এই কথায় রামানুজ বিস্মিত হল। বলল, "কী!! সত্যি!

দাসবাবু আর সিনহা একত্রে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, "একশো শতাংশ খাঁটি সত্যি।"

কাঞ্চনও সঙ্গে সম্মতিতে মাথা নাড়ল। রামানুজের মুখ হা হয়ে গেল। পদ্মনাভ মন্দিরে ববিতা কুমিরের কথা সে শুনেছিল। কুমিরটা নাকি নিরামিষভোজী ছিল। প্রসাদ খেয়ে দিন কাটাতো। পুকুরের মাছ খেত না। থাকতো মন্দির সংলগ্ন পুকুরে। সম্প্রতি পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করে মারা গেছে সেই কুমির। সনাতন মতে দাহ করা হয়েছে ববিতা কুমিরের। এখানে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরেও যে এই প্রথা বহু যুগ আগে থেকে চলে আসছে রামানুজ জানতোই না।

আর এসব যখন সে ভাবছে তখনই কাঞ্চন লাফিয়ে উঠল, "দাদা, ওই তো কচ্ছপ। ওই দেখুন। তাড়াতাড়ি দেখুন।"

এত জোরে লাফিয়ে উঠল কাঞ্চন যে বাকিরাও লাফিয়ে উঠল ওর চিৎকার শুনে। কাঞ্চনের আঙুল বরাবর তাকাতেই দেখা গেল কূর্মদেবকে। তিনি এগিয়ে আসছেন এদিকেই।

ধীরে ধীরে নিজের ভারী শরীর নিয়ে কচ্ছপটি এগিয়ে এল পুকুরের পাড়ে। সকল দর্শনার্থী প্রায় হুমড়িই খেয়ে পড়বার জোগাড়। রামানুজদের ভাগ্য ভালো তিনি একেবারে তাদের সামনে এসেই মাথা তুলে তাকালেন। জলের বাইরে মাথা আসতেই অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল। কচ্ছপের মাথায় ছুয়ে সকলে। প্রণাম করলেন। উদয়পুর মাতাবাড়ির চেনা দৃশ্য। রামানুজও দেখাদেখি তাই করল। দলের বাকিরাও তাই। সবার মন আনন্দে ভরে উঠল।

আর ঠিক তখনই ভিড়ের মাঝে সকলে তাঁকে দেখতে পেল। তিনি সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে সকলের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হল কাঞ্চন। তার বাবা, গ্রাম প্রধান হেমন্তাই দাঁড়িয়ে আছেন কল্যাণ সাগরের সিঁড়ির উপর।

* * * * * * * * * * *

কল্যাণ সাগরের সিঁড়ির এক কোণে বসে সকলে। রামানুজ হাঁটাহাঁটি করছে নীচের একটা সিঁড়িতে। রাধামাধব আর কাঞ্চন সকলের জন্য গরম পরোটা আর চা এনে দিয়েছে পাশের একটা মিষ্টির দোকান থেকে। হেমন্তাই চুপ করে বসে আছেন সকলের মাঝখানে। হেমন্তাই-ই সবার আগে বললেন, "আপনারা বিশ্বাস করুন, আজ গ্রামের প্রধান আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আজ এক পিতা এসেছে নিজের সন্তানের টানে। আমি বারকয়েক আপনাদের বাংলোর আশেপাশেও ঘোরাঘুরি করেছি রাতের দিকে। কিন্তু প্রহরী থাকায় ভিতরে ঢোকার সাহস আমার হয়নি।"

সিনহা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলেন, "ঠিক আছে। চা খেতে খেতে বলুন।"

কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন হেমন্তাই। তারপর বললেন, "দেখুন কীরকম নিজেকে কম্বলে মুড়ে এসেছি। গ্রামের কেউ যেন জানতে না পারে আমার এই আসার ব্যাপারে। ওদের বলে এসেছি সাধনার জন্য গুপ্তস্থানে

যাচ্ছি। নইলে ওরা কেউ আর আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন। আমার ছেলেটাকে আমি নিজে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছি। কিন্তু ওর গায়ে কাউকেই হাত দিতে দিইনি। সেদিন আমার ছাওয়ালটা যে কেন আবার গ্রামে ফিরে এসেছিল।"

বলেই চোখের কোণাটা মুছলেন এক পিতা। কাঞ্চন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না তার ঠিক কি করা উচিৎ। হেমন্তাই মিনিটখানেক পরে আবার বললেন, "আপনারা পরশু গ্রামে যাবেন। সেদিন হেমন্তাই হিসেবেই আপনাদের স্বাগত জানাব আমি। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে গ্রামবাসী আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলতে পারে। তাই আজ এক পিতা হিসেবে আপনাদের কিছু কাহিনি বলব। বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনাদের হাতে। কিন্তু আমি যা বলব তা খাঁটি সত্য কথা।"

রামানুজ এবার হাঁটা থামিয়ে হেমন্তাইয়ের সোজাসুজি এসে বসল। কথা না বাড়িয়ে সোজা বলল, "বেশ। সোজা কাহিনিটা আমাদের বলুন। আর সময় নষ্ট করা যাবে না।"

রামানুজকের এভাবে মুখোমুখি বসতে দেখে হেমন্তাই কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও সামলে নিলেন। শুরু করলেন তার কাহিনি—

"এই গ্রামে কী আছে বা কী নেই তা জানার আগে জানতে হবে অন্য এক কাহিনি। আশাকরি আপনারা সকলেই বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার, নরসিংহ অবতারের কাহিনি জানেন। তবুও আমি আপনাদের কাহিনিটা একবার রোমন্থন করাচ্ছি। নরসিংহ অবতারের উল্লেখ একাধিক পুরাণে পাওয়া যায়।

নরসিংহ অবতারের বর্ণনা রয়েছে ভাগবত পুরাণ (সপ্তম স্কন্দ), অগ্নিপুরাণ (৪।২-৩), ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২।৫।৩-২৯), বায়ুপুরাণ (৬৭।৬১-৬৬), হরিবংশ (৪১ এবং ৩।৪১-৪৭), ব্রহ্মাপুরাণ (২১৩।৪৪-৭৯), বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ (১।৫৪), কূর্মপুরাণ (১।১৫।১৮-৭২), মৎস্যপুরাণ (১৬১-১৬৩), পদ্মাপুরাণ (উত্তরখণ্ড,

৫।৪২), শিবপুরাণ (২।৪।৪৩ ও ৩।১০-১২), লিঙ্গপুরাণ (১।৯৫-৯৬), স্কন্দপুরাণ ৭ (২।১৮।৬০-১৩০) ও বিষ্ণুপুরাণ (১।১৬-২০) গ্রন্থে। মহাভারত-এও (৩।২৭২।৫৬-৬০) নৃসিংহ অবতারের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া একটি প্রাচীন বৈষ্ণব তাপনী উপনিষদ (নরসিংহ তাপনী উপনিষদ) তার নামে উল্লিখিত হয়েছে।

এর মধ্যে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত ঘটনাটাই জগত বিখ্যাত। সেখানে বর্ণিত আছে যে, নৃসিংহের পূর্ববর্তী অবতার বরাহ হিরণ্যাক্ষ নামে এক রাক্ষসকে বধ করেন। হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপু এই কারণে প্রবল বিষ্ণুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। দাদার হত্যার প্রতিশোধ মানসে তিনি বিষ্ণুকে হত্যা করার পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি মনে করেন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই জাতীয় প্রবল ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম। তিনি বহু বছর ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মাও হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। তিনি হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে বর দিতে চান। হিরণ্যকশিপু বলেন: হে প্রভু, হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে সত্যই বর দিতে চান, তবে এমন বর দিন যে বরে আপনার সৃষ্ট কোনো জীবের হস্তে আমার মৃত্যু ঘটবে না।

আমাকে এমন বর দিন যে বরে আমার বাসস্থানের অন্দরে বা বাহিরে আমার মৃত্যু ঘটবে না; দিবসে বা রাত্রিতে, ভূমিতে বা আকাশে আমার মৃত্যু হবে না। আমাকে এমন বর দিন যে বরে শস্ত্রাঘাতে, মনুষ্য বা পশুর হাতে আমার মৃত্যু হবে না।

আমাকে এমন বর দিন যে বরে কোনো জীবিত বা মৃত সত্তার হাতে আমার মৃত্যু হবে না; কোনো উপদেবতা, দৈত্য বা পাতালের মহানাগ আমাকে হত্যা করতে পারবে না; যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে কেউই হত্যা করতে পারে না; তাই আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমাকেও বর দিন যাতে আমারও কোনো প্রতিযোগী না থাকে। এমন বর দিন যাতে সকল জীবসত্তা ও প্রভুত্বকারী দেবতার উপর আমার একাধিপত্য স্থাপিত হয় এবং আমাকে সেই পদমর্যাদার উপযুক্ত সকল গৌরব প্রদান করুন। এছাড়া আমাকে

তপস্যা ও যোগসাধনার প্রাপ্তব্য সকল সিদ্ধিই প্রদান করুন, যা কোনোদিনও আমাকে ত্যাগ করবে না।

হিরণ্যকশিপু যখন মন্দার পর্বতে তপস্যা করছিলেন, তখন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তার প্রাসাদ আক্রমণ করেন। দেবর্ষি নারদ হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কায়াদুকে রক্ষা করেন। দেবর্ষি দেবগণের নিকট কায়াদুকে 'পাপহীনা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। নারদ কায়াদুকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যান। সেখানে কায়াদু প্রহ্লাদ নামে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নারদ প্রহ্লাদকে শিক্ষিত করে তোলেন। নারদের প্রভাবে প্রহ্লাদ হয়ে ওঠেন পরম বিষ্ণুভক্ত। এতে তার পিতা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ক্রমে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তিতে হিরণ্যকশিপু এতটাই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন যে তিনি নিজ পুত্রকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যতবারই তিনি বালক প্রহ্লাদকে বধ করতে যান, ততবারই বিষ্ণুর মায়াবলে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা পায়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলেন তাকে ত্রিভুবনের অধিপতি রূপে স্বীকার করে নিতে। প্রহ্লাদ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন একমাত্র বিষ্ণুই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ প্রভু। ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু তখন একটি স্তম্ভ দেখিয়ে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে 'তার বিষ্ণু' সেখানেও আছেন কিনা:

'ওরে হতভাগা প্রহ্লাদ, তুই সব সময়ই আমার থেকেও মহৎ এক পরম সত্তার কথা বলিস। এমন এক সত্তা যা সর্বত্র অধিষ্ঠিত, যা সকলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যা সর্বত্রব্যাপী। কিন্তু সে কোথায়? সে যদি সর্বত্র থাকে তবে আমার সম্মুখের এই স্তম্ভটিতে কেন নেই?'

প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, তিনি 'এই স্তম্ভে' ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

উপাখ্যানের অন্য একটি পাঠান্তর অনুযায়ী, প্রহ্লাদ বলেছিলেন, তিনি এই স্তম্ভে আছেন, এমনকি ক্ষুদ্রতম যষ্টিটিতেও আছেন। হিরণ্যকশিপু ক্রোধ সংবরণ করতে না-পেরে গদার আঘাতে স্তম্ভটি ভেঙে ফেলেন। তখনই সেই ভগ্ন স্তম্ভ থেকে প্রহ্লাদের সাহায্যার্থে নৃসিংহের মূর্তিতে আবির্ভূত হন বিষ্ণু। ব্রহ্মার বর যাতে বিফল না হয়, অথচ হিরণ্যকশিপুকেও হত্যা করা

যায়, সেই কারণেই বিষ্ণু নরসিংহের বেশ ধারণ করেন: হিরণ্যকশিপু দেবতা, মানব বা পশুর মধ্য নন, তাই নৃসিংহ পরিপূর্ণ দেবতা, মানব বা পশু নন; হিরণ্যকশিপুকে দিবসে বা রাত্রিতে বধ করা যাবে না, তাই নৃসিংহ দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থল গোধূলি সময়ে তাকে বধ করেন; হিরণ্যকশিপু ভূমিতে বা আকাশে কোনো শস্ত্রাঘাতে বধ্য নন, তাই নৃসিংহ তাকে নিজ জঙ্ঘার উপর স্থাপন করে নখরাঘাতে হত্যা করেন; হিরণ্যকশিপু নিজ গৃহ বা গৃহের বাইরে বধ্য ছিলেন না, তাই নৃসিংহ তাকে বধ করেন তারই গৃহদ্বারে।

ভাগবত পুরাণ-এ আরও বলা হয়েছে: হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর সকল দেবতাই নৃসিংহদেবের ক্রোধ নিবারণে ব্যর্থ হন। বিফল হন স্বয়ং শিবও। সকল দেবগণ তখন তার পত্নী লক্ষ্মীকে ডাকেন; কিন্তু লক্ষ্মীও স্বামীর ক্রোধ নিবারণে অক্ষম হন। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে প্রহ্লাদ এগিয়ে আসেন। ভক্ত প্রহ্লাদের স্তবগানে অবশেষে নৃসিংহদেব শান্ত হন। নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া গা চাটিতে লাগিলেন। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে রাজা করে দেন।

এতটুকু অব্দি কাহিনি আমাদের প্রায় সকলে জানি। এখানেই ভাগবত পুরাণে নৃসিংহদেবের ইতি। কিন্তু শিব পুরাণ শুরু ঠিক এখান থেকেই। শিবপুরাণে নৃসিংহ উপাখ্যানের একটি শৈব পাঠান্তর বর্ণিত হয়েছে, যা প্রথাগত কাহিনিটির থেকে একটু ভিন্ন। সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়েও তিনি শান্ত হলেন না। তিনি পৃথিবীতে সংহার কার্য চালাতেই লাগলেন। সমগ্র বিশ্বে তখন ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম অবস্থা। সমস্ত দেবতারা তখন মহাকাল শিবের দ্বারস্থ হল। প্রথমে শিব তার রৌদ্র রূপ বীরভদ্রকে প্রেরণ করলেন নরসিংহকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বীরভদ্রের অনুরোধ উপরোধেও কিছু হল না। এমনকি বীরভদ্র যুদ্ধে ব্যর্থ হলেন। বীরভদ্র ব্যর্থ হলে শিবের কাছে আর কোনো উপান্তর ছিল না। তিনি তার সর্ব বৃহৎ এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করলেন। এবার শরভ রূপকে যদি

আমি আপনাকে বোঝাতে চাই আমাকে কিছু শাস্ত্রোল্লেখ করতে হবে। এই কাহিনির সঙ্গে যেহেতু এই সমস্তের সরাসরি যোগাযোগ আছে তাই আপনাদের সেই বিবরণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। শরভেশ্বর মহাদেব বা সিংহঘ্ন মূর্তি সম্পর্কে যদি প্রাথমিক পরিচয় দিতে হয় বলতে হয় যে, শরভ বা শরভেশ্বর নামটির সঙ্গে বাংলার মানুষ অতোটাও পরিচিত নন যতটা তারা নৃসিংহদেব এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। পরমেশ্বর শিবের ১৯টি প্রধান স্বরূপের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি স্বরূপ হল "শরভেশ্বর। শ্রীবিষ্ণুর অবতার ভগবান নৃসিংসদেবের দর্প চূর্ণ করতে এবং তার রোষানল থেকে জগতকে ত্রাণ করতে সাক্ষাৎ বীরভদ্র এই শরভেশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। একই দেহে পক্ষী এবং সিংহের অপরূপ মেল বন্ধনের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হলেন শরভেশ্বর মহাদেব। এর শাস্ত্রগত ভিত্তি হল, শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গমহাপুরাণ, শরভ উপনিষদ সহ বিভিন্ন শৈবাগম যেমন কামিকাগম, কারণাগম, সূক্ষ্মাগম, বাতুলশুদ্ধাগম এবং বিভিন্ন শাক্ত তন্ত্র যেমন "আকাশভৈরব কল্প, পক্ষিরাজ কল্প ইত্যাদি, কালিকা উপপুরাণ এমন কি পদ্মপুরাণেও শরভেশ্বরের সহস্রনামের উল্লেখ মেলে। যদিও বর্তমানে পদ্মপুরাণ থেকে নামগুলোকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। উপরিউক্ত শ্রুতি, স্মৃতি, আগম এসব শাস্ত্রগুলিতে শরভেশ্বর কর্তৃক নৃসিংহদেবের দর্পচূর্ণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে অন্য অপর কোনো কাল্পনিক চরিত্রের কোনোরূপ উল্লেখ এসব মান্য শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তাঁর স্বরূপ বা লীলামূর্তি সম্পর্কে শ্রীশিব উবাচ্ হল,

কদা লোকহিতাথায় লীলয়াকাশভৈরবম্।
ত্রিধাবিভজ্য চাত্মানং রক্ষতে সর্বদাখিলম্।।২।।
আকাশভৈরবং পূর্বং দ্বিতীয়ং চ আশুগারুড়ম্।
শরভং তু তৃতীয়ং স্যাদ্রুপত্রয়মিহোচ্যতে।।৩।।
তস্য তাতীয় রূপস্য ত্রিধা রূপং বিশেষতঃ।
শরভং সালুবং চৈব পক্ষিরাজং তৃতীয়কম্।।৪।।

এর উল্লেখ রয়েছে আকাশভৈরব কল্পতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে। এর অর্থ—পরমেশ্বর শিব পরমেশ্বরীকে বললেন, আকাশ ভৈরব সাক্ষাৎ সদাশিব স্বরূপ। আকাশ ভৈরব নামক কল্পে পরমেশ্বর আকাশভৈরব লোক কল্যানের নিমিত্তে এবং অখিল বিশ্বচরাচরের রক্ষার নিমিত্তে নিজেকে (আত্মস্বরূপকে) তিনটি স্বরূপে বিভাজিত করেন অর্থাৎ নিজেই তিনটি স্বরূপ ধারণ করেন। সেই স্বরূপগুলির নাম হল, আকাশভৈরব, আশুগারুড় এবং শরভ বা শরভেশ্বর। এর মধ্যে তৃতীয় স্বরূপ শরভেশ্বর পুনরায় লীলা প্রদর্শনের নিমিত্তে নিজেকে তিনটি স্বরূপে বিভাজিত করেন, শরভ, সালুব এবং পক্ষিরাজ। সুতরাং শরভ এবং আকাশভৈরবের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে কোনো পার্থক্যই নেই। তাই মূলস্বরূপ শরভকেই সাধারণত আকাশভৈরব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সালুব, পক্ষিরাজ এবং শরভ যে আসলেই এক ও অভিন্ন তার প্রমাণ শৈব আগম উত্তর কারণাগমেই মেলে—

ঈশ্বর উবাচ্ :-

সিংহচর্মধরং ভীমং শত্রুসংহারকারণম্।
সাল্বপক্ষিপ্ররাজাখ্যং এবং সংহারতাণ্ডবম্।।৮।।

এর উল্লেখ রয়েছে উত্তর কারণাগমে, ৭৩ নং পটল। উত্তর কামিকাগমোক্ত শরভের ধ্যান ও বর্ণনায় বলা হয়েছে ঈশ্বর উবাচ্ :-

পক্ষাকারং সুবর্ণাভং পক্ষদ্বয় সমন্বিতম্।।১।।
ঊর্ধ্বপক্ষ সামাযুক্তং রক্তনেত্র ত্রয়ান্বিতাম্।।২।।
সুতীক্ষ্ণ নখরসংযুক্তৈঃ ঊর্ধ্বস্থৈর্বেদপাদকৈঃ।
দিব্যলাঙ্গল সংযুক্তং সুবিকীর্ণ জটান্বিতম্।।৩।।
কন্ধরোর্ধ্বং নরাকারং দিব্যমৌলি সমাযুতম্।
সিংহাস্যং ভীমদংষ্ট্রং চ ভীমবিক্রম সংযুক্তম্।।৪।।

হরন্তং নরসিংহং তু জগৎসংহরণোদ্ধতম্।
কৃতাঞ্জলি পুটোপেতং নিশ্চেষ্টিত মহাতনুম্।।৫।।
নম্রদেহং তদূর্ধ্বাস্যং বিষ্ণু পদ্মদলেক্ষণম্।
পাদাভ্যাং অম্বরস্থাভ্যাং কুক্ষিস্থাভ্যাং চ তস্য তু।।৬।।
গগণাভিমুখং দেবং কারয়েচ্ছরভেশ্বরম্।।৭।।

উত্তর কামিকাগমের ৬০ নং পটলে এর উল্লেখ রয়েছে। উত্তর কামিকাগম ছাড়াও উত্তর কারণাগমোক্ত ধ্যানেও শরভেশ্বরকে চতুষ্পদী বলা হয়েছে। সেখানে ঈশ্বর উবাচ্ হল,

মৃগাদি চ চতুষ্পাদং দ্বিপাদং ভূমিসংস্থিতম্।।৫।।

উত্তর কারণাগমের ৭৩ নং পটলে রয়েছে এর উল্লেখ। সঙ্গে তিনি হস্তে ধারণ করছেন ডমরু, পরশু, ত্রিশূল, খড়গ, খেটক, তীর, শার্ঙ্গ এবং ভিণ্ডিপাল। এই সম্পর্কিত ঈশ্বর উবাচ্ হল—

ডমরু পরশুশ্চৈব ত্রিশূলং খড়গখেটকম্।।৬।।
শরং শার্ঙ্গং ভিণ্ডিপালং পার্শ্বয়োশ্চ প্রকল্পয়েৎ।।৭।।

এটাও উত্তর কারণাগমের ৭৩ নং পটলে উল্লিখিত রয়েছে। লিঙ্গমহাপুরাণোক্ত ধ্যানেও তাঁকে চতুষ্পদী এবং সহস্রবাহু বলা হয়েছে -

মহাবাহুঃ চ চতুষ্পাদ্ বহ্নিসংভবঃ।।৬৮।।
সহস্রবাহুর্জটিলশ্চংচন্দ্রার্ধকৃতশেখর।।৬৬।।
(লিঙ্গমহাপুরাণ/পূর্বভাগ/৯৬/৬৮)

আবার পক্ষীরাজ তন্ত্রে পক্ষীরাজ স্বরূপধারী শরভের বর্ণনায় তাকে অষ্টপদী, সহস্রবাহু, দুইটি মস্তক, প্রতিটি মস্তক ত্রিনেত্র বিশিষ্ট, উত্থিত দ্বি-পুচ্ছ, দুটি ডানা এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অষ্টাঙ্-ঘ্রিশ্চ সহস্রবাহুরনিলচ্ছায়া শিরো যুগ্মমৃৎ,

দ্বিত্র্যক্ষোতিজবো দ্বিপুচ্ছ উদিতঃ সাক্ষাৎ নৃসিংহপদা।

ওঁ-নম অষ্টপদায় সহস্রবাহবে দ্বিশিরসে ত্রিনেত্রায় দ্বিপক্ষায় অগ্নিবর্ণায় মৃগবিহঙ্গমরূপায় বীর শরভেশ্বরায় হুং ফট্।

(পক্ষিরাজ তন্ত্র)

শ্রীতত্ত্ব নিধি অনুযায়ী, শরভেশ্বর মহাদেব হলেন আবার অষ্টপদ এবং ৩২টি হস্ত বিশিষ্ট—

মহামেরুসমাকারম্ অষ্টপাদংরবিপ্রভম্।

দ্বাত্রিংশৎ বাহু সংযুক্তং সূর্যসোমাগ্নিলোচনম্।।১।।

(শ্রীতত্ত্বনিধি/৭৮ পৃষ্ঠা)

তামিল শৈবশাস্ত্র 'Sivaparakramam' অনুযায়ীও শরভেশ্বর অষ্টপদ সংযুক্ত।

(শিবপরাক্রমম /৩০ নং মূর্তি)

সুতরাং মীমাংসা এটাই দাঁড়ায় যে অষ্টপদী ও চতুষ্পদী শরভের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তিনি যখন পক্ষিরাজ কল্পে পক্ষীরাজ স্বরূপ ধারণ করেন তখন তিনি অষ্টপদী এবং শরভ কল্পে তিনি চতুষ্পদী। প্রকৃতপক্ষে আকাশ ভৈরব কল্পের অন্তর্ভুক্ত দুটি কল্প হল— শরভ কল্প এবং পক্ষীরাজ কল্প। আচ্ছা এবার শরভের শক্তি সম্পর্কে বলি। উত্তর কারণ আগমোক্ত শরভেশ্বরের ধ্যানে ঈশ্বর উবাচে বলা হয়েছে —

জিহ্বা বড়বাগ্নিস্যাৎকালী দুর্গা দ্বিপক্ষকৌ।।৩।।

এটা আছে উত্তর-কারণাগমের ৭৩ নং পটলে। অর্থাৎ দুর্গা এবং কালী

সাক্ষাৎ শরভেশ্বরের দুইটি ডানা অর্থাৎ দুই ডানার শক্তি। এই মতানুসারে তাঁর দুই শক্তি দুই ডানায় সংস্থিতা দুর্গা এবং কালী ।

তন্ত্রান্তরে দুর্গাকে শূলিনীদেবী এবং কালীকে ভদ্রকালী বলা হয়ে থাকে। শরভেশ্বরের চারপাশের আটটি মূর্তিশ্বর রয়েছেন। শৈবাগম উত্তর কামিকাগমের ৬০ নং পটলের ১১-১২ নং শ্লোকে শরভেশ্বরের চারপাশের আটটি মূর্তিশ্বরের উল্লেখ মেলে তাঁদের নাম— "বজ্রদেহ, খাদক, বিয়োজক, মারণ, দীর্ঘহস্ত, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, জটাধর এবং বলিপ্রিয়।

আগমোক্ত শরভ মূর্তি প্রতিষ্ঠা বলুন বা শরভ অর্চনা বলুন অষ্টদল পদ্মের আটটি দলে এই আটজন মূর্তিশ্বর নিজ নিজ বীজ উচ্চারণ দ্বারা ন্যাস করতে হয় এবং আটটি ঘট স্থাপন করতে হয়। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ গুরুগম্য এবং আগমোক্ত শৈব পরম্পরাগত। পক্ষীরাজ তন্ত্রোক্ত শরভের গায়ত্রী—

ওঁ-ম পক্ষীরাজায় বিদ্মহে শরভেশ্বরায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।।

এছাড়াও আকাশ ভৈরব কল্পোক্ত শরভ মন্ত্র হল,

খেং খাং খং ফট্ প্রাণগ্রহাসি প্রাণগ্রহাসি হুং ফট্ সর্ব শত্রু সংহারণায় শরভ-সালুবায়-পক্ষিরাজায় হুং ফট্ স্বাহা।

কামিকাগমোক্ত শরভের মন্ত্র। ঈশ্বর উবাচ্ বা শ্লোক হল—

অষ্টবর্গ আদিমং বীজং চতুর্দশং বিভূষিতম্।
ষষ্ঠস্বর সমোপেতং বিন্দুনাদ সমন্বিতম্।।৮।।
শারভং বীজমিত্যাহুঃ শরভেশ্বর ইত্যপি।
ততো হরিহরস্তবেবং চতুর্থন্তং পদদ্বয়ম্।।৯।।
আদৌ প্রণব সংযুক্তং নমস্কারান্ত সংযুতম্।।১০।।

(উত্তর কামিকাগম/৬০ নং পটল)

অর্থাৎ উত্তর কামিকাগমোক্ত শরভেশ্বরের মূল মন্ত্র এরূপ হবে—

ওঁ-ম শৌঁ ভঁ শরভেশ্বরায় হরিহরায় নমঃ।।"

এতটুকু বলে থামলেন হেমন্তাই। সকলে এক নাগাড়ে তার বলা কাহিনি ও শ্লোক শুনে যাচ্ছে এক মনে। কেউ কেউ একটু অধৈর্যও হয়ে পড়ছে। দাসবাবু হেমন্তাইকে থামতে দেখে বলেই ফেললেন, "আচ্ছা কাহিনি বলছেন ঠিক আছে। কিন্তু শ্লোক বলছেন কেন?"

হেমন্তাই দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "শরভাবতার প্রসুঙ্গ মুখে নিলে তার সম্পূর্ণ মন্ত্র উচ্চারণের আদেশ রয়েছে আমার গুরুর। তাই আমি শুধুমাত্র কাহিনি আপনাদের বলতে পারবো না।"

রামানুজ বলল, "ঠিক আছে। বলতে থাকুন। আমি শুধু সাগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন আপনাদের গ্রামের সঙ্গে বা জঙ্গলের সঙ্গে এই কাহিনির মিল খুঁজে পাবো। যদি না পাই, আজ রাতে আপনাকে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা আমি নিজে করবো।"

হেমন্তাইয়ের মুখের বলিরেখাগুলো এই শীতের দিনে আরও গভীর হয়ে আছে। অদ্ভিত এক উপজাতি পুরুষ লাগছে তাকে। তিনি বললেন, "আমাকে সম্পূর্ণ কাহিনি শেষ করতে দিন। এরপর আপনাদের যা ইচ্ছে হয় আমি তাই করবো।"

সিনহা বললেন, "বলতে থাকুন বাকি কাহিনি।"

হেমন্তাই আবার শুরু করলেন, "এই ভয়ানক শরভাবতারের সঙ্গে ভগবান নরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয় এবং নরসিংহকে পরাজিত করেন শরভ। তারপর দুই দেবতাই নিজের নিজের রূপে ফিরে আসেন এবং পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করতে থাকে। এই যে কাহিনি আমি আপনাকে বললাম সেটা শৈবদের মধ্যে প্রচলিত। এই কাহিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর মানুষদের খুব পিড়া দিল। ওদের মনে হল, বিষ্ণুর উপর শিবের কর্তৃত্ব ফলাও করার জন্যেই এই কাহিনির সৃষ্টি। ফলে ওরা এই কাহিনিটিকে আরও দীর্ঘায়িত করল। এবার কাহিনির পরবর্তী অংশ বলার মাঝে আমি

পুরাণের বিভিন্ন মতগুলোও আপনাদের বলবো। তাতে আমার কাহিনিটি যে নিছক কাহিনি নয়, বরং এর পৌরাণিক প্রমাণাদি বিদ্যমান তা আপনারা বুঝতে পারবেন।

বৈষ্ণবদের মতে ভগবান নরসিংহদেবের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র সর্বত্রেই বর্ণিত। শ্রীনৃসিংহদেব হলেন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার। নৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে ও বিভিন্ন মহাপুরাণ ও উপপুরাণে তাকে অপরাজেয়, অবিনশ্বর ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলত, বৈষ্ণবদের মতে শিবপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে ভগবান নৃসিংহদেবের পরাজয় নিয়ে যে কথা আছে, তা সত্য হতে পারে না এবং স্বয়ং শিবও তা পদ্মপুরাণে মাতা পার্বতীর নিকট ব্যক্ত করেছেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবজী মহারাজ কেন ভগবান শ্রীহরির নৃসিংহ অবতার নিয়ে এরূপ মোহনবাক্য প্রয়োগ করেছেন তার বিশ্লেষণ রয়েছে।

প্রথমে চলুন আমরা প্রামাণ্য শাস্ত্রসমূহ হতে জেনে নি, বাস্তবে কি ঘটেছিল—

শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে বর্ণিত আছে, হিরণ্যকশিপুকে বধের পর ভগবান নৃসিংহদেবের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা ভীত হয়ে বৈষ্ণবশিরোমণি শিবের নিকট গিয়ে নৃসিংহদেবের ক্রোধ নিবারণের ব্যবস্থা করতে বলেন। তখন মহাদেব নিজের দেহ সম্ভূত এক অতিকায় জীবের সৃজন করলেন, যা 'শরভ' নামে পরিচিত। শিবের এ শরভাবতার নৃসিংহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসলে শ্রীনৃসিংহদেব তা দেখে পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন এবং তিনি শরভের চেয়েও ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন, যে রূপটি গান্ডাবেরুন্ডা অথবা গন্দবেরুন্দা নামে বন্দনীয়। গন্দবেরুন্দা অবতার আসলে দু-মুখো ঈগলের অবতার। দু-টো ভয়ানক ঈগলের মাথা দু-দিকে রয়েছে, বাকি শরীর মানুষের মতোই। কোনো মূর্তিতে তাঁর ঠোঁটে বিষধর সাপ আবার কোনো ছবিতে তাঁর ময়ূরপুচ্ছ রয়েছে। ভগবান গন্দবেরুন্দা নৃসিংহদেব শরভাবতারের সঙ্গে ১৮ দিন পর্যন্ত

অবিরাম যুদ্ধ করেন এবং একপর্যায়ে তিনি শরভাবতারকে হিরণ্যকশিপুর মতো কোলে শুইয়ে ধরে তাঁর বজ্রতীক্ষ্ণ নখের দ্বারা শরভের বক্ষ চিড়ে শরভকে হত্যা করেন। শরভাবতার যখন ব্যর্থ হলেন তখন দেবতাদের অনুরোধে মহাভয়ংকরী শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ নিবারণ করেন ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ। এবার এই হচ্ছে বৈষ্ণবদের মতামত। বিষ্ণুপুরাণেও এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও শ্রীব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণে বলা আছে,

তো যুধ্যমানৌ তু তদা চিরেণ বলবত্তরৌ।
ন শমং জগ্মতুর্দেবৌ নৃসিংহশরভাকৃতী।।৬৯।।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাকাযো নৃসিংহো ভীমনিস্স্বনঃ।
সহস্রকরজৈস্তস্তস্য গাত্রাণি পীডযন্।।৭০।।
ততঃ স্ফুরচ্ছটাচোটো রুদ্রং শরভরূপিণম্।
ব্যদারযন্নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্হিরণ্যকশিপুং যথা।।৭১।।

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ক্ষেত্রমাহাত্ম্যখণ্ডম, অধ্যায় ৮, শ্লোক ৬৯-৭১; তেলেগু সংস্করণ)

এই শ্লোকের বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'অতঃপর দুই পরাক্রমশালী শক্তি অর্থাৎ নৃসিংহ ও শরভের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা দীর্ঘকাল অর্থাৎ ১৮ দিন টানা চলতে থাকে এবং বিধ্বংসী এ যুদ্ধে কেউই কিছুতে শান্ত হচ্ছিলেন না। অতঃপর ভগবান নৃসিংহদেব তার মহাবিকট মহাক্রোধী রূপ অর্থাৎ গান্ডাবেরুন্ডা নৃসিংহরূপ ধারণ করলেন এবং তাঁর সহস্র হাতে রুদ্রের এই শরভাবতারকে ধরে তাঁর তীক্ষ্ণ ও মারাত্মক নখ দিয়ে শরভের বক্ষটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, ঠিক যেভাবে তিনি হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন।'

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রলয়ংকারী রূপ যে শরভের চেয়েও ভয়ংকর তা শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে-

দংষ্ট্রাসু সিংহশার্দূলাঃ শরভাশ্চ মহোরগাঃ।

কণ্ঠে চ দৃশ্যতে মেরুঃ স্কন্ধেষ্বপি মহাদ্রয়ঃ।।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৩৮, শ্লোক ১০৪)

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হল, ভগবান নৃসিংহদেবের দাঁতগুলো সিংহ, বাঘ এমনকি শরভ ও মহাসর্প সমূহের উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ অত্যন্ত ভয়ংকর, নৃসিংহদেবের বজ্রকণ্ঠ এদের চেয়েও ভয়ানক, মেরুপর্বতের মতো সুদৃঢ়, ভগবানের স্কন্ধও বিশাল পর্বতের মতো।

শিবাবতার বিধ্বংসী শ্রীনৃসিংহদেবকে পদ্মপুরাণে তাই 'বীরভদ্রজিৎ' নৃসিংহরূপে বন্দনা করা হয়েছে এভাবে—

জগদেকস্বরূপায় নৃসিংহায় নমোঽস্তু তে।
ভালে দধার যো দেবো নৃসিংহো বীরভদ্রজিৎ।।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ১৭৪, শ্লোক ৮৫)

অর্থাৎ যে বীরভদ্রজিৎ নৃসিংহ দেব ললাটে সুতপ্ত দ্বাদশ সূর্যবিম্ব ধারণ করেন, সে জগদেকস্বরূপ নৃসিংহদেবকে নমস্কার করি।

তাহলে এবার একটা প্রশ্নের জন্ম হয়। পরমবৈষ্ণব শিব কেন শিবপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে নিজ আরাধ্যদেব শ্রীহরির বিরুদ্ধে এরূপ মোহনবাক্য প্রয়োগ করে বিভ্রাট সৃষ্টি করলেন?

এই উত্তরও স্বয়ং শিব নিজেই পার্বতীকে বলেছেন। পদ্মপুরাণে যোগেশ্বর শিব মাতা পার্বতীকে বলেছেন, তিনি নিজের ইচ্ছাতে এরূপ করেননি, তিনি শ্রীহরির নির্দেশে অসুরমোহনার্থে তামসিক পুরাণসমূহে নিজেকে শ্রীহরির চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য এসকল মোহন বাক্য বলেছেন, যাতে জগতের আসুরিক লোকেরা বিষ্ণুভক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে বেদবিরুদ্ধ পন্থাকে আশ্রয় করে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসুরেরা বিষ্ণুভক্তির ছল করে তপস্যা দ্বারা শক্তি লাভ করে সে শক্তি দিয়ে দেবলোকাদি দখল করার উপক্রম হলে দেবতারা শ্রীহরির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সে সময় শ্রীহরি শিবকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন জগতে শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণাদি

তামসিক পুরাণ, তামসিক স্মৃতি ও পাশুপত শাস্ত্র প্রচার করেন এবং শৈব ও মহাশৈব নামক বেদবিরুদ্ধ পাষন্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। শিবের এ প্রচারণায় তখন যারা প্রকৃতই অসুর, বিষ্ণুভক্তির ছল করছে, তারা বিষ্ণুবিমুখ হয়ে যাবে এবং তাদের পতন ঘটানো দেবতাদের পক্ষে সহজ হবে।

পুরাণানি চ শাস্ত্রাণি ত্বয়া সত্ত্বেন বৃংহিতাঃ।
কপালচর্ম্মভস্মাস্থিচিহ্নাসমরসর্ব্বশঃ।৩০।
ত্বমেব ধৃতবান্ লোকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে।
তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সংস্কৃতঃ।৩১।
কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিভেদতঃ।

অলক্ষ্যঞ্চ মত সম্যগ্বেদবাহ্যং নরাধমাঃ।৩২।
ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি হচেতসঃ।
ত্বাং পরত্বেন বক্ষ্যন্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তামসাঃ।৩৩।
তেষাং মতমধিষ্ঠায় সর্ব্বে দৈত্যাঃ সনাতনাঃ।
ভবেয়ুস্তে মদ্বিমুখাঃ ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ।৩৪।
অহপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল।
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগেযুগে।
মতমেতদবষ্টভ্য পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।৩৫।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৩৫, শ্লোক ৩০-৩৫, শ্রীহরি উবাচ)

অর্থাৎ শ্রীহরি শিবকে বললেন, হে শিব! তুমি সংকোচ পরিত্যাগ করে জগতে তামসিক পুরাণ ও অন্যান্য তামসশাস্ত্রের প্রচার করো। তুমি কপাল, চর্ম্ম, ভস্ম ও অস্থি চিহ্ন ধারণ করে ত্রিজগতের অখিল লোককে মোহিত কর। তুমি পাশুপাত্ শাস্ত্র প্রণয়ন করে তা প্রচার কর। তুমি কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড ও মহাশৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে বেদবিরুদ্ধ মত অলক্ষ্যে প্রবর্তিত কর। এইরূপ করলে সকলে ভস্মাস্থিধারণ করে অধম হবে ও জ্ঞানহীন হয়ে যাবে। তখন তারা তামসিক হয়ে তোমাকেই সকল শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলে কীর্ত্তন করবে। যারা বিষ্ণুভক্তির ছল করে ত্রিলোকে উৎপাত সৃষ্টি করে সে সকল সনাতন দানবগণ এ বেদবিরুদ্ধ মত গ্রহণ করে ক্ষণকাল মধ্যে নিঃসংশয় বিষ্ণুবিমুখ হয়ে যাবে। হে মহাবল রুদ্র! আমিও যুগে যুগে অবতার পরিগ্রহ করে তামসিক লোকদের মোহিত করার জন্য তোমার পূজা করব। তা দেখে দানবেরাও সেই মতের অনুবর্তী হইয়া নিঃসংশয় পতিত হইবে।

এটুকু বর্ণনার পর মহাদেব তার দ্বারা প্রচারিত তামসিক পুরাণসমূহের নাম বর্ণনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তামসিক পুরাণ অনুসারীগণ নিশ্চিতভাবে নরকপ্রাপ্ত হন।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে।১৮।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৩৬, শ্লোক ১৮, শিব উক্তি)

অর্থাৎ শিব বললেন, মৎস্যপুরাণ, কুর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ— এই ছয়খানি পুরাণ তামসিক পুরাণ।

সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ সর্ব্বদা শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ।।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৩৬, শ্লোক ২১-২২, শিব উক্তি)

অর্থাৎ শিব পার্বতীকে বললেন, হে দেবী! পদ্মপুরাণাদি সাত্ত্বিক পুরাণসমূহ মোক্ষ প্রদান করে। ব্রহ্মান্ডপুরাণাদি রাজসিক পুরাণ সর্ব্বদা শুভ এবং শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণাদি তামসিক পুরাণগুলো নিশ্চিতভাবে নরক প্রাপ্তির কারণ বলে নির্দিষ্ট।

উপরোক্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবপ্রবর শিবের বাক্যানুসারে স্পষ্ট দৃশ্যত যে, বাস্তবে শরভাবতার কর্তৃক নৃসিংহদেবের পরাজয়ের যে কাহিনি তা নিছকই ছল বাক্য, এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

বাস্তবে শ্রীনৃসিংহদেবই সবচেয়ে প্রলয়ংকরী রূপ ''শ্রী গান্ডাবেরুন্ডা-নৃসিংহরূপ ধারণ করে শিবের শরভাবতারকে নাশ করেন। যারা তামসিক লিঙ্গ-শিবপুরাণের অসুরমোহন বাক্যে মোহিত হয়ে অপসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে অপপ্রচার করেন, তারা নিশ্চিতভাবে শ্রীহরির নিন্দাবশত নরকগামী হবেন।

হেমন্তাই আবার থামলেন। রামানুজ জিজ্ঞেস করল, ''খুব বড় বক্তব্য

কিন্তু। এতগুলো পুরাণকে তামসিক বলছেন আপনি?"

"আমি বলছি না। বৈষ্ণবরা বলছেন। আর এই যুক্তিগুলোও বিভিন্নভাবে খণ্ডন করা যায়। কিন্তু সেসব আলোচনা আমাদের কাহিনির পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। বৈষ্ণবদের এই যুক্তি অবশ্যই শৈবরা খণ্ডন করবেন, এটাই তো রীতি। কিন্তু এই যে গন্দবেরুন্দার কথাটা উঠে এল এটা অব্দি আপনাদের বয়ে নিয়ে আনতেই এই সম্পূর্ণ কাহিনি এবং পুরাণের শ্লোকের সাহায্য নিলাম আমি।

হেমন্তাই এবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। রামানুজ বলল, "হুম, বুঝলাম। কিন্তু এখনও আমি আপনাদের গ্রামের সঙ্গে এই কাহিনির কোনো যোগাযোগ খুঁজে পেলাম না।"

হেমন্তাই হাসলেন। রামানুজ এবার একটু বিরক্ত হল, "আমি কি হাস্যকর কোনো কথা বলেছি?"

হেমন্তাই হাত দিয়ে ইশারায় বোঝালেন যে তিনি সে কারণে হাসছেন না। তারপর বোমা ফাটিয়ে বললেন, "আসলে আমাদের গ্রামে গন্দবেরুন্দার পুজো করা হয় মন্দিরে। ওই যে সেদিন আপনি বিগ্রহ দেখতে চেয়েছিলেন, সেই বিগ্রহটা গন্দবেরুন্দা দেবতার বিগ্রহ।"

এবার সকলে বুঝতে পারলেন এত বড় কাহিনির সারবত্তা। কে এই দেবতা, কোথা থেকে এসেছেন তা স্পষ্ট হল সকলের কাছে। সকলের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। রামানুজ এবার অত্যন্ত গুরুত্ব দিল বিষয়টাতে। বলল, "এবার বাকিটা বলুন। আমরা শুনছি।"

হেমন্তাইয়ের মনে হল তিনি এতক্ষণে শ্রোতাদের আগ্রহ আদায় করতে পেরেছেন। তিনি এবার কাহিনির চাকা দ্রুতগতিতে ঘোরালেন, "এবার আমাদের আরাধ্য দেবতা গন্দবেরুন্দা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই কাহিনিকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মতে গন্দবেরুন্দা দেবতাও একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর খোলস ত্যাগ করতে হত। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তার সঙ্গে মহাসর্পের মিল পাওয়া যায়। এরকমই একবার তিনি তাঁর একটা

খোলস ত্যাগ করেছিলেন আমাদের জঙ্গলে। তিনি তো চলে গেলেন, কিন্তু তার খোলস রয়ে গেল। সে যেন তেন খোলস নয়, সে এক অলৌকিক খোলস। আর সবচেয়ে বড় কথা সে খোলস নির্জীবও নয়। হ্যাঁ সে খোলসে প্রাণ আছে।"

উপস্থিত সবাই এই কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। কী বলছে এসব হেমন্তাই? হেমন্তাই থামলেন না। বলতে লাগলেন,

"সেই খোলস যখন প্রথম আবিষ্কৃত হল, শুনেছি তখন সবাই প্রথমে ভয় পেয়েছিল। কারণ সেই খোলস তখনও নড়ছে, কাঁপছে। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই সেই কাঁপন বন্ধ হল। স্থির হয়ে গেল সেই খোলস। কিন্তু স্থির হলে কী হবে, সেই খোলসের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল অদ্ভুত দ্যুতি। বেনিয়াসহকলায় রামধনু রঙের আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল সেই খোলসের গা থেকে। আপনারা ভাবুন, একটি বৃহদাকার খোলস, যার আকৃতি অর্ধেক মানুষের মতো বাকি অর্ধেকে দুই মাথাওয়ালা ঈগল, সেই খোলসের সামনে আমার পূর্বপুরুষদের অবস্থা ঠিক কী হয়েছিল। তবুও যখন সেই খোলসের নড়াচড়া বন্ধ হল তখন ওরা কিছুটা সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল তাঁর কাছে। কেউ কেউ সাহস নিয়ে ছুঁয়েও ফেলল তাঁকে। এ যেন জীব হয়ে ঈশ্বর ছোঁয়ার অনুভূতি। বহু মানুষ একত্রিত হয়ে ধীরে ধীরে ছুঁয়ে দেখল গন্দবেরুন্দা নরসিংহ দেবকে। স্থির হল এই জঙ্গলেই তৈরি হবে মন্দির। সেই মতো বিশাল এক মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়েছিল এবং এক বছরের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল সেই মন্দির। সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল তার খোলসের অবয়বকে। তিনি মূর্তির মতো বসে আছেন সেই মন্দিরে, আজকেও তার খোলস সেখানেই আছে।"

হেমন্তাইয়ের গলা শুকিয়ে গেছে কথা বলতে বলতে। তিনি দাসবাবুর হাতে থাকা জলের বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে জল পান করলেন। সকলে এতই বিস্মিত এই কাহিনি শুনে যে কারো মুখে কোনো কথা আসছে

না। সবাই যেন আরও শুনতে চাইছে। হেমন্তাই বলতে লাগলেন,

"এই এক বছরে এই ভীষণ রুদ্রমূর্তি একবারের জন্যেও নড়াচড়া করেনি। হ্যাঁ, তবে যত সময় এগিয়েছিল তত তার দেহের আলোর ছটা তীব্র হচ্ছিল। এমনকি তার গা বেয়ে সেই রামধনুরঙের জেলি পদার্থের মতো একটা বস্তু গড়িয়ে পড়ছিল। মানুষ এসব দেখে অবাক হলেও দেবতার দেহে কত কিছুই তো হতে পারে, সে নিয়ে সম্যক জ্ঞান যেহেতু তাদের ছিল না তারা এ নিয়ে নির্বিকার ছিল। ভক্তিভাবটাই বেশি কাজ করেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, যাতে আর একেবারে নির্বিকার থাকা যায়নি।

যে সমস্ত মানুষ গন্দবেরুন্দা দেবতার খোলসে হাত দিয়েছিলেন বা কাজ চলাকালীন যাদের শরীরে সেই রঙিন পদার্থ লেগেছিল তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করলেন। একটা বছর তাদের দেহ স্বাভাবিক থাকলেও যে এক বছর অতিক্রান্ত হল, তারা ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে উঠতে শুরু করল। তাদের চোখের মণি কালো থেকে ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যাচ্ছিলো। বহু মানুষ সাক্ষী ছিলেন যে তাদের পিঠের মেরুদণ্ড শব্দ করে দেহের ভিতরে ভেঙে যাচ্ছিল। আর অবাক করার বিষয় তারপরেও তাদের মৃত্যু ঘটছিল না। তারা মানুষকে আক্রমণ করে মানে মূলত এরা মানুষের ঘাড়ে কামড়াতে শুরু করে। এরকম কয়েকটা ঘটনা ঘটার পরেই গ্রামবাসীরা সেই মানুষদের হত্যা করতে শুরু করে। আমাদের গায়ে যে উপজাতি হিংস্র রক্ত আছে তাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান অনস্বীকার্য। ওরা শিকারে পটু হত। তাই তীর-ধনুক থেকে শুরু করে তরোয়াল, বর্শা এসব চালনায় ওরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমনকি আজকের দিনেও আমাদের একাংশ এসব বিদ্যায় পারদর্শী। তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এরকম হিংস্র অদ্ভুত প্রাণীদের হত্যা করতে শুরু করে। এভাবে প্রথম বছর অতিক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় বছরে ততদিনে মন্দিরে পূজা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বছরেও দেখা গেল যারা মূর্তির অবিরত সংস্পর্শে থেকেছে তারা

একইরকমভাবে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গত বছর যাদের উগ্র এরকম প্রাণীরা আক্রমণ করেছিল, তারাও একইভাবে এই বিষের শিকার হয়ে হিংস্র প্রাণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এরকম বেশ কয়েক বছর চলার পর গ্রামবাসী বুঝতে পারল আসল সমস্যা গন্দবেরুন্দা দেবের মূর্তি নিসৃত অলৌকিক তরল পদার্থটি। এই পদার্থের সংস্পর্শে এলেই এরকম ঘটছে। কিন্তু ততদিনে তিনি আমাদের আরাধ্যে পরিণত হয়েছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যপার, এই যে তরল পদার্থ নিসৃত হচ্ছে, তা সেবন করলে বহু মারণ রোগ সেরে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে এক বছর পর সকলেই হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হচ্ছিলেন ঠিকই কিন্তু শুরুর দিনে এর ঔষধি গুণাগুণকে উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ সে পদার্থের কিছু ভালো গুণাগুণও যে আছে তা নিয়ে প্রায় সকলেই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু যেহেতু কোনোপ্রকার বিশুদ্ধিকরণ ছাড়া সরাসরি এই পদার্থ আমরা সেবন করছিলাম তাই ভালোর পাশাপাশি খারাপ গুণগুলিও আমাদের দেহে প্রবেশ করে আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করছিল। এবার ধীরে ধীরে আমার পূর্বপুরুষরা একটা সিস্টেম তৈরি করল। এই সিস্টেম তৈরি করতে গিয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হল। কিন্তু তবুও যেহেতু গ্রামবাসী গন্দবেরুন্দাকে ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না তাই সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, বলিদান সহ্য করেও তারা এই কাজে ব্রতী হয়ে রইলেন।

আমাদের গ্রামের উন্নতি অবনতি সমস্তই এই দেবতাকে আঁকড়ে ধরে। আমাদের আবাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা শুরু করলাম। আমাদের পূর্ব পুরুষদের বলিদান কাজে লাগল। কারণ আমরা একটা ক্রিয়ার অভিমুখ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম। আমরা বুঝে গেলাম দেবতার তমোগুণ থেকে আমরা আমাদের কীভাবে রক্ষা করতে পারি।"

রামানুজ এবার বলেই ফেলল, "ক্রিয়া প্রসঙ্গে বলুন। বাকিটা বুঝেছি।"

হেমন্তাই বিচলিত না হয়ে বললেন, "আমরা এই জঙ্গলে একটি

পরীক্ষাগার তৈরি করেছি আর তৈরি করেছি একটি কারাগার।"

সকলের ভ্রু কুঁচকে গেল এই কথা শুনে। একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই। হেমন্তাই বলে চললেন, "আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম দেবতার খোলস প্রতি বারো বছরে একবার জেগে উঠে। বাকি সময় তিনি ধ্যান মূর্তির মতো তার নির্দিষ্ট আসনে মন্দিরে উপবিষ্ট থাকেন। এই বারো বছর ধরে তার দেহ নিঃসৃত রামধনু পদার্থের উপর আমরা নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই। আমাদের বারোজন যুবক, যাদের ছোটবেলা থেকে তৈরি করা হয় শুধুমাত্র এই কাজের জন্য, তারা নিজের জীবন বাজি রেখে এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে। এবার আপনাদের বলি আমাদের সিস্টেমটা ঠিক কী। আমরা প্রতি বারো বছর অন্তর বারোজনকে জঙ্গলের পরীক্ষাগারে পাঠাই। আমরা জানি যে একজন মানুষ সেই রঙিন জেলি বা তরলপদার্থের সংস্পর্শে এলে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা এটাও দেখেছি যে একজন মানুষ এই পদার্থের সংস্পর্শে আসার পর তার মধ্যে রোগ সংক্রামিত হতে এক বছর সময় লাগে। তাই একটা নির্দিষ্ট বছরে শুধুমাত্র একেকজন ছাত্রই দেবতার খোলস এবং পদার্থের সংস্পর্শে থাকে। ওও এক বছর সে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। বাকি এগারোজন তখন অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ওই নির্দিষ্ট ছাত্রটি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে বা ওর সংস্পর্শে আসে না। দ্বিতীয় বছর যখন শুরু হয় ততক্ষণে আগের বছরের ছাত্রটির মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে প্রথম কারাগারে বন্দি করে ফেলা হয়। এবার দ্বিতীয় ছাত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে পা বাড়ায় এবং দেবতার দেহ নিঃসৃত পদার্থের সংস্পর্শে আসে। প্রথম ছাত্রটি নিজের উপর ছাড়া আর কারো উপর কোনো পরীক্ষা করার সুযোগ সেভাবে পায়নি। সে শুধু পদার্থটির উপরেই বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ছাত্র কারাগারে বন্দি জানোয়ারটির উপর কিছু পরীক্ষা করার সুযোগ পায়। সে চেষ্টা চালায় কোনোভাবে এরকম কোনো ওষুধের সৃষ্টি করার,

যে ওষুধে এই রোগমুক্তি ঘটতে পারে। এভাবেই তৃতীয় বছর নতুন ছাত্র তার জায়গা নেয় এবং দ্বিতীয় ছাত্রটি ততক্ষণে সংক্রামিত হয়ে কারাগারে বন্দি হয়ে পড়েছে। এভাবেই চলতে থাকে। বারো নম্বর বছরটা সবচেয়ে ভয়ানক। কারণ সে বছর একমাত্র মানব সেখানে জীবিত থাকে তার উপর অনেক কাজের চাপ থাকে। বাকি এগারোজন ততক্ষণে পরিণত হয়েছ এগারোটা শয়তানে। যে সবচেয়ে পুরোনো অর্থাৎ প্রথম ছাত্র তার শক্তি সর্বাধিক। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়ে একাদশ ছাত্রের শক্তি। আর ওদের সামলে রাখাটাই আসল কাজ। ওদের সময়ানুযায়ী খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে দেবতার দেহ থেকে পদার্থ সংগ্রহ করা, সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করা সকল কাজ তাকেই করতে হয়। তারপর যখন বারো বছর পূর্ণ হয় সেরকম এক অমাবস্যা তিথিতে সে বুঝতে পারে যে আর বেশি সময় বাকি নেই। সেও পরিণত হতে চলেছে জানোয়ারে। সে তখন ধীরে ধীরে কারাগারের সমস্ত দরজা খুলে দেয়। একে একে সমস্ত শয়তান বেরিয়ে আসে কারাগার থেকে। ততক্ষণে গ্রামে আমরা হেমন্তাইয়া ক্রিয়া শুরু করে দিই। তাতে আমরা এই দেবতার দেহের নির্যাস ব্যবহার করে তৈরি করি এক মহৌষধি। এই মহৌষধির আবিষ্কার করেছিল আজ থেকে প্রায় দুশো পঞ্চাশ বছর আগেকার ছাত্রদের দলটা। তার আগে তাদের গ্রামমুখী করা আরও কঠিন ছিল। এই মহৌষধির গুণে ওরা অন্যদিকে না গিয়ে সোজা আমাদের গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেয়। একসময় ওরা এসে পৌঁছায় গ্রামে। গ্রামবাসী তখন জড়ো হয়ে থাকে গ্রামের মাঝখানে। একসঙ্গে এত মানুষ দেখে ওদের মুখে জল আসে। এককেটা শয়তানের বাচ্চা তখন চেষ্টা করে আমাদের হামলা করার। কিন্তু তার আগেই আমাদের আবাসনের সেরা অস্ত্রবিদেরা তৈরি হয়ে থাকে। তীর ধনুক, বর্শা, তরোয়াল সহযোগে ওরা মোকাবিলা করে ওই শয়তানদের। প্রত্যেকটা হত্যা করে ওরে। নিজেরাও অনেকে শহীদ হয়ে যায়। শেষে প্রত্যেকটা লাশকে আমাদের ডোম ভাইয়েরা প্লাস্টিকের পরিধান পরে জ্বালিয়ে দেয়। প্লাস্টিক পরার কারণ

যাতে কোনোভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে। ততক্ষণে ভোর হয়ে আসে। দেবতার খোলসের জেগে উঠতে অল্প সময় বাকি থাকে। দেবতার যদি পূর্ণ জাগরণ ঘটে তবে অনর্থ হয়ে যাবে। তাঁকে শান্ত করার উপায় বের করেছিল আমাদের একেবারে প্রথম দলের যুবকেরা অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরাই। আমি শোধন পূর্বক নতুন বারোজনকে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা করে দিই। তারা সেখানে পৌঁছে সমস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে এবং নতুন পর্যায়টিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পূর্বতন ছাত্ররা তাদের গনেষণার ফলাফল সেখানে এক সুরক্ষিত কক্ষে রেখে আসে। তার উপর ভিত্তি করে চলতে থাকে নতুন গবেষণা। আবার দলের প্রথমজন দেবতার সংস্পর্শে আসে এবং এই চক্র চলতে থাকে। আর এভাবেই আমরা আমাদের গ্রামকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে আসছি। অনাদি-অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এই পরম্পরা। এই জঙ্গল যদি একবার উন্মুক্ত হয়ে যায় সমগ্র মানবজাতি কিছু বছরের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। শুধু বেঁচে থাকবে আর সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে এই প্রাণীগুলো। একে অপরকে খেয়ে ফেলতেও এদের কোনো দ্বিধা নেই।"

হেমন্তাইয়ের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তিনি এই শয়তানদের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে হাঁপাচ্ছেন রীতিমতো। কাঞ্চন তাকে ধরে সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিল।

"বাবা, আরেকটু জল খাও।"

রামানুজের মুখ থেকে বেরুলো, "জম্বি!"

সকলেই ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। সিনহা বললেন, "আশ্চর্য কাহিনি! মাথা বিশ্বাস করতে চাইছে না, অথচ মন বলছে বিশ্বাস করতে।"

দাসবাবু বললেন, "এই ত্রিপুরাতে জম্বি আছে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

অজিত বললেন, "যদি তাই হয়, এই জঙ্গলকে এভাবেই ফেলে রাখা উচিত?"

রামানুজ কাঞ্চনের দিকে তাকাল। সে সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কাঞ্চনের

উপর। কাঞ্চন এই দৃষ্টির অর্থ বোঝে। সে মাথা নেড়ে বলল, "বাবা মিথ্যে কথা বলছে না। আমার এই কাহিনি বিবৃত করার যোগ্যতা নেই। তাই আমি তোমাকে বলিনি। কিন্তু বলেছিলাম একদিন না একদিন জানতে পারবে। আসলে গ্রামবাসীর বাইরে এই কাহিনি আমরা কাউকে বলি না। কিন্তু তুমি যা শুরু করেছিলে তাতে আমার বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন তুমি এই কাহিনি জানতে পারবেই।"

রামানুজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাঞ্চনের এই বক্তব্য যে মিথ্যে নয় তা সে বুঝতে পারছে। হেমন্তাইকে সে বিশ্বাস করে না, কিন্তু কাঞ্চনকে সে বিশ্বাস করে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় করে শ্বাস নিল সে। তারপর একটা সিগরেট ধরাল।

হেমন্তাইকে প্রশ্ন করল, "জঙ্গলের কারাগারে খাবার দাবার কে পৌঁছে দেয়। যুবকেরা নিশ্চয়ই ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থাকে না।"

হেমন্তাই উত্তরে বলে, "তা কেন! আমাদের আবাসনের একটা বিশেষ দল সবসময় ওদের সঙ্গে যোগাযোগে থাকে। যেহেতু আদিকাল থেকে এই চক্র চলে এসেছে তাই সাম্প্রতিককালে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হলেও আমরা ছাত্রদের সেটা ব্যবহারের সুযোগ দিইনি। কারণ আমরা ভয় পাই যে এই বিধি যদি একটুও পালটানো হয় হয়তো কিছু অনিষ্ট হতে পারে। আবাসনের একটা দল সবসময় সেখানে খাদ্য সরবরাহ করে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই সরবরাহ করা হয় ওদের জন্য। প্রথম কয়েক বছর যেহেতু একজন বা দু-জন মাত্র এই দেবতার সঙ্গে সংস্পর্শে থাকে তাই বাকিরা ওখানে চাষ বাসও করে কেউ কেউ। ফলে ওখানেও কিছু ফল-শাক সবজি পাওয়া যায়। তবে শেষের দিকে যখন লোকবল কমে যায়, তখন বেশিরভাগ খাদ্য গ্রাম থেকেই সরবরাহ করা হয়। ওদের যেহেতু শুদ্ধিকরণ করা হয়, তাই ওদের কাছে যে কেউ খাদ্য বা যেকোনো প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে যেতে পারে না। তাই বিশেষ একটি দল এই কাজে নিযুক্ত থাকে। আর আমাদের সমস্ত বিশিষ্ট দলের প্রশিক্ষণ আমাদের

আবাসনেই দেওয়া হয়।"

রামানুজ আবার জিজ্ঞেস করে, "ওরা যদি অন্য কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করে বা মাঝপথে যদি কোনো কারণে মারা যায়!"

হেমন্তাই আবার উত্তর দেয়, "এরকম কতবার হয়েছে। সাধারণক্ষেত্রে ছোট খাটো অসুখ বিসুখে ওরা নিজেরাই চিকিৎসা করতে পারে কারণ ওদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিদ্যার প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হয়। খুব গুরুতর কিছু হলে গ্রাম থেকে ডাক্তার যায় বা শহর থেকেও আসে। আমাদের কিছু নির্দিষ্ট মানুষ আছে শহরে। ওদের পরিচয় সবসময় গোপন থাকে। ওদের মাথায় কালো কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় জঙ্গলের পরীক্ষাগারে।"

রামানুজ মাথা নাড়ে, "সবটা উত্তর আপনি দেননি।"

হেমন্তাই হেসে বলে, "দিচ্ছি স্যর দিচ্ছি। যদি কেউ অন্য কোনো কারণে মারা যায়, যেমন জঙ্গলে কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢুকল। পাহারার যে বা যারা ছিল তাদের একজন বা একাধিক ছাত্র কোনো আততায়ী আক্রমণে নিহত হলেন। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে আততায়ীরাও আর বেঁচে নেই। কারণ তাদেরও নির্মভাবে হত্যা করবে তারা। পুরো জঙ্গলে নজর রাখা হয় রাতে। এরকম ঘটনা ঘটেছিল। বেশি না, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পূর্ববঙ্গে যাবার জন্য কিছু যুবক এই পথেই ঢুকেছিল। আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি, আমাদের জঙ্গলে একটা আলাদা রক্ষা কবচ আছে। এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। আমরা বানাইনি। এটা দেবতার দান। তাই এই জঙ্গলের ভিতরে বাইরের কেউ যদি প্রবেশ করে এবং তার কাছে যদি দেবতার নির্যাসে তৈরি এক প্রকার বায়ুগন্ধী বটিকা না থাকে, তবে সেই কবচ নিজে থেকে এক্টিভেট হয়ে যায়। সে যে কী জিনিস তা আপনাকে বলতে পারবো না, এতে আমার বারণ আছে। এমনকি কাঞ্চন বা সাধারণ গ্রামবাসী অব্দি জানে না সেটা কী। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি বেশিরভাগ মানুষ ওখানেই আটকে যায়। আর এগোয় না। ওই যে কিছু যুবকের কথা বলছি যারা বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকস্তানে ঢুকবে বলে এদিকে এসেছিল

তাদের মধ্যে সবাই ওই রক্ষাকবচের সম্মুখীন হবার আগেই পালিয়ে এসেছিল। শুধু একজন টিকে গিয়েছিল এবং কোনোপ্রকারে রক্ষাকবচ ডিঙিয়ে এগিয়েও গিয়েছিল কিছুটা। ওখানে আমাদের এক দলের বারোজনের একজনের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সে মারা যায় এবং আমাদের দলের একজন শহীদ হয়। দুর্ভাগ্যবশত সে ছিল পরীক্ষাগারে কর্মরত ছাত্রটি। ফলে দু-জনকেই পরদিন চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ডোম ভাইয়েরা প্লাস্টিকের পোশাক পরে সে কার্য সমাধা করে। তড়িঘড়ি আবাসনের গুরুদেব, যিনি সমগ্র আবাসনের দায়িত্বে আছেন, তিনি একজন সমতুল্য ছাত্রকে তৎকালীন হেমন্তাই দ্বারা শোধন করে জঙ্গলে পাঠালেন। শহীদ হওয়া ছাত্রের দেবতার সংস্পর্শে থাকার মেয়াদ আর একদিন বাকি ছিল তাই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। নইলে সম্পূর্ণ চক্রটিতে নেমে আসতে পারত কালো অন্ধকার।

রামানুজ আর কোনো প্রশ্ন করল না। কল্যাণ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল। সিনহা এবার বেশ কড়াভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ''রক্ষা কবচটি সম্পর্কে আমাদের বলুন।''

হেমন্তাই তাকে হাত জোড় করে বললেন, ''স্যর আমি কিন্তু আসামী নই। আমি নিজে থেকে দৌড়ে এসে সমস্তটা আপনাদের জানিয়েছি। যদি বলতে পারতাম আমি নিশ্চয়ই আপনাদের বলে সাহায্য করতাম। ভুলবেন না, আমি এখনও গ্রামের হেমন্তাই। আর যতক্ষণ না আমি ক্রিয়া সম্পন্ন করব আর কেউ হেমন্তাই হতে পারবে না বা আমি চাইলেও কাউকে সমস্ত ক্রিয়াদি বুঝিয়ে দিতে পারব না। হ্যাঁ, আমি যখন আর হেমন্তাই থাকব না আমি নিশ্চয়ই আপনাদের এ ব্যাপারে বলতে পারব। আমি আপনাদের এই কথা বললে যদি আমার শক্তি হ্রাস হয়, আর আমি পরবর্তী ছাত্রের দলকে স্বসম্মানে শোধন করে জঙ্গলে না পাঠাতে পারি, তবে আমি আমার গ্রামের কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না। নিজের নিজেকে হত্যা করব সেক্ষেত্রে। অন্যায় অনুরোধ বা আদেশ আমাকে করবেন না।''

সিনহা সাহেব ক্ষুণ্ণ হলেও ব্যপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেম। নিরস্ত্র হলেন তিনি। আর তখনই রামানুজের মাথায় প্রশ্নটা এল, "হেমন্তাই নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা কী?"

"মাপ করবেন, সেটাও আমি বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি যে একজন হেমন্তাই তার আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার কারণে সংক্রামিত হবার পরেও প্রায় পাঁচ বছর অব্দি সুস্থভাবে বাঁচতে পারে। আর এই কার্য একজন নারী ছাড়া সম্ভব হয় না। আবাসনে বারোজন নরের সমান একজন নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই নারীই পরবর্তী হেমন্তাই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।"

"যে কেউ কি হেমন্তাই হতে পারেন?"

দাসবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন। হেমন্তাই এবারেও সপ্রতিভ উত্তর দিলেন, "যিনি তার শরীরে হেমন্তাই হবার শক্তি ধারণ করতে পারেন তিনিই হতে পারেন। সেটা যে কেউ হতে পারে।"

রামানুজ হেমন্তাইয়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অনেক বড় উপকার করলেন। আপনাকে ভুল ভেবেছিলাম। দুঃখিত!"

হেমন্তাই রামানুজের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা দু-হাতে চেপে ধরল। বলল, "শুধু আমার ছেলেটার জন্য আজ এসব করলাম। শুধু ওকে একটু দেখে রাখবেন আপনারা। গ্রামবাসীরা ওকে পেলে মেরে ফেলবে।"

হেমন্তাইয়ের চোখে জলের ফোঁটা রামানুজের হাতেও অল্প পড়ল। হেমন্তাই দ্রুত নিজেকে সংবরণ করলেন। রামানুজ অপর হাত দিয়ে তার হাত ধরে একটা ভরসার ঝাঁকুনি দিল।

রামানুজ শেষবারের মতো একটা কথা জিজ্ঞেস করল তাঁকে, "আপনারা সকলে বিখ্যাত চন্দ্র বংশীয় তাই না! নাহলে উপজাতি হয়েও হিন্দু দেবদেবীর পুজো আর কেউ করে বলে শুনিনি আমি।"

হেমন্তাই শুকনো হাসলেন। উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি কাঞ্চনের

মাথায় হাত রেখে আদর করে এবং বাকি সবাইকে হাত জোড় করে প্রণাম করে সামনে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

দাসবাবু বললেন, "চলুন, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ভোগ নেওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

সিনহা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "অর্ধেক রহস্যের সমাধান তো এখানে আসামাত্রই হয়ে গেল। জয় ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের জয়।"

বাকিরাও ধ্বনী তুলল, "জয় মা, জয় মা।"

রামানুজ শুধু ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছিল যে এতদিনে এবার যুদ্ধ শুরু হবে।

* * * * * * * * * * *

(৮)

রাত ক-টা বাজে সেদিকে আর খেয়াল নেই। গত বারো বছরের একটানা ধকল এবার শেষ হবার পথে। শুধু বারো বছর বললে ভুল বলা হয়। জন্মাবধি শুধু এই লক্ষ্যেই কাজ করে গেছে সে। নিরলস পড়াশোনা, শারীরবিদ্যা, অস্ত্রশিক্ষা। আবাসনের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হবার দৌড়ে সবসময় এগিয়ে থাকার জেদ। স্বপ্ন পূরণের জন্য শুধু অধ্যবসায় থাকলে হয় না। প্রয়োজন জেদ আর আত্মবলিদানের। যখন তার বয়সীরা খেলাধূলায় মেতে উঠেছিল কিংবা প্রথম যৌবনে নারীর স্বাদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখনও সে তার স্বপ্ন পূরণের পথ থেকে সরে আসেনি। ধীরে ধীরে সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তার মাথাতেই উঠল। শুধু তাই নয়, ভাগ্যও তার সঙ্গে ছিল। কে কোন বছর দেবতার সংস্পর্শে আসবে তা ঠিক করেন গুরুদেব। গুরুদেব কোনো কারণে তাকে একদম শেষ বছরে দেবতার সংস্পর্শে আসার জন্য চয়ন করলেন। ফলে আরও কিছু বছর জীবনের স্বাদ, গন্ধ নেওয়ার সুযোগটা পেয়েছিল সে। আজ পরীক্ষাগারের বাইরে একটি চেয়ারে বসে সে সম্পূর্ণ জীবনটা নিয়ে ভাবছে। তার সামনে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বনভূমি। অল্প দূরে কারাগার থেকে ভেসে আসছে তার এগারো সঙ্গীর গোঙানির শব্দ। কিছু সময় আগে তাদের কাঁচা মুরগী দিয়ে এসেছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ করে ফেলেছে তারা। আবার হয়ট ক্ষিদে পেয়েছে তাদের। আজ রাতের শেষ খাবারটা দিয়ে আসতে হবে। মাঝে মাঝে তারও শরীরটা কীরকম যেন করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে এখনও সামলে রাখা যাচ্ছে। তবে আর বেশিদিন নয়। সে বুঝতে পারছে যে সময় তো হয়ে এল।

গোঙানিটা বেড়েই চলেছে। চিন্তাসূত্র বারবার ছিন্ন করে দেয় এই রুক্ষ

জান্তব গোঙানি। কত ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে পুকুরঘাটে যাবার কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে বিকেলের দিকে সড়কের ওপাশের জঙ্গলে পাখি দেখতে যাবার কথা। ওদিকটায় নানারকম পাখি এসে বসত বিকেলে। ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন নাম না জানা পাখি। বাবা বেশিদিন বাঁচেনি। বাবা মারা যাবার পর পাখিরাও কোনো কারণে আসা বন্ধ করে দিল। বিকেলের একান্ত আপন অবকাশটুকুর প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। আর কিছুদিন পর সাঁপের কামড়ে মা-টাও মরে গেল। গ্রামের লোক ঘরদোর জবরদখল করে নিল অল্প দিনের মধ্যেই। ততদিনে অবশ্য ঘরের প্রয়োজনও তার ফুরিয়েছে। আবাসনে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছে সে। মাঝে মাঝে যখন শরীরটা খিঁচুনি দিয়ে জানান দেয় যে হাতে আর বেশি সময় নেই, কেন জানি এখন শুধু মা আর বাবার মুখটার কথা মনে পড়ে তার। মাঝে মাঝে ভাবে সবই তো হল, দেবতাকে প্রায় বারো বছর ধরে সামনে থেকে দেখা, বিগত এক বছর ধরে দেবতার সেবা করা, তাঁর নির্যাস সংগ্রহ করা, তাঁর সঙ্গে তাঁর মন্দিরে বসবাস করা সবই হল— শুধু আরেকবার যদি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করা যেত! যদি বাবার হাত ধরে পাখি দেখতে যাওয়া যেত। পাখিরা কি আর আসে ওদিকের জঙ্গলটায়!

একটা জন্তু ভীষণভাবে গুঙিয়ে উঠে। নাহ, আর বসে থাকা যায় না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বসে সে। কারাগারের দিকে এগিয়ে যায় সে। নিশুতি রাতে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। এই অংশটায় ভাঙা চাঁদের আলো আজ অল্প পৌঁছাচ্ছে। কুয়াশায় ঢেকে আছে আকাশ। তবুও আলোর কোনোনকমতি নেই এখানে। গন্দবেরুন্দার দেহ নিঃসৃত পদার্থের আলোক ছটায় চারদিক উজ্জ্বল। কয়েক হাজার পাওয়ারের বালব জ্বালানো হয়েছে যেন। এই পদার্থের হাজার হাজার গুণ। শুধু একটাই দোষ। মানুষকে মানুষ থেকে সত্যিকারের শয়তানে পরিণত করে।

কারাগারের সামনে একটা বালতিতে ডাঁই করে রাখা আছে কাঁচা মুরগীর মাংস। বালতিটা তুলে এগিয়ে গেল সে। পরপর এগারোটা কারাগার।

দু-ফুট পুরু দেওয়াল দিয়ে দিয়ে একটা কারাগারকে অপরটা থেকে আলাদা করা হয়েছে। এই জানোয়ারের গায়ে অনেক জোর। পাঁচ ইঞ্চির দেওয়ালকে গায়ের জোরেরি ধসিয়ে দিতে পারে এরা। লোহার শিখগুলো একেকটা অসম্ভব রকমের মোটা। নিদেনপক্ষে পঞ্চাশ এম এম ব্যসের তো হবেই। তার পিছনের একেকটা জানোয়ারের বাসা। খাবারের গন্ধ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সকলে। গোঙানি হয়েছে তীব্র। প্রথম প্রথম তার একটু ভয় ভয় করত। কিন্তু এত বছরের সেই ভয় মরে গেছে। সে জানে আর কয়েকদিনে সেও পরিণত হবে এরকম জানোয়ারে, যার বোধ বিবেচনা, বুদ্ধি, মানবিকতা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। শুধুমাত্র বন্য জিঘাংসা কাজ করবে মাথায়।

বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি ছিদ্রের মাধ্যমে প্রত্যেকটা কারাগারের ভিতর দু-টো করে আস্ত মুরগী ফেলতে থাকে সে। সকলকে দেওয়া হয়ে গেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাইরে থেকে সবগুলো কারাগারের ভিতরে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মানুষের মতো দেখতে একেকটা হিংস্র প্রাণী কাঁচা মুরগীগুলোকে খুবলে খাচ্ছে। কেউ বা খাচ্ছে সরাসরি চিবিয়ে। হাত গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। কালো কালো দাঁটের মাড়িগুলো রক্তে ভরে উঠছে। কাঁচা মাংস চিবোচ্ছে তারা। চোখ বলে আলাদা করে কিছু নেই। সমস্তটাই ডিমের সাদা অংশের মতো হয়ে গেছে। শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই। তবুও কারাগার খুলে দিলে এরা এগিয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসবে। যাকে পাবে তাকেই ছিড়ে খাবে এরা। এদের শুধু মাংস চাই। খাদ্য চাই এদের। অসীম ক্ষুধা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি এদের শরীরে অবশিষ্ট নেই।

সে দেখতে দেখতে ভাবতে থাকে যে আর কিছুদিনের মধ্যে সেও পরিণত হবে এরকম বোধবুদ্ধিহীন ক্লীবে। ক্ষুধা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি কাজ করবে না। সারা জীবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা, গবেষণা, শারীরবিদ্যা, অস্তিশিক্ষা সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি এরকম নিষ্ঠুর হবে ভেবে একবার কেঁপে উঠল সে। তারপর মনে পড়ল তার তো এসব একদিনের বেশি সহ্য করতেও

হবে না। শেষ মুহূর্তে যখন শরীর জবাব দিয়ে দেবে, সমস্ত সত্তায় চেপে বসবে এক অজ্ঞাত দানব তখন প্রথমেই সকলকে খুলে দিতে হবে কারাগার থেকে। ধীরে ধীরে ততক্ষণে সেও জানোয়ার হয়ে মিশে যাবে এই ভিড়ে। গ্রামে তখন চলছে যজ্ঞ। ক্রিয়ার প্রভাবে সেই অভিমুখেই হাঁটবে ওরা সবাই। আর সেখানে পৌঁছানো মাত্র একটাতীরের ফলা এসে বিঁধবে মাথায় কিংবা তলোয়ারের ধারালো কোপ এসে বসবে গলায়। ব্যস, খেলা শেষ।

হঠাৎ করেই তার মনে হতে লাগল এই পরিণতির জন্যই কি তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল নিজেকে! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পর, গ্রামের জন্য-মানবসভ্যতার জন্য সমস্ত বলিদানের পর শুধুমাত্র একটা তীরের ফলা প্রাপ্তি হবে তার! নিজেকে প্রশ্ন করল সে— "একদিন এটাই তো তোর স্বপ্ন ছিল।"

নিজের ভিতর থেকেই উত্তর এল, "না না, এটা স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্ন ছিল শ্রমিক শ্রেষ্ঠ হবার। গ্রামের জন্য, মানবসভ্যতার জন্য কাজ করার। যদি মরেই গেলাম, উহু ভুল "যদি হত্যাই করা হল আমাকে, তবে আমি কীসের শ্রেষ্ঠ! দেবতা গন্দবেরুন্দা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেই এই অবতার নিয়েছিলেন। তবে আমি কেন আমার শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে মৃত্যু বরণ করবো। গ্রামের জন্য এত কিছু করার পর যদি ওরা আমাকে একটা তীরের ফলাই উপহার দেয়, তবে আজ থেকে সেই কাজ, সেই মনোভাব পরিবর্তন করলাম।"

কথাগুলো নিজের মনে ভাবতে ভাবতে হাতে ধরে রাখা লোহার বালতিটাকে মুচড়ে ফেলে সে। তার শরীরে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দুই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। ধাতব বালতি হাত থেকে খসে পড়ে শুনশান জঙ্গলে। অদ্ভুত ধাতব শব্দে কেঁপে উঠে জঙ্গল।

মাটিতে বসে সে মাটি খামচে ধরেছে। তার শরীরে রক্তসঞ্চালন বেড়ে যাচ্ছে। পেশি ফুলে উঠছে। সে বুঝতে পারছে তার দেহ আর তার বশে

থাকতে চাইছে না। সে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, শরীরের হাড়গুলো যেন ভিতরে নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আজ যদি তার দেহে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়, তাহলে অনর্থ হয়ে যাবে। হাতে তো আরও কয়েকটা দিন বাকি ছিল।

সে নিজেকে যথাসম্ভব নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করে। মাটিতে ঝিম ধরে বসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। তার মাথা ঘুরছে, জিভ শুকিয়ে এসেছে, চোখে ঝাপসা দেখছে সে। মণির পরিবর্তন হয়েছে কি হয়নি বোঝা যাচ্ছে না। অবিরত সে আঙুল দিয়ে মাটি খুড়ে চলেছে সে। প্রথমাবস্থায় প্রায় তড়িদগতিতে নখরের বৃদ্ধি ঘটে। সেটা আটকায়াতেই সে মাটি খুড়ে চলেছে প্রাণপণে। মাটির সঙ্গে ঘষায় নখ বাড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। দাঁতের মাড়িতে অদ্ভুত একটা কিড়মিড় শুরু হয়েছে। গলার শিরা ফুলে ঢোল। সে এবার প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, যেন নিজের সত্ত্বার সর্বশেষ সঞ্চিত শক্তিটাও খরচ করে ফেলল সে। তারপর ঝিমিয়ে পড়ল মাটিতে। বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগল সে। তার চিৎকার শুনে কারাগারের জানোয়ারগুলো অব্দি খাওয়া বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গোঙানি বন্ধ করেছে তারা।

আর তখনই দেখা গেল প্রাণীটাকে। কারাগারে বন্দিরাই প্রথমে ঘ্রাণ পেল সেই প্রাণীর। ওরা ঘ্রাণের মাধ্যমে প্রাণীটার দিক নির্দেশনের চেষ্টা করল। কারাগারের চারদিকে শুঁকতে লাগল ওরা। তারপর সকলেই বুঝতে পারলো বিপদ আসছে ডানদিক ধরে। যেখানে মাটিতে ঝিমিয়ে পড়ে আছে এক উপজাতি যুবক, তার থেকে দশ হাত দূরে জঙ্গলের উত্তর পশ্চিম কোন থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা। এবার যুবকের কানেও শব্দটা এল। প্রাণীটা মুখে অদ্ভুত গর গর শব্দ করছে। সে মাথা তোলার চেষ্টা করে কিন্তু মাথাটাকে খুব ভারী মনে হচ্ছে তার। সে কোনো মতে মাথাটা তুলে। তারপরেই আবার মাথাটা নেমে আসে নীচে। সে মাথা তুলে ধরে রাখতে পারে না।

মুহূর্তের মধ্যে তার মাথা নীচে নেমে এসেছে ঠিকই। কিন্তু এরই মধ্যে সে যা দেখার দেখে নিয়েছে। তার দিকে খুব ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে একটা হিংস্র শৃগাল। দাঁতগুলো বের করে রেখেছে সে। ঠান্ডায় শেয়ালের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গরর গরর শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা। আজকে রাতের জন্য নিশ্চিত শিকার পাওয়া গেছে। আর যেহেতু শেয়াল তাই সে কখনো একা আসবে না। আপাতত সে এদিকে একা আছে। কিন্তু অচিরেই যে একটা আস্ত শেয়ালের দল এখানে চলে আসবে তা বলাই বাহুল্য। এই একটা শিকারে আজকে দলের অর্ধেকের পেট আশাকরি ভরে যাবে। আপাতত একটাই এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মাটিতে ঝিমিয়ে বসে রইল সে। উঠার শক্তিটুকু নেই, সেখানে পালাবার প্রশ্ন আসে না। এভাবে শেয়ালের খাদ্যে পরিণত হতে সে আগ্রহী নয়। মাথা ধীরে ধীরে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে তার। পূর্বের দুর্বলতা ধীরে ধীরে কাটছে ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ফিরে আসেনি। হাতের কাছে কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে প্রাণীটাকে ভয় দেখানো যায়। সে বসে বসেই ভাবতে লাগল। মোক্ষম সময়ে বুদ্ধির চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই।

শেয়ালটা আর পাঁচ কদম দূরে আছে। এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। পিছনে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আরও কিছু গরর গরর শব্দধ্বনী ভেসে আসছে এখন। হয়ত অন্য শেয়ালেরা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছে গেছে এখানে। আর দুয়েকটা সেকেন্ডের মধ্যেই যুবকের টুটি চেপে ধরবে শেয়ালটা।

ঠিক তখনই মাথা তুলে তাকাল যুবক। সে এক মায়াময় দৃষ্টি স্থাপন করল শেয়ালটার উপর। এভাবে শিকার মাথা তুলে তাকানোতে শেয়ালটা ঝাঁপানোর আগে দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুতভাবে দুই অসম বান্ধব প্রাণী একে অপরকে দেখছে। তারপর যা হল তা একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল। দু-হাত বাড়িয়ে সে শেয়ালটাকে কাছে ডাকল। মুখ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করতে লাগল সে, যেন কত বছরের পোষ্য এই প্রাণী। অদ্ভুত এক সম্মোহনী দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে ছিল প্রাণীটার দিকে। প্রাণীটার চোখের মণির রঙটা ঈষৎ

পালটে গেল কি! অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে যেটা হল সেটা ছিল আরও অদ্ভুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। শেয়ালটার মুখের হিংস্র ভাব কমে গেল, সে মুখ দিয়ে চাপা গর্জন করা বন্ধ করল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল যুবকের দিকে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! যুবক কাছে ডেকে মাথায় হাত দিল শেয়ালটার। পরম আদরে কাছে টেনে বসাল প্রাণীটিকে। প্রাণীটাও জিভ বের করে আনুগত্য প্রকাশ করল। দূর থেকে অন্য শেয়ালগুলো ধীরে ধীরে এক অজানা সুরে শব্দ করতে শুরু করল। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে শেয়ালের দল। কিন্তু সামনের দৃশ্যে সমস্ত কিছু শান্ত। এক মানব সন্তান এক জন্তুকে পোষ মানাচ্ছে। নীরবতা ভঙ্গ করে যুবক বলল, "কেন এলি এদিকে? এখানে তো বন্য প্রাণীদের আসা যাওয়া বারণ। খামোখা এলি। যা চলে যা।"

মাথায় বিলি কেটে কথাগুলো বলল যুবক। শেয়ালটাও নির্বিবাদে সেই স্নেহমাখা সম্ভাষণের পরিবর্তে লেজ নেড়ে আনুগত্য প্রকাশ করল।

"আমি এবার উঠব। অনেক কাজ বাকি। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই রে। যাহ যাহ, চলে যা।"

যুবক উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। শরীরের দুর্বলতা তার প্রায় কেটে গেছে। কিন্তু উঠতে গিয়ে বাঁধা পায় সে। শেয়ালটা তার গায়ের কাছে এসে ঘেষে বসেছে। নতুন মনীবকে ছেড়ে থাকার ইচ্ছে নেই তার। ওদিকে শেয়ালের দল কোনো কারণে কান্না জুড়েছে। জঙ্গলের উপরে এক ফালি চাঁদ প্রমাদ কুয়াশার পাতলা চাদরে নিজের লজ্জা নিবারণে ব্যস্ত।

"কী হল, উঠতে দিবি না আমাকে!"

শেয়াল এবার এর উত্তরে একবার শুধু তীক্ষ্ন দাঁতের রেখা দেখিয়ে অল্প গর্জন করার চেষ্টা করল। হ্যাঁ চেষ্টায় করল, তার কারণ পরমুখাপেক্ষী সেই যুবক শেয়ালের দু-টো চোয়াল হাতের মধ্যে ধরে চিড়ে ফেলল শেয়ালটাকে। চোখের পলক পড়ার আগেই ঘটে গেল এই ঘটনা। যুবক মুহূর্তের ভগ্নাংশে শেয়ালের চোয়াল দু-টো ধরে উঠে দাঁড়াল আর চিরে ফেলল তাকে।

দু-ভাগ হয়ে গেল প্রাণীটা। যুবকের সাদা কাপড় রক্তে লাল হয়ে গেল। বর্তমানে তার এক চোখে মণি বর্তমান, অপর চোখ সম্পূর্ণ সাদা। গর্জন করছে সেই যুবক। সেই গর্জনে শেয়ালের দল ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়ছে। সঙ্গীর এই পরিণতি তাদের মনেও ভয়ের সৃষ্টি করেছে।

গায়ে ছিটকে পড়া শেয়ালের কাঁচা রক্ত জিভ দিয়ে চেটে খেল সে। শেয়ালের দল আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সেই স্থান সদলবলে ত্যাগ করল। জঙ্গলে শুধু ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। কারাগারের বন্দিরাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছু মুহূর্তের ব্যাপার। তারপরেই যুবক মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

* * * * * * * * * * *

(৯)

উদয়পুর থেকে ফেরার পরেরদিনটা কাটল সাধারণভাবেই। সরকারের কিছু অনুমতি নেওয়ার জন্য ছুটোছুটি করতে হল সবাইকে। আগামীকাল জঙ্গল সার্চ হবে। কাজেই সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সমাধা করতে চাই ফোর্স। দু-লরি বাহিনী আসবে। জঙ্গল অন্বেষণে এরা সিদ্ধহস্ত। সকলের কাছেই থাকবে আর্মস। গ্রামবাসী এদের দেখলে বাপ বাপ করে জায়গা ছেড়ে দেবে। আপাতত প্ল্যান এটাই। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু দপ্তরের অনুমতি লাগে। সিনহা আর রামানুজ সকাল থেকে সেসবের পিছনেই ছুটছে।

দাসবাবু একবার কিছু রক্ষী নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন। আগামীকাল যে সরকারিভাবে সার্চিং হবে এ বিষয়ে গ্রামবাসীকে আরেকবার জানাতে আসাই উদ্দেশ্য যাতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। দাসবাবু আজ এসে অবাক হলেন। হেমন্তাইসহ কোনো গ্রামবাসী আজ কোনো প্রতিরোধ বা সেরকম উত্তেজিত কোনো কথাবার্তাই বলল না। হেমন্তাই জিগ্যেস করলেন, "ক-টা নাগাদ আসবেন?"

"ফার্স্ট হাফের শুরুতেই এসে পড়ব আমরা।"

"বেশ বেশ। আসুন। গ্রামবাসী সকলের উদ্দেশে বলছি, আগামীকাল সরকারিবাহিনী এলে সকলে সরকারকে সাহায্য করবেন।"

গ্রামবাসীরাও বেশ বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে তাতে সম্মতি দিল। দাসবাবুর এসব ভালো লাগছিল না। তিনি বেশ অবাক হলেন। একদিনে এ কেমন পরিবর্তন!

তিনি রক্ষীদের নিয়ে ফিরে আসার উপক্রম করলেন। আর তখনই তার চোখ গেল জঙ্গলের দিকে। বড় বড় গাছগুলোতে কিছু গ্রামবাসী উঠে বসে কী যেন করছে। দাসবাবু কৌতূহলবশত এগিয়ে গেলেন। তার পিছন পিছন

কিছু গ্রামবাসীও সেদিকে গেল। দাসবাবু দেখলেন প্রায় প্রত্যেকটা গাছের গায়ে ওরা কিছু একটা পদার্থ ঘষছে। একজন এক গাছ থেকে কাজ সেরে নেমে অন্য গাছে উঠে কোমরে ঝোলানো কৌটো থেকে একটা তরল পদার্থ বের করে সেই গাছের গায়ে মাখাচ্ছে। কালো রঙের পদার্থটা দূর থেকেও চকচক করছে।

দাসবাবু একজন গ্রামবাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কী করছে?"

লোকটা হেসে বলল, "কিছু না। আমরা চাইছি কাল বৃষ্টি হোক।

দাসবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল। বললেন, "কাল বৃষ্টি চাওয়ার সঙ্গে গাছের মাথায় উঠে এসব করার অর্থ কী?"

হেমন্তাই এগিয়ে এলেন। হেসে বললেন, "ও কিছু না। কাল বলবো। আজ আসুন।"

রহস্যটা বোঝা গেল না। দাসবাবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গ্রাম ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন। সন্ধেবেলায় রামানুজ শহর থেকে ফিরলেদাসবাবু ব্যপারটা তাকে বললেন। রামানুজ বলল, "ভগবান জানে এই গ্রামে কখন কী হয়!"

সিনহা বললেন, "এবার কি ওরা প্রাকৃতিকভাবে বৃষ্টিপাতও ঘটাবে! গ্রাম নাকি নাসা!"

রামানুজ বলল অন্য কথা, "উঁহু প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হল কেন ওরা বৃষ্টি চাইছে! নিশ্চয়ই এই উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের সমাধান, যা এই মুহূর্তে আমরা বের করতে পারব না। চলুন কাল গিয়ে দেখা যাবে।"

পরেরদিন বেলা দশটার মধ্যে রামানুজ, দাসবাবু, সিনহা সকলেই পৌঁছে গেলেন গ্রামে। পিছনে বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। রামানুজের হাতে মাইক। চারদিকে গ্রামবাসী নিজের নিজের উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ কেউ মন্দিরের সামনে এসে জমায়েত করেছেন। কিন্তু কেউই মারমুখী নয়। সকলেই চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে আছে।

রামানুজ মাইকে ঘোষণা দিল, "এবার আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করব।

আমরা জানি এই জঙ্গল আপনাদের কাছে এক সংবেদনশীল বিষয়। কিন্তু যেহেতু এই গ্রাম সরকারের তাই সরকার যখন ইচ্ছে এই গ্রামে প্রবেশ করতে লোক পাঠাতে পারে। আমাদের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই। আমরা শুধু সরকারি আদেশনামা পালন করছি। আপনারা আমাদের এই কাজে সাহায্য করুন। আগামীদিনে সরকারও আপনাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।"

রামানুজ একটানা বলে থামল। ইচ্ছে করেই সে এক দু-টো শব্দ এরকম বলেছে যাতে গ্রামবাসী উত্তেজিত হতে পারে। কিন্তু সে দেখল প্রায় সবাই নীরব হয়ে বসে আছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা কিন্তু রামানুজকে কোনো হুমকি দিচ্ছে না। রামানুজ বুঝল যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সে সিনহা সাহেবের কাছে গেল। তিনি ফোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"আমি প্রায় নিশ্চিত যে ওরা কিছু একটা ভেবে রেখেছে আমাদের জন্য। সেটা জঙ্গলে ঢোকার আগে আমরা ধরতে পারব না। বাহিনীকে বলুন খুব সতর্ক হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করার জন্য। যেকোনো দিক দিয়ে হামলা হতেই পারে। আমরা কাউকে হারাতে পারবো না।"

সিনহা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি বাহিনীর সকলকে বুঝিয়ে দিলেন পরিস্থিতি।

হেমন্তাই ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন রামানুজের দিকে। বললেন, "গ্রামবাসী কেউ আপনাদের আটকাবে না। আপনি নির্দ্বিধায় ভিতরে জঙ্গলের প্রবেশ করুন।"

রামানুজ তাকে বলল, "কী জাল বিছিয়ে রেখেছেন তাই ভাবছি। আজ যে আমরা ভিতরে পৌঁছাতে পারব না তা আমি এতক্ষণে বুঝে গেছি। শুধু সরকারি আদেশনামার সম্মান রক্ষার্থে এগোতে হবে।"

হেমন্তাই হেসে বললেন, "আপনি আপনার কর্তব্য করছেন আর আমি আমার। তফাত নেই। এগিয়ে যান।"

রামানুজ আর কথা বাড়াল না। সে বাহিনীকে আদেশ দিল এগিয়ে

যেতে। নিজেও এগিয়ে গেল। বাহিনীর সকলের হাতে অটোমেটিক বনদুক ছিল। সিনহা নিলেন রাইফেল। দাসবাবু আর রামানুজের হাতে চকচক করে উঠল পিস্তল। জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলেন তারা।

হেমন্তাইয়ের কাছে এসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "বৃষ্টি হবে তো!"

হেমন্তাই আবাসনের গুরুদেবের দিকে তাকালেন। তিনিও এসেছিলেন আজ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। গুরুদেব ঘড়ি দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। হেমন্তাইয়ের বুকে এখন ঢাক বাজছে। যদি আজ বৃষ্টি না হয় তাহলে অনর্থ হয়ে যাবে।

বাহিনী ভিতরে দ্রুত প্রবেশ করতে লাগল। অদ্ভুত ছন্দে জঙ্গলের গাছপালাকে এড়িয়ে ওরা এগোতে লাগল। তাদের সঙ্গে রামানুজ আর সিনহা সাহেব পাল্লা দিয়ে এগোতে লাগলেন। তুলনায় দাসবাবু পড়লেন পিছিয়ে। তিনি একসময় বন্দুকে তাগ ছেড়ে দিয়ে শুধু দৌড়াতে লাগলেন যাতে একেবারে দলছুট না হয়ে পড়েন।

আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। গ্রামবাসীদের কেউ রামানুজদের পিছন পিছন জঙ্গলে প্রবেশ করল না। রামানুজ এক আধবার পিছন ফিরে তাকালো। কেউ তাদের পিছনে আসছে না দেখে সে নিশ্চিত হল যে সত্যিই তাদের জন্য জাল পাতা হয়েছে। এবার শুধু বোঝার অপেক্ষা যে কী অপেক্ষা করছে অদৃষ্টে।

হেমন্তাইসহ সকল গ্রামবাসী তাকিয়ে আছেন উপরে। হেমন্তাই আবার তাকালেন গুরুদেবের দিকে। গুরুদেব এবার ইশারা দিলেন, হেমন্তাই সেই ইশারা দেখে আবার উপরে তাকানোর আগেই বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা এসে পড়ল তার গায়ে। মুখে খুশির ঝলক দেখা দিল তার। এবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না সেখানে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেকটা এগিয়ে গেছে ওরা।

রামানুজেরা এগোচ্ছিল ভালো গতিতে। হঠাৎ রামানুজের গায়েও বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। রামানুজ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি সিনহাও

দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বাহিনীকে দাঁড়াবার নির্দেশ ছিলেন। আজ ঠান্ডা থাকলেও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অন্তত আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট দেখে তাই জানা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বৃষ্টি হল। কেন হচ্ছে এই বৃষ্টি?

উত্তরে পেতে আর কয়েক মুহূর্ত শুধু অপেক্ষা করতে হল। প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটল রামানুজ থেকে কয়েক ফুট দূরে। সে কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। আরও একটা বিস্ফোরণ, এবার বাহিনীর পায়ের সামনে। রামানুজের মাথাটা তখন খুলে গেছে। সে আন্দাজ করে ফেলেছে যে ঠিক কী হতে চলেছে। সে চিৎকার করে উঠল, "সকলে দৌড়াও। গ্রামের দিকে দৌড়াও। জঙ্গল থেকে বেরোও সবাই।"

সিনহা সাহেব বুঝলেন আর বেশি সময় নেই। তিনি ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে দৌড়ালেন। সকলের প্রতি চিৎকার করে বললেন, "জঙ্গল ছেড়ে বেরোও সবাই।"

ফোর্স আর দেরি করল না। আবার উলটো পথে দৌড় শুরু করল। ততক্ষণে ছোট ছোট কিছু বিস্ফোরণও ঘটা শুরু হয়ে গেছে। দাসবাবু প্রমাদ গুনলেন।

রামানুজ তাকে ছাড়িয়ে উলটোদিকে দৌড়বার সময় বলে গেছে, "পিছনে ঘুরুন। গ্রামের অভিমুখে দৌড়ান।"

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল এবার। আর দেখতে দেখতে শান্ত জঙ্গল হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ। আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিগর্ভ কারণ এখন জঙ্গলের চারদিকে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেছে। কোনো বিস্ফোরণ বড় কোনোটা ছোট। কিন্তু পরপর চেইনের মতো চারদিকে বিস্ফোরণ ঘটছে। কোনোটা সাধারণ শব্দ বাজির মতো, কোনোটা এক্কেন মিনি বোমা। গ্রামবাসী সকলে জঙ্গলের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা এখন পলায়মান বাহিনী দেখতে এসেছেন। বাহিনীর অনেকেই এখন দৃশ্যমান। সকলেই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন।

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন সকলে। বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।

জঙ্গলের ভিতরে বিস্ফোরণের বাণ ডেকেছে যেন। সকলে সেই বিস্ফোরণের আঘাত থেকে বাঁচতে দৌড়াচ্ছে। কারো ডানদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে কারো বাঁ-দিকে, কারো একদম সামনে। বারবার দিকপথ পালটাতে হচ্ছে সকলকে। সোজা দৌড়ানো যাচ্ছে না। কোথাও মাটি:ঃ বৃষ্টির জমে থাকা জল অব্দি বিস্ফারিত হয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সঙ্গে ছোট ছোট অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। অদ্ভুত ভয়ংকর এক দৃশ্য, যেখানে এক দল মানুষ এর মজা নিচ্ছে অপরদল নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণ ছুটছে। একে একে সকলে এসে ঝাঁপিয়ে জঙ্গলের বাইরে এসে পড়ল। রামানুজ এসে ছিটকে পড়ল হেমন্তাইয়ের পায়ের কাছে। একে একে বাকিরাও। দাসবাবু সকলের শেষে। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তারা দেখল জঙ্গলের সমস্ত বিস্ফোরণের ফলে সাদা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। জঙ্গলের অভ্যন্তরে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর বীভৎস শব্দ কানে আসছে। এভাবে চলল আরও মিনিট পনেরো। তারপরেও বন্ধ হচ্ছে না।

সিনহা বৃষ্টির মধ্যেই এসে হেনন্তাইয়ের সামনে রক্তচক্ষু আস্ফালন করলেন।

"কী এসব? অন ডিউটি এতগুলো অফিসারকে মারার চক্রান্ত করেছিলেন আপনারা? এবার জেলে পঁচে মরুন।"

হেমন্তাই শান্ত ধীর স্থিরভাবে বলল, "আমরা তো কিছু করিনি। বৃষ্টি হলে আমাদের জঙ্গলে মাঝে মাঝে এরকম বিস্ফোরণ হয়।"

সিনহা রেগে বললেন, "কী ফালতু কথা বলছেন আপনি? আর এই বৃষ্টি তো আপনারাই করিয়েছেন।"

হেমন্তাই হাসল, "এই যুক্তি আদালত মানবে তো?"

সিনহার কপালের ভাঁজগুলো সোজা হয়ে গেল। সত্যিই, আদালত তো গাছের মাথায় উঠে কোনো পদার্থ লাগানোর ফলে বৃষ্টি হয়েছে এই যুক্তি মানবেই না। আর এই বিস্ফোরণ তো বৃষ্টি হবার পরেই শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা এতে নেই।

রামানুজ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে বৃষ্টির জল হাত দিয়ে পরিষ্কার করল। বৃষ্টি এখনও কমেনি, না কমেছে জঙ্গলের বিস্ফোরণ। কোথাও কোথাও অল্প আগুনও লেগেছে। সেই আগুন আবার বৃষ্টির কারণেই নিভে যাচ্ছে। এ কেমন বৃষ্টি আগুন লাগাচ্ছে, আবার আগুন নেভাচ্ছেও! এই মুহূর্তে যারা দৌড়াচ্ছে তাদের মাথায় এসব ঢুকছে না।

রামানুজ এগিয়ে গেল হেমন্তাই-এর দিকে। তাঁর পাশে গুরুদেব দাঁড়িয়ে। রামানুজ বলল, "বৃষ্টির আহ্বান করতে নিশ্চয়ই দেবতার দেহ নিঃসৃত পদার্থের পরীক্ষালব্ধ ফল ব্যবহার করেছেন। তাই বৃষ্টি হবার জন্য আপনাদের জেলে ঢোকানো যাবে না। কিন্তু জঙ্গলে সোডিয়াম ছড়িয়ে রাখার জন্য গ্রেফতার করতেই পারি। কিন্তু খুব মজা পেলাম এই বুদ্ধিদীপ্ত শত্রুতার জন্য। সিনহাবাবু চলুন।"

দাসবাবু এখনও হাঁপাচ্ছেন। সিনহা গিয়ে তাকে ধরলেন। ধরে ধরেই তাকে গাড়িতে তুললেন। বাহিনীও গিয়ে লরিতে চেপে বসল। রামানুজ গাড়তে গিয়ে উঠার আগে হেমন্তাই তাকে ডাকলেন। রামানুজ ফিরে তাকাল।

"আগামীকাল অমাবস্যা। আমাদের কাছে এই রাত প্রতি বারো মাসে একবার আসে। গ্রামের চৌহদ্দিতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবো না। তবে সড়ক থেকে সম্পূর্ণ ক্রিয়া সুন্দরভাবে দেখা যায়। পারেন তো সেখান থেকে দেখবেন, আমি যা যা বলেছি তার সমস্ত কিছু সত্য। ভুল বলেননি আপনি, গন্দবেরুন্দা দেবের নিঃসৃত পদার্থের নির্যাস থেকেই ঠিক এই বৃষ্টি আহ্বায়ক পদার্থ সৃষ্টি করেছিলেন কিছু ছাত্র। বাকিটা বিজ্ঞান। সোডিয়াম ধাতু ছড়িয়ে রেখেছিলাম আমরা। বৃষ্টি জলের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় এই বিস্ফোরণ। আজ এত সব কিছু যে কারণে করছি সেই কারণটাই আগামীকাল জানতে পারবেন। চাক্ষুস দেখতেও পারবেন। আসবেন আগামীকাল।

রামানুজ উত্তর দিল না। আজকে যা হল তাতে সে ভয়ানক রেগে গেছে।

এখন কিছু বললে ভুলভালই বলবে। তার থেকে আগামীকাল ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। সে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ফিরে এল বাংলোতে।

দাসবাবুকে বিছানায় শুইয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হল। বাকদেরও অল্প বেশি কাটা ছেড়া আছে হাতে পায়ে। সরকারকে জানানো হল হঠাৎ জঙ্গলে দাবানল শুরু হওয়ায় আজকের তল্লাসি সম্পূর্ণ হয়নি। দাবানল যে খুব একটা সময় থাকেনি বৃষ্টির জন্য সেটাও জানানো হল। সঙ্গে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে খুব শীঘ্রই আবার জঙ্গলে প্রবেশ করবে তারা।

রাতের বেলায় সকলে মিলিত হল ব্যালকনিতে। দাসবাবু এখন অনেকটাই সুস্থ। আজ আবার আসর বসল। গ্রামের আবাসনের বুদ্ধির তারিফ করল প্রায় সকলেই। এইটুকু একটা গ্রাম একটা জঙ্গলকে বাঁচাতে জান প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে, এই ব্যপারটার প্রশংসা সকলের মুখে ছিল আজ। তারপর রামানুজ তাদের জানালো, "আগামীকাল ক্রিয়াটা হবে। বারোজন বেরিয়ে আসবে জঙ্গল থেকে। লড়াইয়ের পর আবার নতুন বারোজন প্রবেশ করবে জঙ্গলে। সড়কের উপর দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ক্রিয়া দেখার আহ্বান এসেছে। কী করা উচিত।"

দাসবাবু সবার আগে উত্তর দিলেন, "কী আবার! আমরা যাবো।"

ভদ্রলোক আজকের ঘটনার পর যেন একটু বেশিই তেঁতে আছেন। এরকম সাহসী উত্তর আরও বেশ কয়েকবার দিয়েছেন তিনি।

সিনহা বললেন, "এখানে একা যাওয়া ঠিক হবে না। আমি একটা ফোর্সকে এখান থেকে আগে যে বস ক্যাম্প আছে সেখানে ডেকে রাখছি। যদি অবস্থা বেগতিক দেখি ওদের আসতে পনেরো মিনিট সময় লাগবে। এখানে এসে এত ফোর্স নিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।"

রামানুজ চুপ করে নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। সে মনে মনে একটা ভীষণ যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছে। এই যুদ্ধটা কাদের সঙ্গে হবে এটা সে বুঝতে

পারছে না। আগামীকাল রাতে গ্রামের ক্রিয়া দেখার মনস্থ করল সে।

* * * * * * * * * *

ওদিকে যুবক এখনও মাটিতে লুটিয়ে আছে। তার জ্ঞান ফেরেনি এখনও। তার থেকে অল্প দূরে পড়ে আছে মৃত শেয়ালটা। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল। শেয়ালের রক্তের দাগ এই ঠান্ডায় জমে জঙ্গলের মাটিতে বসে গেছে। জঙ্গলের এই অংশ মূল গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে রয়েছে। এদিকটায় বৃষ্টি হয়নি। এদিকের গাছের মাথায় নির্যাস লাগানো হয়নি, তাই এদিকে বৃষ্টিপাত হয়নি। হলে এসব রক্ত ধুয়ে যেত, হয়ত যুবকের জ্ঞানও ফিরে আসত। এতক্ষণ ধরে খাবার না পেয়ে কারাগারের বন্দিরা একনাগারে গুঙিয়ে চলেছে। বীভৎস শব্দ হচ্ছে কারাগার থেকে। আর সবচেয়ে ভয়ানক ব্যপার হল, দেবতার জাগার সময় হয়ে এসেছে। আর একদিন মাত্র বাকি। যুবকের জ্ঞান ফেরাটা অত্যন্ত জরুরি।

রাত্রি আরও গভীর হলে একসময় যুবকের হাতের আঙুল নড়ে উঠল। মরার মতো পড়ে থাকা শরীর ভাঁজ হল। শরীরে একটা অস্বস্তি নিয়ে জ্ঞান ফিরলো তার। নিজেকে এভাবে মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করে প্রথমে খানিকটা অবাক হল। চারদিকে তাকিয়ে যখন মরা শেয়ালটাকে দেখতে পেল তখন স্মৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কোনোক্রমে উঠে বসল সে। দেহ অসাড়, কিন্তু চেতনা ফিরে এসেছে। দুর্বলতা আছে কিন্তু এখন আর সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। সে কোনোক্রমে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবতার মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল সে। যাবার পথে শেয়ালের ছেঁড়া মাথাটা তার পায়ের চাপে ভেঙে গেল।

সারা শরীরে ঘাস লেগে আছে, লেগে আছে মাটি। ছেড়া ফাঁটা ময়লা লেগে থাকা সাদা বস্ত্রটি এখনও গায়ে ঝুলছে। বহু অংশে রক্তের দাগ শুকিয়ে বস্ত্রটাকে লাল করে তুলেছে। সে এসে দাঁড়াল দেবতার সামনে। গন্দবেরুন্দা নৃসিংহদেব। দেবতার খোলসটা ঔজ্জ্বল্য যেন এক রাতের দ্বিগুণ

বেড়েছে। বাড়বে নাই বা কেন। দেবতার জাগ্রত হবার সময় হয়েছে তো। সে ভালো করে তাকাল দেবতার দিকে।

দেবতা বসে আছে। তার দুই পা দু-দিকে সমান বিস্তৃত। পেশীবহুল শরীর গড়িয়ে পড়ছে তরল নির্যাস। উপরের দিকে তাকালো সে। ঘাড়ের উপরের অংশে দেবতার দুই মাথা। হঠাৎ দেখলে মনে ভয় জাগে। দু-টো বিকট ঈগলের মাথা। ভাবতে অস্বস্তি হয় যে প্রকৃত দেবতা একসময় এই খোলস ধারণ করতেন। কখনো কখনো মনে হয় এ যেন খোলস নয়, সত্যিই দেবতা এখানে বসে আছেন। আর সত্যিই তো, আর তো চব্বিশ ঘণ্টা। দেবতা জেগে উঠবেন। তাঁর চোখে যেন লাল আভার ছটা।

যুবক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল দেবতাকে। তারপর উঠে দাঁড়াল। এবার তার চেহারা স্পষ্ট বোঝা গেল। ইতিমধ্যেই একটি চোখ সাদা হয়ে গেছে তার। খুব বেশি সময় বাকি নেই। শরীরের রক্ত এখন চঞ্চল। শরীরে আর অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুতবেগে ভাঙন শুরু হবে। যুবক এবার এগিয়ে গেল পরীক্ষাগারের দিকে।

পরীক্ষাগারের ভিতর ধোঁয়াটে অন্ধকারময়। নানা জায়গায় নানারকমের যন্ত্রাংশ। কোনোটায় কিছু ফুটছে, কোনোটায় আগুন জ্বলছে, কোনোটায় রঙিন তরল ভর্তি। বৈজ্ঞানিক পরিচিত যন্ত্রাবলির বাইরেও রয়েছে কিছু যন্ত্রাংশ যা সভ্য মানুষ কখনো দেখেনি। এক দিকে রয়েছে অনেকগুলো খাঁচা। সেখানে নানা বন্য প্রাণীদের ধরে তাদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের দেহে পাঠানো হয়েছে নিঃসৃত পদার্থের থেকে তৈরি বিভিন্ন প্রকার ওষুধ। বন্য ইঁদুর, গিনিপিগ, বাঁদুড়, জঙলি কুকুর, বানর থেকে শুরু করে কী নেই সেই খাঁচাগুলোতে। বেশিরভাগ প্রাণী নড়ছে না। হয়তো মরে গেছে আজ সকালেই। বিদঘুটে গন্ধ বেরোচ্ছে এখন। কিছু কিছু প্রাণী এখনও নড়ছে। লাশগুলোকে ফেলে যেগুলো বেঁচে গেল তাদের নিয়েই পরীক্ষা এগোবে।

খাঁচার এলাকা ছাড়িয়ে যুবক প্রবেশ করল পরীক্ষাগারের অন্দরমহলে।

একটা কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। এই কক্ষ তুলনামূলকভাবে অধিক শীতল। একটা বড় বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল সে। ঢাকনা খুলতেই একটা ঠান্ডা হাওয়া এসে ধাক্কা মারল। বোঝা গেল এটা একধরনের ফ্রিজার। যুবক সেখানে হাত ঢুকিয়ে বের করল একটা কাচের কৌটো। ভিতরে উজ্জ্বল সবুজাভ হলুদ বর্ণের পদার্থ দেখা যাচ্ছে। ঢাকনা দেওয়া কৌটোটা খুলে ফেলল সে। পাশে পড়ে থাকা একটা সিরিঞ্জ সেই পদার্থে ডোবালো। পদার্থ উঠে এল সিরিঞ্জের সূঁচ বেয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সিরিঞ্জের পদার্থ নিজের বাঁ-হাতের শিরায় চালান করে দিল যুবক।

কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। শিরাগুলো দপ দপ করতে লাগল। বাইরে থেকেও দেখা যেতে লাগল যে তার শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অংশে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ছটার বাহার। গলার শিরাতে সেই বাহারি রঙ ছুটছে। হাতের পেশিগুলোর সঙ্কোচন প্রসারণ ঘটতে লাগল। শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে গেল। এই ঠান্ডার মধ্যেও ঘেমে উঠল সে। আর সহ্য করতে না পেরে বিকট চিৎকার করে উঠল সে।

"আহ...হ...হ...হ"

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শরীরের ভিতরকার বিচ্ছুরণ বন্ধ হল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল তার দেহ। উঠে দাঁড়াল সে। ফ্রিজারের কাছে রাখা কাচের কৌটোটা তুলে নিল হাতে। এবার স্পষ্ট দেখা গেল তাকে। তার যে চোখটা সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছিল সে চোখ এখন মণি ফিরে এসেছে।

সে হাসিমুখে হাতের কৌটোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত বছরের সাধনার ফসল স্বরূপ তৈরি হয়ে গেল সেই মহৌষধ।

সে চিৎকার করে উঠল, "মৃত কৈটভ... মৃত কৈটভ।

উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল সে। কিন্তু এখন শুধু উচ্ছ্বাস দেখালেই হবে না। কিছু জরুরি কাজ বাকি আছে।

সে কারাগারের উদ্দেশে হাঁটল। কারাগারের কাছাকাছি পৌঁছাতেই কানে

এল বুভুক্ষু একদল জানোয়ারের গোঙানির তীক্ষ্ণ শব্দ। নিবিড় অরণ্যে এরকম শব্দ বুকে কাঁপন ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যুবকের মধ্যে কোনো হেলদোল দেখা গেল না। সে এগিয়ে গেল কারাগারের প্রত্যেকটা কক্ষের সামনে। হাতে ধরে রাখা উজ্জ্বল বস্তুটা সবাইকে দেখাল। তারপর বলল,

"মুক্তি চাস তোরা, মুক্তি? এই দেখ আমার হাতে এক কৌটো মুক্তি রয়েছে। আমরা সবাই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সফল হলাম আমি। আর এই সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব আমার।

বিচ্ছিরিভাবে হাসল সে। তারপর আবার বলল, "তোদের জন্যেও বরাদ্দ আছে এই মুক্তি। তোদের শরীরের রক্ত ছাড়া এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হতো না আমার। কিন্তু শর্ত একটাই। যদি এই মুক্তি তোরা চাস, তবে আমার জন্য কাজ করতে হবে।"

কথাটা বলেই তার মনে হল, ওরা তো কিছুই বুঝবে না এখন। ওদের

বোঝাতে হলে শরীরের ভিতর এই পদার্থ ঢোকাতে হবে। সে আর দেরি করল না। ওদের খাওয়ার জন্য ঝুলিয়ে রাখা মুরগীগুলোর ভিতর পরিমাণ মতো মৃত কৈটভ মিশিয়ে সে ওদের খেতে দিল। কিছু সময়ের মধ্যেই মহৌষধীর কাজ শুরু হয়ে গেল। যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সে নিজে গিয়েছিল ঠিক সেরকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেল প্রত্যেকটা কারাবন্দি জানোয়ার। ওদের শরীরের শিরায় শিরায় দেখা গেল সবুজাভ হলুদের আভা, যেন বর্ণছটাসহ বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে একেকজনের শরীরে। অল্প সময়ের মধ্যেই শান্ত হল ওরা। আবার কিছুটা মনুষ্যত্ব দিতে এল ওদের চেতনায়। একটা চোখ স্বাভাবিক হয়ে গেল।

এবার যুবক তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর দেখাল তার আবিষ্কার।

"বন্ধুরা, এই দিনটার জন্যেই তো আমাদের স্বপ্ন দেখা, এত পথ চলা। সুস্বাগতম, পুনরায় চেতনায় ফিরে এসেছ তোমরা। সুস্বাগতম।"

কারাগারের এগারো বন্দি তাদের বন্ধুর কথায় বেশ খুশি হল। তাদের শরীরে এখনও জীবানু রয়েছে। সেজন্যে তাদের অসুবিধেও হচ্ছে। একজন বলল, "এর চেয়ে ভালো কথা আর কি হতে পারে কৈটভ। কিন্তু তুমি আমাদের সম্পূর্ণ চেতনা ফেরালে না কেন?"

এই প্রশ্নে আবার শব্দ করে হাসল যুবক, যার নাম কৈটভ। তারপর বলল, "কারণ আমি চাই না তোমরা সম্পূর্ণ চেতনায় ফিরে আসো। আমি চাই তোমাদের মধ্যে জানোয়ার সত্বাটা বিরাজ করুক। আমি চাই তোমরা আমার সিপাহীর মতো হয়ে থাকো। আমি চাই এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে। আর এতে একমাত্র তোমরাই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আর দেখো শুধু তোমাদের নয়, আমি নিজেকেও অর্ধেক শয়তানে পরিণত করে ফেলব যাতে আমার ভালো গুণগুলো আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। অনেক হয়েছে মানবসভ্যতার জন্য নিজেদের বলিদান, এবার মানব সভ্যতা আমাদের জন্য কিছু করুক। বন্ধুরা, শুধুমাত্র তোমাদের মাথা আর চোখ যতে ভালোভাবে কাজ করে তাই অর্ধেক মানুষে পরিণত

করলাম তোমাদের। বাকি অর্ধেক আজীবন জানোয়ার থাকবে। মনে রেখো তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার কথা না শোনো তবে চিরতরে জানোয়ারে পরিণত হবে তোমরা। সেক্ষেত্রে বারো বছরের বেশি আয়ু নেই। হ্যাঁ, এই জীবানু যদি কারো দেহে প্রবেশ করে সে কোনোভাবেই বারো বছরের বেশি বাঁচবে না। কিন্তু সে যদি মৃত কৈটভ গ্রহণ করে এবং পুনরায় জীবানুর দ্বারা সংক্রামিত না হয়, তাহলে অমর হয়ে থাকবে। মৃত্যু ছুঁতেও পারবে না। একমাত্র পুনরায় এই একই জীবানুর দ্বারা সংক্রামিত হলে তবেই তোমাদের মৃত্যু সম্ভব। এর বাইরে তোমাদের কেউ কেটে ফেললেও তোমরা বেঁচে থাকবে। তবে হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে নিয়ম একটাই। পরিমাণ মতো প্রতিদিন মৃত কৈটভ গ্রহণ করতে হবে তোমাদের। নইলে আবার তোমরা পরিণত হবে জানোয়ারে। চিন্তা নেই, আমি তোমাদের পর্যাপ্তভাবে মৃত কৈটভের উপাদান সরবরাহ করবো।

কৈটভ থামল। বন্দিদের মধ্যে এই মুহূর্তে জানোয়ার প্রদত্ত মন্দ গুণের আধিক্যই বেশি। তারা গোঙাতে লাগল। কিন্তু তারা আনন্দিত। এই গোঙানি আসলে কৈটভের জয়ধ্বনীর প্রতীক।

একজন রুক্ষভাবে গোঙাতে গোঙাতে জিগ্যেস করল, "এই মহৌষধির নাম মৃত কৈটভ কেন রাখলি?"

কৈটভ হাসল, "অনেক কারণ। প্রথম কারণ দেবতা নিঃসৃত নির্যাসের সঙ্গে তোদের মৃত রক্ত মিশিয়েছিলাম। দ্বিতীয় কারণ পৌরাণিক। মৃত সঞ্জীবনী যেভাবে মৃতের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে তেমনি মৃত কৈটভ তোদের মতো জানোয়ারকে আবার মানুষে পরিণত করে। আমি, আমার নাম কৈটভ। আমার নামের উপরেই তাই এর নামকরণ করেছি 'মৃত কৈটভ'। শতাধিক বছরের তপস্যার ফল এই মহৌষধি। এর নাম এর স্রষ্টার নাম ছাড়া কার নামেই বা মানাবে। তোরা মনে রাখিস, এই ওষুধ বানাবার সমস্ত ফর্মুলা আছে আমার মাথায়। আমিই ভবিষ্যতে বানাবো অমরত্বের দাওয়াই। সুতরাং এখন থেকে এই গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমি।

হেমন্তাই আর গুরুত্বপূর্ণ লোক নয়। বরং হেমন্তাই আমাদের শত্রু। সে আমাদের হত্যার ছক কষতে বসবে আজ।"

কৈটভ কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল বন্দিদের কাছে। তারপর একে একে সকলকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিল। বেরিয়ে এল একেকটা আধা মানুষ আধা শয়তান। সবাইকে কারাগারের সামনের প্রাঙ্গণে জড়ো করল কৈটভ।

তারপর বলল, "এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম কাজ, হেমন্তাই হত্যা।"

সকলের মুখে ফুটে উঠল ক্রূর হাসি। একসঙ্গে অদ্ভুতভাবে গর্জন করে উঠল সবাই।

* * * * * * * * * *

(১০)

আজ সেই অমাবস্যার রাত। আজকে রাতেই সম্পন্ন হবে বারো বছর অন্তর পালন করা বিধি।

গ্রামবাসীরা একে একে নিজের কুঁড়ে ঘড় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। রাত তখন তিনটে। রামানুজ, সিনহা, দাসবাবু, অজিত, কাঞ্চন সকলে গ্রামের বাইরের সড়কের উপর এক কোনে আস্তানা গেড়েছে। আজ রাত্রে ঠিক কী হয় দেখার আগ্রহ সকলের। কাঞ্চন বাদে এই দৃশ্য আর কেউ আগে দেখেনি। তাছাড়া এই জঙ্গলের ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাবে সেইদিকে একটা আভাস আজকে মিললেও মিলতে পারে।

গ্রামের ঠিক মাঝখানের অংশটায় একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে আসনে বসে আসেন এই গ্রামের হেমন্তাই। হেমন্তাই শুভ্র সাদা বসনে তিনি যজ্ঞ কুণ্ডের আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন। ঠিক সামনেই রয়েছে এই গ্রামের আরাধ্য দেবতার মন্দির। একে একে গ্রামবাসী এসে জড়ো হতে শুরু করল। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ওরা এবার সমগ্র পূজা পদ্ধতির প্রয়োগ দেখবেন। হেমন্তাই তার সামনে পোঁতা বিভিন্ন গাছের ডালের পুজো শুরু করেছেন। দু-জন সহকারী রয়েছে হেমন্তাইয়ের পাশে। রামানুজ ওদের চিনতে পারল। ওরাই একদিন তার উপর চড়াও হয়েছিল হেমন্তাইকে বাঁচাতে। একজন মাঝে মাঝে শিঙার মতো দেখতে একটা বাদ্যযন্ত্রে ফুঁ দিচ্ছে। ফলে তা থেকে জোরালো শব্দ বেরুচ্ছে। অপর সহকারী একইরকম দেখতে আরেকটি যন্ত্রে ফুঁ দিচ্ছে, তা থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। এর মাঝেই হেমন্তাই তার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার গাছেদের পূজার্চনা করছে। পূজাপোকরণে রয়েছে ঘি, মধু, দুধ, ফল, বনজ ফুল এবং বিভিন্ন প্রকার গাছের ডাল।

কিছু সময় পর গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে কিছু মানুষ এসে উপস্থিত হল। তাদের বেশভূষা সৈনিকদের মতো। ওদের হাতে রয়েছে অস্ত্র শস্ত্র। কার হাতে কুঠার, কারো হাতে তীর ধনুক, কারো হাতে ধারালো অস্ত্রাদি। ওরা জঙ্গলের দিকে মুখে করে এবং অস্ত্র তাগ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের উদ্দেশ্য ঠিক কী, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ওরা উপস্থিত তা বোঝা গেল না। ওরা আসতেই গ্রামবাসী কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। ওরা যে আবাসন থেকে এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ ওদের সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা ওখানেই হয়, আর ওরা এসেছেও আবাসনের দিক থেকেই।

কাঞ্চন বলল, "কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চলে আসবে। তারপর যুদ্ধ শুরু হবে। বাবা ইতিমধ্যে নির্যাস থেকে সৃষ্ট সেই বায়ুগন্ধী পদার্থ ব্যবহার করেছেন।"

সড়কের এপারেও ভেসে আসছে সেই পদার্থের মিষ্টতা। সিনহা বললেন, "সাধারণ মানুষ এই গন্ধ শুঁকলে কোনো অসুবিধে হয় না তো?"

ককঞ্চন হাসল। হেসে বলল, "আমাদের গ্রামের সবাই কিন্তু সাধারণ মানুষ। এটা শুধু ওই মনুষ্যরূপী জানোয়ারদের ডাকার জন্যই। ওরাই শুধু এতে আকৃষ্ট হয়। এতে রক্তের গন্ধ আছে। কিন্তু আমি আপনি সেটা পাবো না। শুধুমাত্র ওরাই এই গন্ধ শুঁকতে সক্ষম। তাই তো এর নাম বায়ুগন্ধী।"

রামানুজ তারিফের সুরে বলল, "তোমাদের গ্রামের আবিষ্কারগুলো মারাত্মক। বহির্বিশ্বে কোটি টাকায় বিক্রি হতে পারে পেটেন্ট।"

কাঞ্চন বলল, "এগুলো সবই মানবসভ্যতার দান। এত হাজার হাজার বছরের পরিশ্রম, অধ্যাবসায়ের ফল। টাকা দিয়ে এর মূল্য হবে না দাদা। গ্রামের লোক কোনোদিন এই ফর্মুলাগুলো বিক্রি করবে না।"

রামানুজ বলল, "তা ঠিক।"

প্রতীক্ষা চলতে লাগল কখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে শয়তানের দল। গ্রামবাসী অপেক্ষা করছে। সিপাহীরা জঙ্গলের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা

করছে। ওরা পরে আছে বাঘের ছাল কাটা পোশাক। মাথায় ওদের মুকুট। কপালে রঙিন তিলক। গালেও বিভিন্ন রঙিন আঁকাবুঁকি। ওরা অধির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি ওদের সজাগ। হেমন্তাই এক পাশে বসে অপেক্ষা করছেন কখন ওরা আসবে। ওরা এলেই তিনি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়বেন। আজ হেমন্তাইকে দেখলে সাধারণ অন্যদিনের হেমন্তাই মানুষটার সঙ্গে পার্থক্য বোঝা যাবে। আজ তিনি রুদ্র তেজে তেজিয়ান। সাদা শুভ্র বস্ত্রের পরিহিত তার চোখ দুটো যেন জ্বলত ভাটা। গ্রামের পক্ষে যা অকল্যাণকর সমস্ত কিছু মুছে দিতে তিনি দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। আজ তিনি কারো পিতা নন, কারো সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু গ্রামের অভিভাবক। এই বিপুল আয়োজনের ধারক ও বাহক তিনি। আজকের দিনটাই তাঁর হেমন্তাই হবার শেষ রাত। তারপর সিংহাসনে বসবেন অন্য কেউ। আজ রাতেই তাঁর সমস্ত তেজ তিনি ঢালতে চাইছেন গ্রামের মঙ্গলের জন্য। প্রয়োজনে আজ নিজে হাতে তরবারি নিয়ে মাঠে নামতেও রাজি তিনি। তার পূর্বসুরিরা বহুবার এই কাজ করে দেখিয়েছেন, আজ তার পালা। তিনি অপেক্ষায় আছেন, কখন ওরা আসবে।

কিন্তু অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হতে থাকল। সড়কের উপর সকলে পায়চারি করছে, সিগরেট খেয়ে সময় কাটাচ্ছে। চোখে একটু ঘুম ঘুম ভাবও চলে আসছে অনেকের। গ্রামবাসীরাও অপেক্ষায়। অপেক্ষায় উপজাতি সিপাহীরা। কিন্তু আজ কিছুই ঘটল না। প্রায় ভোর সাড়ে পাঁচটা বেজ গেল। কিন্তু কেউ এল না। হেমন্তাই এবার চিন্তায় পড়লেন। এরকম তো আগে কখনো ঘটেনি। ওরা কি জঙ্গলে পথ হারিয়েছে? নাকি বায়ুগন্ধী পদার্থ তার কার্যে বিফল হচ্ছে?

এক সময় দেখা গেল আবাসনের গুরুদেব ছুটে এসেছেন। ওখানে একটা জটলা তৈরি হয়েছে। রামানুজ একটা সিগরেট খাচ্ছিল। এবার তার ধৈর্য্য জবাব দিয়ে দিল। সে সিগরেটটা নিভিয়ে সোজা হাঁটা লাগাল গ্রামের দিকে। পিছন থেকে বাকিরা ডাকল, "স্যর, স্যর... ক্রিয়া চলাকালীন গ্রামে ঢুকবেন

না।

কাজ হল না। রামানুজ কোনো কথা না বলে সোজা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হল হেমন্তাই আর গুরুদেবের সামনে। সকলের মুখ থমথমে। রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

হেমন্তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো অজানা আশঙ্কায় তার মন আকুল হয়ে আছে এই মুহূর্তে। রামানুজকে উত্তরটা দিলেন গুরুদেব, "জঙ্গলে কোনো মানুষ হাঁটাহাঁটি করলে আমরা সেটা আবাসন থেকে বুঝতে পারি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা নজরদারি রেখেছি। অধিকাংশই অডিও মাধ্যমের সাহায্যে। আমরা শব্দ শুনে হাঁটাচলা ইত্যাদি বুঝতে পারি। আমরা সেখানকার কম্পাঙ্ক দেখে বুঝতে পারছি যে সেখানে কিছু প্রাণী হাঁটাচলা করছে। এগুলো সাধারণ পশুর হাঁটাচলা থেকে ভিন্ন।

রামানুজ জিগ্যেস করল, "কোনো ভিডিও মাধ্যম নেই?"

গুরুদেব বারকয়েক তাকালেন হেমন্তাইয়ের দিকে। হেমন্তাইয়ের চোখের দৃষ্টি দেখে কিছুই বোঝা গেল না। রামানুজ পরিস্থিতি বুঝে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে বলুন। আমি এই গ্রামের সমস্ত কিছুই জানি। আর আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন।"

গুরুদেব পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে বললেন, "আগে ছিল না। বর্তমানে টেকনোলজি উন্নত হবার পর আমরা সি সি টিভি বসিয়েছিলাম। তাই ভিডিও দেখার ব্যবস্থা আছে একটা। তবে সেটা জঙ্গলের এক কিলোমিটারের কাছাকাছি অঞ্চলে লাগানো আছে।

"সেখানে কী দেখতে পেয়েছেন? যাদের আসার কথা এখানে সেই জানোয়ার বা শয়তানগুলোকেই কি দেখেছেন?"

গুরুদেব মাথা নাড়লেন। বললেন, "হ্যাঁ তারাই। তবে বর্ধিত আকারে এবং এই অভিমুখে ওরা আসছে না। ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।"

"এখন কি তাদের আর কোনোভাবে ট্র্যাক করা যাচ্ছে?"

গুরুদেব হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

রামানুজ বলল, "বর্ধিত আকারের কোনো কারণ?"

এবার হেমন্তাই বললেন, "সাধারণভাবে আকার বৃদ্ধি ঘটার কোনো কারণ নেই। যদি না কেউ এরকম কোনো কিছু তৈরি করে থাকে সেখানে, যা ওদের বর্ধিত আকারের জন্য দায়ী।"

রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "আর কোনো আশঙ্কা?"

হেমন্তাই গুরুদেবের দিকে তাকালেন। গুরুদেবের মুখ চোখ কালো হয়ে এসেছে। রামানুজ আবার জিজ্ঞেস করল, "আর কী সম্ভাবনা থাকতে পারে?"

এবার গুরুদেব বাধ্য হয়ে মুখ খুললেন, "যদি বারোজনের কেউ বা সকলে মিলে জীবানু বিধ্বংসী কোনো ওষুধ তৈরি করে ফেলে এবং তার ব্যবহারের ফলে ওদের চেতনা ফিরে আসে তবে তা বিধ্বংস ডেকে আনতে পারে। যদি ওদের চেতনা আর জান্তব শক্তি দুইই একইসঙ্গে কার্যকরী থাকে তাহলে ওরা প্রায় অজেয় হয়ে যাবে। আর এটা এই কারণে বলছি কারণ দেবতার শরীর থেকে যে নির্যাস বের হয় তা দিয়ে সঠিক গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা যায় না এরকম অসামান্য বস্তু কমই আছে। আমাদের কল্পনাতেও যা সম্ভব নয় সেরকম বস্তু তৈরি করা যায় এই তরল জেলি পদার্থের মাধ্যমে। এমনকি কেউ চাইলে অমর হবার মহৌষধি তৈরি করতে পারে এগুলো দিয়ে।"

রামানুজ বিস্মথয়ে গেল এসব শুনে। জিজ্ঞেস করল, "এসব কি ওই বারোজন জানে?"

গুরুদেব রেগে গেলেন, "কী বলছেন আপনি? ওরা আমার আবাসনের সেরা বারোজন। সঠিক গবেযোণাসহ সমস্ত বিদ্যা ওদের করায়ত্ত। ওদের আগে কত শত পরীক্ষা হয়েছে, তাদের বেশ কিছু সফল। বৃষ্টি আহ্বায়ক পদার্থের কাজ তো আপনি নিজেই দেখলেন। ওরা সব পারে। এখন ওরা যদি ভালোর পরিবর্তে মন্দের বশে চলে যায়..."

গুরুদেব কথাটা শেষ করলেন না। শুধু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন।

হেমন্তাই বললেন, "যদি ওরা সামনে দিয়ে না বেরিয়ে বাংলাদেশের দিকে বের হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে তবে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে। ওদের শরীরে যা বিষ আছে তা অকল্পনীয়। এক বছরে একটা মানুষ সম্পূর্ণ বোধবুদ্ধিহীন শয়তানে পরিণত হয় ওদের আচড়, কামর বা সংস্পর্শ সমস্ত কিছু ক্ষতিকর।

রামানুজ ওদের ভরসা দিয়ে বলল, "এরকম কিছুই হবে না। আমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দিন। প্রয়োজনে আপনাদের মধ্যে যারা অস্ত্রবিদ্যায় পটু তাদেরও আমাদের সঙ্গে দিন।"

"কিন্তু..."

গুরুদেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাকে হেমন্তাই হাত তুলে বাধা দিলেন, "এখন একজোট হয়ে কাজ করাতেই আমাদের মঙ্গল। সরকারি সিপাহী আর আমাদের সিপাহীরা একত্রে হানা দিক। ওদের খুঁজে খুঁযে হত্যা করাটাই এখন আসল কাজ।

আসেপাশে কিছু গ্রামবাসীও কথাবার্তা শুনছিল। সরকারি অফিসারেরা সকলে জঙ্গলে ঢুকবে জানতে পেরে একটা গুঞ্জন উঠল। রামানুজ সকলের উদ্দেশে বলল—

"এই জঙ্গলের ভাগ্য আমার হাতের উপর। আমি যদি দেখি সত্যিই এই জঙ্গল সরকারের হাতে গেলে গ্রামের তো বটেই সমস্ত মানব সভ্যতার উপর বিপদের ছায়া নেমে আসবে, আমি নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত নেবো না। আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। এই মুহূর্তে ওই শয়তানদের হত্যা করাটাই আসল কাজ। নইলে এতদিনের সমস্তকিছু নষ্ট হয়ে যাবে।"

কথাটা বলেই সে গুরুদেব আর হেমন্তাইয়ের দিকে হাত বাড়াল। গ্রামবাসীদের দিকে একবার তাকয়ে হেমন্তাই সেই হাত ধরল। গুরুদেবও সেই হাত ধরতে দেরি করল না। রামানুন চিৎকার করে উঠল, "জয় গন্দবেরুন্দা নৃসিংহদেব।"

এই চিৎকারে কাজ হল। গ্রামের সকলের মুখে তৃপ্তি হাসি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই গর্জে উঠল তারা, "জয় গন্দবেরুন্দা নৃসিংহদেব। জয় গন্দবেরুন্দা

নৃসিংহদেব।”

রামানুজ ছুটল সড়কের কাছে। দাসবাবুরা কেউ গ্রামে প্রবেশ করেননি। ওখানে গিয়ে সে সিনহাকে বলল, “ফোর্সকে বলুন চলে আসতে। আমরা এখন জঙ্গলে ঢুকছি।”

বাকি ওখানে যা যা কথা হল তা সংক্ষেপে সবাইকে বুঝিয়ে দিল সে। সকলেই গ্রামে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। তখনই কাঞ্চন বলল, “আমি যাবো না জঙ্গলে। আমি বরং বাংলোতে থাকি। আমার ইচ্ছে নেই আর এসবে সরাসরি ঢোকার।”

রামানুজ এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল। কাঞ্চন ফিরে বাংলোর পথে এগোলো। বাকরা গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাহিনি আসতে কুড়ি মিনিট সময় লাগল মাত্র। ততক্ষণে সকলেই তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক হল হেমন্তাই গ্রামেই থাকবেন। গুরুদেবসহ সকল উপজাতি সিপাহিরা জঙ্গলে ঢুকবেন রামানুজদের সঙ্গে।

হেমন্তাই জঙ্গলে ঢোকার আগে রামানুজের কাছে এল।

“ভাবিনি কখনো একযোগে কাজ করব এভাবে। দেবতা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। আপনার কাছে শুধু একটাই আর্জি, সেদিন বাবা হিসেবে যা যা বলেছিলাম সমস্তটাই ছিল আমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি থাকি বা না থাকি, আপনি কিন্তু আমার কাঞ্চনের একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেবেন। সে এই গ্রামে থাকার ছেলে নয়। আপনি কথাটা দিন।”

রামানুজ এই মুহূর্তে আর অন্য কিছু ভাবার অবস্থায় ছিল না। এতদিনের চেষ্টায় জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ সে পেয়েছে। এখন ভিতরে ঢুকে কী পরিস্থিতি আছে জঙ্গলের, কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে এসবই তার মাথায় ঘুরছে। তবুও সে হেমন্তাইয়ের কথাটা মন দিয়ে শুনল। তাঁর হাতে নিজের হাত রেখে বলল, “কাঞ্চনের একটা ব্যবস্থা না দেখে আমি শহর ছাড়ব না। আপাতত জঙ্গল থেকে বেঁচে ফিরি, তারপর সব হবে।”

হেমন্তাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন। রামানুজ সিনহার দিকে এগিয়ে গেল। সিনহাসহ সকলে তখন মাথায় হেলমেট পরছেন। প্রত্যেকটা হেলমেটে লাগানো আছে একটা টর্চ। রামানুজও সেরকম একটা হেলমেট পরে নিলো। সিনহা কমান্ড দিল, "আমাদের কাছে খবর আছে জঙ্গলে কিছু মানুষ সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত। যদি এরকম কোনো মানুষ আমাদের সামনে আসে তাহলে তাকে শুট করার আগে তার পরিস্থিতি একবার বোঝার চেষ্টা করবে। যদি দেখা যায় সে আত্মসমর্পণ করছে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ করবে এবং হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। আর যদি সে আক্রমণ করতে আসে তাহলে ঠিক মাথার মাঝখানে বা কপালে গুলি করবে। আমরা জানতে পেরেছি একমাত্র সেখানে গুলি করলেই ওদের মৃত্যু সুনিশ্চিত হবে। আর একটা কথা, ওদের দাঁতের কামর বা নখের আঁচড় শরীরে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ত্যাগ করবে এবং হাসপাতালে মুভ করবে। জঙ্গলে আমরা কোনো সময় আলাদা হয়ে যেতে পারি। কিন্তু অর্ডারের কোনো অন্যথা হবে না। ক্লিয়ার?"

সমবেতভাবে বাহিনী জানালো,

"ক্লিয়ার স্যার।"

"গ্রেট। ফোর্স এগিয়ে চলো। জয় মা ভবানী।"

আবার সমবেত গর্জন, "জয় মা ভবানী।"

সকলে জঙ্গলের পথে পা বাড়ালেন। হেমন্তাই সেই দৃশ্য দেখছিওএন। যতক্ষণ তাদের দেখা গেল তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর ওরা জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশে বললেন,

"প্রায় সকাল হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আপনারা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকুন। ওরা যদি কোনো কারণে গ্রামে চলে আসে তাহলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে। ঘর থেকে না বেরোনোই মঙ্গল।"

গ্রামবাসীরা আর দেরি করল না। প্রত্যেকে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে গেল। হেমন্তাইও ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। দু-জন

শিষ্য তার সঙ্গে রইলো। হেমন্তাই ঘরে ঢুকলে ওরা বাইরে পাহারা দিতে লাগল।

ওদিকে জঙ্গলে তোলপাড় চলছে। পুরো বাহিনী সমস্ত জঙ্গল তছনছ করতে করতে এগোচ্ছে। অমাবস্যার রাতের নীরব নিস্তব্ধ জঙ্গলের শান্তি হঠাৎই ভঙ্গ হয়েছে। যারদিকে টর্চের আলোকের বলয় ছোটাছুটি করছে। ছোটো খাটো লতা গুল্ম সমস্তকিছু বেয়নেটের ধারালো ফলার আঘাতে কচুকাটা হচ্ছে। জঙ্গলের প্রথম দিকের অধিকাংশ অঞ্চল পুড়ে আছে। গতকাল জঙ্গল জুড়ে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার দাগ বহন করছে জঙ্গল। সকলেই প্রায় ছুটছে সামনের দিকে। সকলের গন্তব্য জঙ্গলের সেই অংশের দিকে যেখানে মন্দির এবং পরীক্ষাগার আছে।

গুরুদেবের বয়স মন্দ নয়। যাঠোর্ধ তো হবেনই। তবু তিনি যে গতিতে ছুটছে হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে সেই গতিতে দাসবাবু আর সিনহা ছুটতে পারছেন না। জঙ্গলের একটা অংশে গিয়ে সকলের মনে হল এভাবে একমুখীভাবে ছুটলে জঙ্গলের বহু অংশ খোঁজা যাবে না বা খুঁজতে সময় লাগবে। এটা বোখা মাত্র রামানুজ সিনহাকে জানালেন। সিনহা তৎক্ষনাৎ সকলকে বললেন,

"তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাও সবাই। প্রতিভাগে গ্রামের লোক থাকুন যাত্র আমাদের মন্দিরে পৌঁছাতে অসুবিধে না হয়। নিজেদের মধ্যে এক বা দেড় কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে একটা অর্ধ গোলক তৈরি করুন। তাতে অন্তত আমরা এখন যতটা জঙ্গল কভার করছি তার চারগুণ বেশি কভার করতে পারব।

সঙ্গে সঙ্গে ডান দিক ও বাঁ-দিক বরাবর ফোর্স আলাদা হয়ে গেল। মাঝের বাহিনিতে গুরুদেব আর রামানুজ রইল। সিনহা গেলেন ডানদিকে, দাসবাবু গেলেন বাঁ-দিকে। সঙ্গে গ্রামের আবাসনের সিপাহিরা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিটিতে গেল।

সমস্ত জঙ্গল খুঁজে কিছুই পাওয়া গেল না। ভোরের আলো ফুটতে সময় লাগল, কিন্তু একসময় সেই আলো প্রকাশিত হল। এই দিনের বেলাতেও কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক। প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তাছাড়া ঘন জঙ্গলের ভিতরে আলো প্রায় পৌঁছায় না। ফলে খোঁজ করা আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। জঙ্গলের প্রথম এক কিলোমিটার পেরিয়েছে অনেকক্ষণ হল।

দ্রুতগতিতে জঙ্গলের একেবারে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল ওরা। ওদিকে বেলা বেড়ে চলেছে। কিন্তু গ্রাম আজ অদ্ভুত শুনশান। কেউ ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না। তাপমাত্রা আজ মাত্র ৫ ডিগ্রী। রাতে চাঁদ ছিল না, আজ সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশার ঘন চাদরে শুধু গ্রাম নয়, পুরো আগরতলা ঢাকা। পাহাড়ি অঞ্চলে এই কুয়াশা বরং অধিক ঘন।

হেমন্তাই সেই যে ভোরে এসে ঘরের মধ্যে বসেছেন এখনও উঠেননি। ধ্যান করছেন তিনি। দেবতার ধ্যান। গন্দবেরুন্দার ধ্যান। প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে। তিনি ধ্যান থেকে উঠেননি। এক মনে তিনি গ্রামের মঙ্গলের জন্য নিজের আসনে উপবিষ্ট হয়ে সাধনা করে চলেছেন। ঘর অল্প আলোকিত। এই ঠান্ডার মধ্যেও তার গায়ে শুধুমাত্র এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র।

ঠিক তখনই তিনি ডাকটা শুনতে পেলেন।

"হেমন্তাই, হেমন্তাই।"

হেমন্তাই প্রথমে বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন তার শিষ্যদের কেউ প্রয়োজনে ডাকছে। কিন্তু ওরা তো তার ধ্যানের সময় বিরক্ত করে না! কোনো জরুরী দরকার নিশ্চয়ই। তিনি গলা ছেড়ে হাঁক পারলেন,

"কী দরকার?"

উত্তর এল না। বরং আবার ডাকটা ভেসে এল।

"হেমন্তাই হেমন্তাই।"

এবার হেমন্তাই একটু বিস্মিত হলেন। গন্দবেরুন্দাকে প্রণাম করে উঠে পড়লেন ধ্যান থেকে। গ্রামের জরুরীকালীন অবস্থা চলছে। ব্যাপারটা গিয়ে

না দেখলেই নয়। দরজা খুলে দিলেন তিনি।

বাইরে ঘন কুয়াশা। কাউকেই দেখা গেল না। ঘরের বাইরে ছাউনি দেওয়া দাওয়া রয়েছে। দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, "কে? কই তোরা?"

ঘন কুয়াশায় এক হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না। শিষ্যদের দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তিনি আবার ডাকলেন,

"কোথায় তোরা? কুয়াশায় দেখতে পাচ্ছি না।"

এবার ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঘন পরদা ভেদ করে উপস্থিত হল এক সৌম্য মূর্তি। মুণ্ডিত মস্তক সেই ব্যক্তিকে দেখে হেমন্তাই প্রথমে চিনতে পারলেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তি কুয়াশা ভেদ করে যত কাছে এলেন হেমন্তাইয়ের শিরদাঁড়া বেয়ে বরফগলা জল বইতে লাগল। সাদা আলখাল্লা পরা পেশীবহুল গড়নের অধিকারী ব্যক্তি যখন হাত দু'টো পিছনে মুড়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন ততক্ষণে হেমন্তাই নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে তার সামনে স্বয়ং যম এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে ছিটকে বেরোলো, "কৈটভ।"

হেমন্তাই চিনতে পেরেছেন কৈটভকে। ওর অভিষেক তো তিনিই করেছিলেন, আজ থেকে বারো বছর আগে। তারও আগে তিনি আবাসনে প্রথম দেখেছিলেন কৈটভকে। অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিল সেই কিশোর। মুখে বিরাজ করতো অদ্ভুত কান্তি। এরকম কোনো বিদ্যা বাকি ছিল না যা সে চর্চা করেনি। অস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা সমস্ততেই সে ছিল সেরার সেরা। শক্তি হোক বা বুদ্ধি, সবেতেই সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ওই বছরগুলোতে। এখন তাঁকে বারো বছরের জঙ্গলবাসের পর একেবারে সুস্থ অবস্থায় নিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমন্তাই অনেক কিছু বুঝে গেলেন। তিনি জানেন একজন মানুষ কখন ওই পরীক্ষাগার থেকে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারেন।

কৈটভ তার শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলল, "প্রণাম নেবেন হেমন্তাই।"

হেমন্তাইয়ের গলা শুকিয়ে এসেছে। মানবসভ্যতার উপর আগত আসন্ন

বিপদের কথা ভেবেই তার বুকটা মুচড়ে উঠছে। তবুও নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললেন, "ভালো থেকো।"

কৈটভ বলল, "ভালো আছি হেমন্তাই। আপনাকে একটা খবর জানাতে এলাম।"

হেমন্তাই বললেন, "জীবনু বিধ্বংসী মহৌষধি তৈরি হয়ে গেছে, তাই না।"

কৈটভ হাসল। শান্ত অমায়িক হাসি। হেসে বলল, "সবই আপনাদের আশীর্বাদ। আপনারা আমার শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে এই বিরল সৃষ্টি সম্ভব হতো না।"

হেমন্তাই শুকনো হাসলেন। বললেন, "সৃষ্টি তাও শুধু মহৌষধি হয়নি, সঙ্গে অন্য কিছুরও সৃষ্টি হয়েছে। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। শয়তানের মৃত্যুর জন্য এই মহৌষধি তৈরির চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিন্তু মহৌষধ তো নিজেই শয়তানের সৃষ্টি করে ফেলল।"

কড়া ভর্তসনা শুনেও কৈটভের কোনো হেল দোল হল না। সে তার অমায়িক হাসি বজায় রেখে বলল, "আমরা অনেক তো মানব সভ্যতায় জন্য বলিদান দিলাম। এবার মানব সভ্যতা আমাদের কিছু ফিরিয়ে দিক।"

"ধিক্কার জানাই তোমার এই ভাবনাকে।"

মাটিতে বার কয়েক থুতু ছিটিয়ে দিলেন হেমন্তাই।

"আসুন হেমন্তাই, আপনাকে একটা দৃশ্য দেখাই।

হেমন্তাই এগিয়ে গেলেন কৈটভের দেখানো পথে। কুয়াশা ভেদ করে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল এক অকল্পনীয় ভয়ংকর দৃশ্য। এগারোজন উপজাতি যুবক দাঁড়িয়ে। তাদের কেউই পুরোপুরি শয়তানে পরিণত হয়ে যায়নি। প্রত্যেকের এক চোখে মণি বর্তমান অন্য চোখ সম্পূর্ণ সাদা। শরীরের হাড় ভাঙা। মুখে বিকট অভিব্যক্তি ও গোঙানি। হেমন্তাই চোখে ভয় নিয়ে তাকালেন কৈটভের দিকে। কৈটভ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

"আবার তাকান সামনের দিকে।"

কৈটভের নির্দেশে হেমন্তাই আবার তাকালেন। এবার এগারোজনের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও দু-জন। তাঁর দুই শিষ্য বর্তমানে পরিণত হয়েছে শয়তানে। তবে সম্পূর্ণ শয়তান নয়, আধা। চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। হেমন্তাই বিস্ময়ে ফিরে তাকালেন কৈটভের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "এত কম সময়ে?"

এবার বিকট শব্দ করে হেসে উঠল কৈটভ। বলল, "সবই মৃত-কৈটভের মহিমা হেমন্তাই।"

"মৃত কৈটভ?"

কৈটভ তার বস্ত্রের ভিতর থেকে বের করে আনলো ছোট কাচের কৌটোটা। হেমন্তাইয়ের চোখের সামনে এখন জ্বল জ্বল করছে সবুজাভ হলুদ পদার্থটা। পদার্থের ভিতরে মাঝে মাঝেই ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ। এক অদ্ভুত সুন্দর বর্ণছটায় আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

"এই মহৌষধির নাম মৃত 'কৈটভ'?"

হেমন্তাই হাত বাড়াল। কৈটভ তৎক্ষনাৎ কৌটোটা দূরে সরিয়ে নিল।

"উঁহু, এ বস্তুতে সাধারণ মানুষের হাত দেবার অধিকার নেই। দুঃখিত।

হেমন্তাই বাড়ানো হাত ফিরিয়ে আনলেন। এত এত বছরে কাঙখিত বস্তুটিকে হঠাৎ এত কাছে দেখতে পেয়ে তিনি নিজের উত্তেজনার বশেই হাতটা বাড়িয়েছিলেন। বেশ বিব্রত বোধ করলেন এখন।

কৈটভ বলল, "এই বস্তুতে শুধু আমাদের অধিকার থাকবে। আমাদের মতো আধা মানুষ আধা শয়তানদের।"

"হুম। এবার তোমার লক্ষ্য কী?"

হেমন্তাই বুঝে নিতে চাইছেন কৈটভের অভিপ্রায়। কৈটভ বলে চলল, "সোজা লক্ষ্য, পৃথিবীতে আমাদের রাজত্ব। ধীরে ধীরে আমরা ছড়িয়ে পড়তে চাই সম্পূর্ণ পৃথিবীতে। প্রথমে ত্রিপুরা, তারপর উত্তর পূর্ব ভারতের বাকি ছয় রাজ্য, তারপর পশ্চিমবঙ্গ এবং এভাবেই সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ। এভাবেই একদিন পৃথিবীর দখল। মানুষকে চেতনাহীন শয়তানে পরিণত

করাই লক্ষ্য।"

হেমন্তাই শব্দ করে হাসলেন এবার। কৈটভের কপালে ভাঁজ সৃষ্টি হল।

"বহু মানুষ ইতিমধ্যে তাতেই পরিণত হয়ে আছে। নতুন কিছু বলছো না তুমি। হ্যাঁ, তবে এইটুকু বলতে পারি তুমি যে একক রাজত্বের স্বপ্ন দেখছো তা কখনো পূর্ণ হবে না। এ অসম্ভব। একটা গ্রামকে তুমি নিজের কব্জায় নিতেই পারো। কিন্তু এসব পৃথিবী বিজয়ের কথা কাউকে বলো না। লোকে হাসবে।

কৈটভ এবার বেশ রূঢ়ভাবে বলল,

"আপনারা মানুষেরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নেশায় বুদ থাকেন। তাই এরকম সাম্রাজ্য শুধু কল্পনাতেই সম্ভব হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তা হবে না। তাকিয়ে দেখুন বাইরে, এই এগারোজন আমার অধীনে আছে। ওদের প্রত্যেকের কাছে আছে মৃত কৈটভ। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ওরা নিজেদের পরিমান অনুসারে মৃত কৈটভ শরীরে প্রবেশ করাবে। তাতে ওরা আজীবন এভাবেই থাকবে। আর এই যে নতুন দু-জন যুক্ত হল, তারা আমার অধীনে নেই। ওদের মধ্যে যারা ওদের রক্ত খেয়েছিল ওরা তাদের অধীনেই থাকবে। ওর রাজা সেই যে তার শরীরে বিষ পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে আবার আপনার শিষ্যরা যখন নতুন শিকার ধরবে, ওদের রাজা বা গুরু যাই বলুন হবে সেই শিষ্য। চেইন সিস্টেম হেমন্তাই চেইন সিস্টেম। বহির্বিশ্বের কর্পোরেটের এই সিস্টেমটাতে কখনো চির ধরবে না। জানেনই তো, কত শত বছর ধরে কীভাবে লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির এই মডেলটা কোটি কোটি মানুষকে উপার্জনের পথ দেখিয়ে চলেছে। যদি গোদা বাংলায় বলি তাহলে আমার মডেলটাও এরকম।

হেমন্তাই বুঝিতে পারল মানুষের বুদ্ধি আর শয়তানের শক্তি একত্রে মিলিত হয়েছে কৈটভের মধ্যে। কৈটভের সেনানি যে এভাবে বেড়েই চলবে তাতে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। তবুও একটা কথা হেমন্তাই না বলে

পারলেন না, "ফর্মুলাটা নিশ্চয়ই আর কেউ জানে না। সেটা তুমিও নিজের কুক্ষিগত করেই রাখবে, যেভাবে মানুষ করে রাখে। তফাত কিছুই নেই।"

কৈটভ বুঝল হেমন্তাইয়ের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে সরাসরি বলল, "আমাদের সাম্রাজ্যের পথে একমাত্র বাঁধা আপনি। তাই আপনার মৃত্যু আমার এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

হেমন্তাই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। উত্তর দিলেন না। বরং শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে উঠলেন,

"জয় গন্দবেরু...

শেষ করতে পারলেন না উচ্চারণ। তার আগেই কৈটভের হাতের পিছনে লুকানো তরোয়াল গর্জে উঠল। ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল হেমন্তাইয়ের মস্তক। ধর কাঁপতে লাগল। চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। ধর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে পড়ে গেল, কাটা গলা দিয়ে রক্ত স্রোত বইতে লাগল। অল্প সময়ের অপেক্ষা। তারপর আর মাটিতে রক্তের ফোঁটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তেরোজন শয়তান তাদের উদরপূর্তি করে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল।

* * * * * * * * * *

ওদিকে রামানুজরা এখনও জঙ্গলে। ওরা জানে না গ্রামে ঠিক কী ঘটেছে। জঙ্গল দিয়ে হাঁটছে ওরা কয়েক ঘণ্টা হয়েছে। এখনও গন্তব্যে পৌঁছায়নি ওরা। গুরুদেবসহ প্রায় সকলেই ক্লান্ত। রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "আর কতক্ষণ?"

প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আঙুল নির্দেশ করল। রামানুজ সেই বরাবর তাকিয়ে দেখতে পেল একটা মন্দিরের চূড়া। খুব বড় নয়। মাঝারি আকারের। তবুও জঙ্গলের যে অংশে এখন ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মন্দিরের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। লাল পাথরে তৈরি মন্দিরটি দেখামাত্র যেন সকলের ক্লান্তি কেটে গেল। সকলে নতুন উদ্যমে ছুটতে লাগলেন সেদিকে। মন্দির জঙ্গলের ভিতরে দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু পাহাড়ি

এলাকায় যা দূর থেকে দেখা যায় তাতে পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগে। আরও প্রায় মিনিট চল্লিশ হাঁটার পর ওরা সেখানে পৌঁছাল।

রামানুজ প্রথমেই সাবধান করে দিল, "সকলে টার্গেট রেঞ্জ ধরে ধরে এগোবে। আমরা এখনও জানি না এখানে কেউ আছে কি নেই। সম্পূর্ণ কনফার্মেশন এলে তবেই আমরা অস্ত্র নামাবো। প্রথমে সম্পূর্ণ জায়গাটা ভালো করে সার্চ করো।"

বাহিনীর অফিসারেরা তো বটেই গ্রামের উপজাতি সৈনিকরাও খুব সাবধানে এগোলো। রাইফেল, তি ধনুক, তরোয়াল, বর্ষা যার হাতে যেই অস্ত্র ছিল সেই অস্ত্র নিয়ে এগোতে থাকে ওরা। এরই মাঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলও পৌঁছে গেল। কৌণিক দূরত্বের হিসেবে আর এসেছে সকলে। তাই সকলেই প্রায় সমান সময়ে পৌঁছেছে একই জায়গায়। তিনদিক দিয়ে ঘেরাও করে এগোতে থাকে সবাই।

দিনের বেলা হলেও এদিকে আলো কম। তবুও এখন একেবারে অন্ধকার নয় জায়গাটা। দেখা যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সকলে। প্রথমেই কারাগারে অংশ দেখতে পেল সকলে। প্রত্যেকটা কারাগারের দরজা খোলা রয়েছে। খোলা তালাগুলো পড়ে আছে সামনে।

গুরুদেব সাবধানবাণী দিলেন, "কেউ কোনো বস্তু ছুঁয়ে দেখবে না।"

ইশারায় সকলকে নির্দেশ পৌঁছে দিল রামানুজ। তৎক্ষনাৎ বাহিনী কমান্ডাররা সকলের দিকে গ্লাভস ছুড়ে দিল। ওদের ব্যাগে বিভিন্ন আপতকালিন সামগ্রী রাখা থাকে। সকলেই সেই প্লাস্টিক গ্লাভস পরে নিলেন। কারাগারের ভিতরে কেউ নেই। পর পর কয়েকটা ঘর আছে। সেখানে খুব সতর্কভাবে একদল ঢুকল। কেউ বা ঢুকল পরীক্ষাগারে। রামানুজ, সিনহা, গুরুদেবসহ কয়েকজন ঢুকলেন মন্দিরে।

লাল পাথরের মন্দিরের ছা অনেক উঁচুতে। আর তার প্রায় সবটাই গন্দবেরুন্দাদেবের বিশালাকৃতির জন্য। এই প্রথম রামানুজ দেবতা দর্শন করছে। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা তার কাছে। এই বিশালাকৃতি দেব

খোলসের সামনে অতিশয় ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে ওদের সবাইকে। রামানুজ মুগ্ধ হয়ে দেবতার দিকে তাকিয়ে আছে। বিষ্ণুর এক রূপের অংশকে এভাবে সরাসরি সে দেখবে কখনো কল্পনাই করতে পারেনি। যে কোনো নাস্তিককে যদি সামনে আনা হয় এই রূপ দেখে সে মোহিত হয়ে আস্তিকে পরিণত হবে। অবশ্য নাস্তিকের চেয়ে বড় আস্তিক কে-ই বা হতে পারে। ঈগলাকৃতির দুটো মস্তক দেখে ভয় জাগে বটে, তবে দেবতা যেভাবে বসে আছেন মন্দিরে তাতে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে। আর তাছাড়া তার শরীর নিঃসৃত পদার্থের ঔজ্জ্বল্য এতটাই যে চোখে প্রায় ধাঁধা লাগার জোগাড়। দাসবাবু একটু দেরি ঢুকেছিলেন মন্দিরে। কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেবদর্শনের পর বললেন, "কী অসাধারণ মূর্তি! মূর্তি কেন বলছি, এ তো স্বয়ং দেবতার খোলস। হাত জোর করে প্রণাম করলেন তিনি।"

গুরুদেব ঢোকার পর থেকেই বুকের কাছে হাত নিয়ে প্রণাম করে আছেন। সবার উদ্দেশে বললেন, "দেবতার গৃহে বেশি সময় থাকা উচিত হবে না। দেবতার তেজ আমরা সহ্য করতে পারব না। চলুন বেরিয়ে যাই। আর তাছাড়া..."

গুরুদেব আর কিছু বললেন না। মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন। রামানুজ আরেকবার গন্দবেরুন্দা নৃসিংহ দেবতাকে দেখে বেরিয়ে এল বাইরে।

সিপাহীরা বিভিন্ন ঘর থেকে বেরিয়ে জানাল, "এখানে কেউ নেই। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি চারদিকে। সমস্ত এলাকা খালি।"

সকলে দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের ভিতরে এক আদিম বসতিতে। কোনোদিন একদিনের জন্যেও এই বসতির মানুষেরা একেবারে পরিত্যাগ করেনি এই বসতি। এই বসতিতে সকলের অলক্ষ্যে ঘটত এক প্রায় অপরিচিত দেবতার পুজো, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতো অবিরত, আসেপাশের জমি জানান দিচ্ছে এখানে চাষবাসও হতো, কারাগার চিৎকার করে বলছে বন্দিদের কথা। আর আজকে যখন বহির্বিশ্বের কিছু লোক শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেল এই বসতির, তখন এই বসতির মূল বসবাসকারীরা এই স্থান

পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে।

গুরুদেব ম্লান মুখে বললেন, "জানি না ওরা এখন কোথায়? তবে কোনো সংকেতই শুভ নয়। গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ একা রয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম ওরা জঙ্গলেই রয়েছে। কিন্তু এখন আমার মন বলছে ওরা লোকালয়ের দিকে চলে গেছে। ওখানে আমরা পর্যাপ্ত পাহারার ব্যবস্থা রাখিনি।"

সিনহা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মনে হয় আপনার, কেন ওরা ক্রিয়ায় সাড়া দিল না। কেন-ই বা ওরা এই জায়গা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল?"

গুরুদেব বললেন, "একবার আমাকে পরীক্ষাগারে নিয়ে চলুন।"

রামানুজ, গুরুদেবসহ কয়েকজন পরীক্ষাগারে উপস্থিত হল। পরীক্ষাগারে নানান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, খাঁচায় মরা বানর, গিনিপিগ ইত্যাদি দেখতে দেখতে সকলে পৌঁছালো ফ্রিজারটার পাশে। সকলেই এরকম একটা বীভৎস পরীক্ষাগার দেখে মনে মনে ভয় পাচ্ছিল। কোথাও ফর্মালিনে ডোবানো রয়েছে সাপের বা ব্যাঙের দেহাবশেষ, কোথাও জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির উপর পরীক্ষা করে তা একত্রে এক কোনে জমা করা রয়েছে। এ যেন এক আদিম পরীক্ষাগার যেখানে ভালোভাবে খোঁজ করলে দেখা মিলবে অনেক হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর। পরীক্ষাগারের আলমারিতে রাশিরাশি কাগজপত্র। নিশ্চয়ই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফর্মুলা লেখা রয়েছে তাতে। কোনো অংশে এই পরীক্ষাগার কোনো গুপ্তধনের চেয়ে কম নয়। সঠিক ব্যক্তি যদি এর সন্ধান পায় সে এই পরীক্ষাগারের সমস্ত ফলাফল বিক্রি করে পৃথিবীর ধনী মানুষ হয়ে যেতে পারবে।

গুরুদেব ফ্রিজারটাকে ভাল্লভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। ফ্রিজারের ভিতরে এখনও বেশ কিছুছোট ছোট কাচের জার বা বয়ামে রয়েছে বিভিন্ন রঙের বাহারি তরল পদার্থ। গুরুদেব মাটিতে কিছু একটা দেখতে পেলেন। একটা সিরিঞ্জ। সেটা গ্লাভস-পরা অবস্থায় তুলে দেখলেন তিনি। সিরিঞ্জের ভিতরে

অল্প তরল বাকি আছে। ফ্রিজারে রাখা তরলগুলোর দিকে আবার তাকালেন তিনি।

রামানুজ জিগ্যেস করল, "কিছু বুঝতে পারছেন?"

গুরুদেব খুব মনোযোগ দিয়ে সিরিঞ্জের তরলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার অনুমান যদি খুব ভুল না হয় তবে বিগত কয়েকদিনের মধ্যে একটা নতুন ওষুধ তৈরি হয়েছে এই পরীক্ষাগারে। হয়তো সেই ওষুধের ক্রিয়াতেই এই সমস্ত কিছু ঘটছে।"

রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "কী ওষুধ হতে পারে এটা?"

গুরুদেব সিরিঞ্জটার দিকে তাকিয়ে আনমনেই বললেন, "এখানে যত ওষুধ তৈরি হয়েছে সব ক-টাই জীবানুর এন্টি ডোট বানাতে গিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। কোনোটাকেই প্রাধান্য দিয়ে বানানো হয়নি। বিভিন্ন ডিস্টিলেধান বা বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সেগুলো তৈরি হয়েছে। এবারেও হয়ত সেই এন্টি ডোট তৈরি করতে গিয়েই নতুন কিছু তৈরি হয়ে গেছে।"

গুরুদেবের হাত থেকে সিরিঞ্জটা রামানুজ নিল। তারপর সেটা দেখতে দেখতে সে বলল, "আর যদি সেই এন্টি ডোটটাই তৈরি হয়ে থাকে।"

গুরুদেব এই কথাটা শোনামাত্র চোখ বড় বড় করলেন। এই কথাটা তো তাঁর মাথাতেও আসেনি। আসলে এত বছরের পর বছর কেটে গেছে, সেই এন্টি ডোট তৈরি হয়নি। এবারে যে সেটাও তৈরি হতে পারে তা তাঁর কাছে একেবারে অকল্পনীয়। তাঁর মুখ থেকে বেরোলো, "মহৌষধি!"

তৎক্ষনাৎ বাইরে একটা প্রকাণ্ড শব্দ হল। সকলে চমকে উঠলেন।

সিনহা সিহাপীদের বললেন, "কীসের শব্দ গিয়ে দেখো।"

রামানুজের চোখ তখনও গুরুদেবের উপর নিবদ্ধ। গুরুদেব রামানুজের কথায় যতটা অবাক হয়েছিলেন এবার এই শব্দ শুনে ততটাই ভয় পেলেন। রামানুজ তাঁর হাত ধরে ফেলল, নইলে হয়ত তিনি পড়েই যেতেন। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গুরুদেব? এটা কীসের শব্দ?"

গুরুদেব ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "পরীক্ষাগারে গুরু অবস্থায়

চন্দন রাখা আছে। কয়েক বস্তা চন্দন থাকবে স্টোর রুমে। এক্ষুনি সেগুলো জলে মেশাতে হবে। সকলে হাত লাগাও।"

গুরুদেব রামানুজের হাত ঝটকায় ছাড়িয়ে নিজেই পরীক্ষাগারের স্টোর রুমের দিকে দৌড় দিলেন। রামানুজ বুঝতে পারল না। সে বাহিনীর কয়েকজনকে বলল, "তিনি যা করতে চাইছেন তাই করো।"

গুরুদেব স্টোর রুমের মুখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "গন্দবেরুন্দা জাগছেন। গন্দবেরুন্দা জাগছেন। বারো বছরে একবার জেগে ওঠেন তিনি। এক্ষুনি তাঁক শান্ত করতে হবে। নইলে কী হবে আমরা কেউ জানি না।"

উপস্থিত সকলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। কী বলছেন গুরুদেব! দেবতা জাগছেন?

সকলে পরীক্ষাগারের দরজার কাছে এসে জমায়েত হলেন। বাইরে সিপাহীরা যারা মন্দিরের দিকে গিয়েছিল তাদের দেখা যাচ্ছে। তারা সশস্ত্র বাহিনী। তবুও তারা কোনো অজ্ঞাত কারণে পিছিয়ে আসছে। কেউ বা দৌড়ে বেরিয়ে এসে ছিটকে পড়ছে বাইরে। শব্দটা বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন জোরে জোরে নিজের পা মাটিতে আছড়াচ্ছে।

"কী হয়েছে? তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন?", সিনহা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন।

"কী আছে ভিতরে?"

বাহিনীর অনেকে আঙুল উঁচিয়ে উপরের দিকে কিছু একটা দেখাল বটে। কিন্তু মুখ দিয়ে ওদের শব্দ বেরুল না। সিনহা তাঁর পাশে দাঁড়ানো একজন সৈনিকের অটোমেটিক অস্ত্রটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে বেরোলো। রামানুজ দৌড়ে পৌঁছাল দরজার কাছে। কিন্তু সিনহা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছেন।

দরজার মুখে দাঁড়ানো কয়েকজনকে রামানুজ বলল, "ভিতরে গুরুদেব আছেন। তিনি যা করতে চাইছেন সে কাজে তোমরা তাঁকে সাহায্য করো। যাও কুইক।"

রামানুজ জানে এখন শক্তি দিয়ে নয় বুদ্ধি দিয়েই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হবে। গুরুদেব যা বলেছেন সেই কথাটা রামানুজ বাইরের পরিস্থিতি দেখার আগেই বিশ্বাস করে ফেলেছেন।

ওদিকে বাইরে সিনহা এগিয়ে চলেছেন। উপজাতি সিপাহীসহ সরকারি স্পেশাল ফোর্স বাহিনী অব্দি এবার পিছিয়ে আসছে। শুধু সিনহা নিজের জেদে ভর করে এগিয়ে চলেছেন।

ওদিকে গুরুদেব অন্যান্যদের সহায়তায় বড় বড় মাটির পাতিলে চন্দনের গুড়ো মেশাচ্ছেন। পাতিলগুলো পরীক্ষাগারেই রাখা ছিল। বড় বড় কার্টন খুলে বস্তা বের করে তার থেকে সাদা চন্দন গুঁড়ো ঢালছেন পাতিলে। জলে গুলে সেগুলোকে গাঢ় করছেন।

দাসবাবু ঢুকেছিলেন। এই কাণ্ড কারখানা দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী হবে এই চন্দন দিয়ে?"

কোনো উত্তর আসেনি গুরুদেবের কাছ থেকে। তিনি এখন শুধুমাত্র নিজের কাজটা মন দিয়ে করে চলেছেন।

ওদিকে সিনহা প্রায় মন্দিরের দরজায় সামনে চলে এসেছেন। সেখানে এখন আর কেউ নেই, তিনি সম্পূর্ণ একা। বাকি সিপাহীরা সকলেই প্রায় পরীক্ষাগারের মুখে বা কারাগারের সামনে গিয়ে ভিড় করেছেন। মন্দিরে প্রবেশ করার দরজার সামনে গিয়ে সিনহা থমকে দাঁড়ালেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি যা আন্দাজ করে এখানে এসেছিলেন তার থেকে বিশাল ও ভয়াবহ বস্তু দেখে ফেলেছেন তিনি। তার হাতের অটোম্যাটিক অস্ত্র খসে মাটিতে পড়তে গেল।

সিনহা দেখলেন, একটু আগে যে গন্দবেরুন্দা নৃসিংহদেবের খোলস মূর্তিটিকে তিনি নির্জীব অবস্থায় বসে থাকতে দেখে গিয়েছিলেন, সেই মূর্তিটি এখন বসা অবস্থাতেই তাঁর পদযুগল মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে আবার সজোরে মাটিতে ফেলছেন। তার ফলে চারদিকে ধুলো ছড়িয়ে পড়ছে। শব্দ হচ্ছে মারাত্মক জোরে।

সিনহা দেখলেন, ধীরে ধীরে দেবতার ঈগলরূপী মাথা দু-টো নড়ে উঠছে। সিনহা জড়বত দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এক জীবনের সমস্ত নাস্তিকতা এই দৃশ্য দেখার পর দূর হয়ে গেছে তার। ধীরে ধীরে তার হাত বুকের কাছে উঠে এল। গন্দবেরুন্দা নৃসিংদেবের প্রতি হাত জোর করে তিনি সেখানেই জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবতা স্বস্থানে বসে ধীরে ধীরে সজীব হচ্ছেন। বিশালাকৃতি মস্তকদ্বয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ধীর ধীরে চোখের ঝাপসা অবস্থা কেটে গিয়ে প্রকৃত ঈগলের চোখের মতো স্ফটিক স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার দৃষ্টির জন্ম হচ্ছে সেখানে। দেবতার জন্ম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন সিনহা।

রামানুজ ছুটে পরীক্ষাগারের একদম ভিতরে ঢুকলেন যেখানে গুরুদেব বিশালাকার মাটির পাতিলে চন্দন মেশাচ্ছিলেন।

"আপনার কাজ কতটা? বাইরের অবস্থা ভালো নয়।"

গুরুদেব একটা বস্তার মুখ কাটতে কাটতে বললেন, "দেবতা সম্ভবত এখনও আসনেই বসে আছেন। তিনি বসা অবস্থাতেই এই চন্দন তাঁর দেহে ঢালতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে? তাঁর উচ্চতা তো অনেক।"

"উপায় আছে। আপনি ওদের সঙ্গে এগোন। মন্দিরের ঠিক পিছনে সিঁড়ি আছে। এই নিন চাবি। একটা একটা করে পাতিল নিয়ে উপরে উঠুন। ঠিক উপর থেকে দেবতার মাথা অর্থাৎ ঈগলের মাথা দু-টো দেখতে পাবেন। দেখার পর পাতিল উলটো করে চন্দন গোলা জল ফেলতে থাকুন।"

গুরুদেব নিজের কোচর থেকে একটা চাবি বের করে দিলেন এবং উপস্থিত বাকিদের নিয়ে এগোতে বললেন। রামানুজ সময় নষ্ট না করে উপস্থিত সকলকে বলল, "চলো। আর নষ্ট করার মতো সময় নেই।"

পরীক্ষাগারের দরজার সামনে পৌঁছে চিৎকার করে সকলকে সরে যেতে বলল সে। পাতিল নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় দাসবাবুকে বলল, "মন্দিরের

পিছনে একেকটা পাতিল নিয়ে আসুন। সাবধানে আনবেন। প্রয়োজনে বাইরের সিপাহীদের ডাকুন।"

রামানুজ দৌড়ে পৌঁছাল মন্দিরের পিছনে। সেখানে সত্যিই একটা সিঁড়িঘর রয়েছে। তাতে একটা বড় আকারের তালা ঝুলছে। সে চাবিটা দিয়ে সেই তালা খোলার চেষ্টা করল। চাবিটাও আকারে বড়। প্রতিদিন ব্যবহারও হয় না এই চাবি। তাই খুলতে সময় লাগল। ততক্ষণে প্রথম পাতিলটা পৌঁছে গেছে গোটা দশেক সিপাহী। রমানুজও ওদের সঙ্গে পাতিলের মাথায় ধরল। সে দেখল পাতিলের মাঝখানে রয়েছে ঘন চন্দনের গোলা। ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল ওরা। বাইরে দাসবাবুর তত্ত্বাবধানে আরও পাতিল আসতে লাগল। সকলেই ধীরে ধীরে উপর উঠতে লাগলেন। এত বড় মাটির পাতিল নিয়ে উপর উঠা খুবই শক্ত ব্যপার। সকলেরই অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আরাম করে নষ্ট করার মতো একদম সময় নেই। ওরা শত কষ্ট করে হলেও উপরে উঠতে লাগল।

মন্দিরের অভ্যান্তরে ততক্ষণে গন্দবেরুন্দা দেবতার দুই মাথাই সচল হয়েছে। লোহার গড়ন শরীরের ধীরে ধীরে ভাঁজের সৃষ্টি হচ্ছে। পেশীবহুল শরীরটায় সঙ্কোচন প্রসারণ লক্ষ করা যাচ্ছে। সিনহা সেখানে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সমস্ত সত্ত্বা কাঁপছে। দেবতা ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন তার দুই ঈগল মস্তক দিয়ে। ঠোঁট দিয়ে শব্দ করছেন দেবতা। সে এক সুতীব্র চিৎকার। দেবতার এক ঠোঁট দিয়ে বেরোচ্ছে আগুন, অন্ত ঠোঁট দিয়ে ঠান্ডা ধোঁয়া। তাঁর কোমরের অংশে জীবনের স্পর্শ পৌঁছালেই তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে তিনি আবার হাঁটবেন। দুষ্টের ধ্বংস করবেন তিনি, করবেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাঁর ভয়াবহ মোহময় রূপ দেখে সকলের যা অবস্থা হবে, তা ভাবলেও শরীর ঘেমে উঠছে।

আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা তারপরেই দেবতার সমস্ত সত্ত্বার জাগরণ ঘটবে। সিনহা দেখলেন দেবতার কোমরের পেশীগুলো এখন সম্পূর্ণ। তিনি

উঠে দাঁড়াবেন। তিনি প্রথম যে পদক্ষেপ নেবেন, সেই দূরত্বেই আছেন সিনহা। ওই পদক্ষেপেই তিনি মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাবেন। সিনহা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল, "জয় গন্দবেরুন্দা।

আর ঠিক তখনই মন্দিরের উপর থেকে প্রথম পাতিলটা উলটে দিল রামানুজ ও তার সাহায্যকারীরা। চন্দন গোলা জল সোজা গিয়ে পড়ল দেবতার ডানদিকের মস্তকে। নেমে এল দ্বিতীয় পাতিল। সেটা গিয়ে পড়ল দ্বিতীয় মস্তকে। এবার একে একে পড়তে লাগল প্রত্যেকটা পাতিল। দেবতার আকারের সামনে বিশালাকার মাটির পাতিলগুলোকে ক্ষুদ্র লাগছিল। একের পর একটা পাতিল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল আর গিয়ে পড়তে লাগল দেবতার উপর। এভাবে অনেকগুলো পাতিল দেবতার দেহে পড়ল। সিনহা চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন দেবতার দেহ বর্তমানে শুধু চন্দনময়। চন্দনের সুন্দর সুবাসে মন্দির প্রাঙ্গণ ম ম করছে। দেবতার দেহ নিঃসৃত অদ্ভুত পদার্থ অবধি ঢাকা পড়েছে চন্দনের প্রলেপে।

এবার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ধীরে ধীরে আবার দেবতার শরীর আড়ষ্ট হতে শুরু করল। গন্দবেরুন্দা দেবের দেহে যে সঙ্কোচন প্রসারণ লক্ষ করা গিয়েছিল তা ধীরে ধীরে স্থির হতে লাগল। ঈগল মস্তকের হুঙ্কার বন্ধ হল। বন্ধ হল পা আছড়ানো। ঈগল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুছে গিয়ে ফিরে এল খোলসের স্থিতধি ঝাপসা দৃষ্টি। এ যে কী দৃশ্য যারা দেখেনি তারা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে দেবতা আবার শান্ত হলেন। চারদিকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে এল। দেবতা আবার বারো বছর পর জেগে উঠবেন। বারো বছরের জন্য ঘুমে তলিয়ে গেলেন গন্দবেরুন্দা।

তারপর সিপাহীদের মধ্যে দেখা গেল এক বন্য উচ্ছ্বাস। উপজাতী সিপাহী, সরকারি বাহিনী সকলে মিলে হাতে হাত ধরে নাচতে আরম্ভ করল ওরা। এই অতিমানবিক পরিস্থিতি কাটিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দে মশগুল হল ওরা। সকলে একে অপরের হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকল। বাইরে

যারা অক্লান্তভাবে একটা চেইন সিস্টেম বানিয়ে মাটির পাতিলগুলো এগিয়ে দিচ্ছিলেন তারাও যোগ দিলেন এই নৃত্যে। দাসবাবু শার্টের হাত বোটে কাজ করাচ্ছিলেন। তিনি দৌড়ে এলেন সিনহা সাহেবের কাছে। সিনহা আনন্দে তাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। দাসবাবুরও চোখে জল— আনন্দাশ্রু।

মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামল রামানুজ। পথে সিপাহীদের সঙ্গে অল্প নাচতেও হল। তবু সে জানে এখন কার কাছে পৌঁছাতে হবে। সে দৌড়ে পরীক্ষাগারে গুরুদেবের সামনে হাজির হল। ততক্ষণে গুরুদেব বুঝে গেছেন যে দেবতা শান্ত হয়েছে। রামানুজকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"আমরা পেরেছি গুরুদেব। আমরা পেরেছি।"

গুরুদেব কিচ্ছু বললেন না। শুধু রামানুজকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে রামানুজের কাঁধে পড়তে লাগল।

* * * * * * * * * *
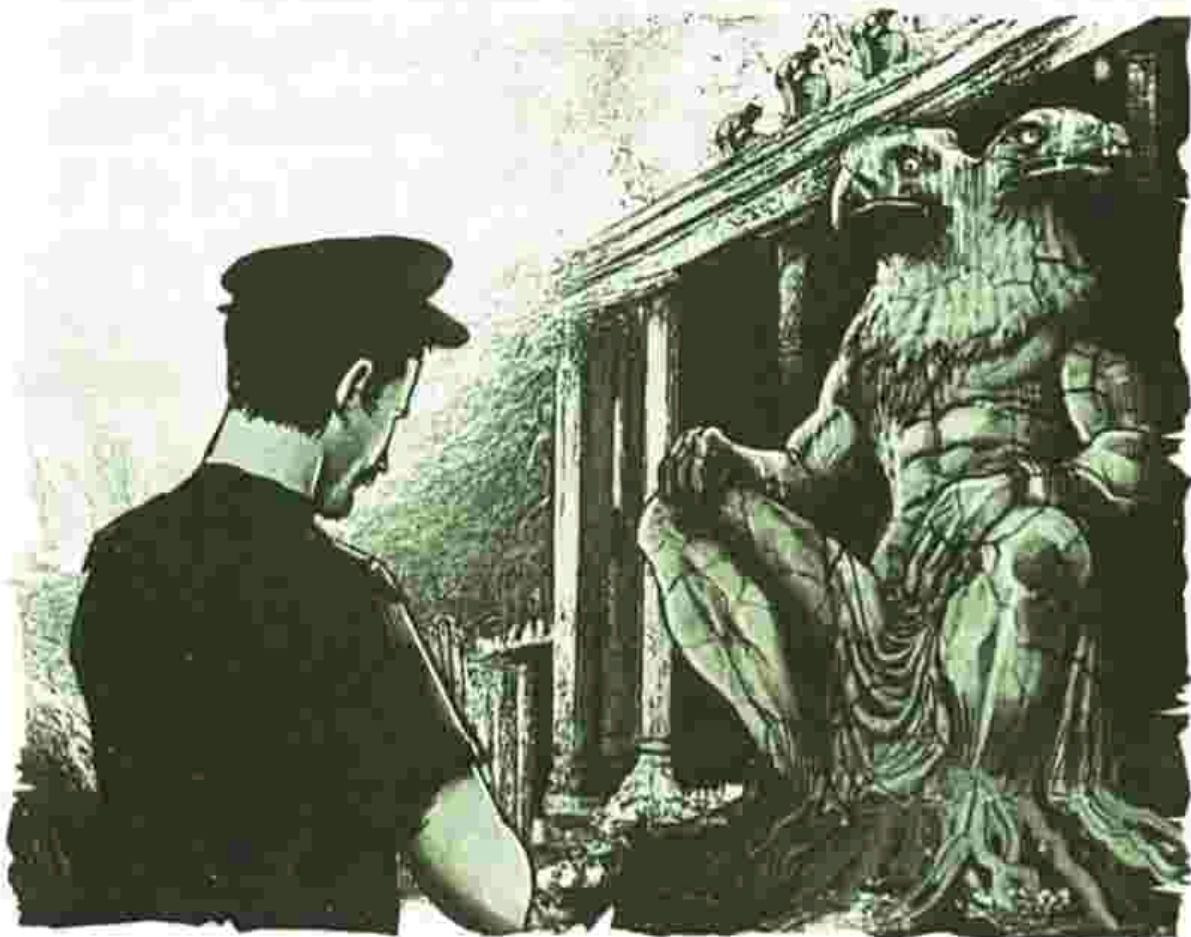
(১১)

রামানুজ পরীক্ষাগারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে যারা চোট পেয়েছে তাদের সুশ্রুষা চলছে। তাই অতিরক্ত আধ ঘণ্টা সময়ের বিশ্রাম ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু রামানুজের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওদিকে গ্রামে কী হচ্ছে তা জানার কোনো উপায় নেই। বারকয়েক মোবাইল ফোনে চেষ্টা করেছে সে। কাঞ্চনকে ফোনে ধরার চেষ্টা সে করেছিল। কিন্তু জঙ্গলের এই অঞ্চলে কোনো মোবাইলেরই নেটওয়ার্ক কাজ করছে না।

সিনহা এখন অনেকটাই শান্ত। আবার বাহিনীর সঙ্গে কথা বলার মতো মানসিক দৃঢ়তা ফিরে পেয়েছেন। ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলছেন। মাঝে একবার রামানুজের সঙ্গেও কথা বলে গেছেন। দাসবাবুও কিছু চোট পেয়েছেন মাটির পাতিল টানা নেওয়া করার সময়। পরীক্ষাগারে থাকা বিভিন্ন রকমের ম্যাডিকেল সাপোর্টগুলো গুরুদেবই পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো দিয়েই কারো পট্টি হচ্ছে, কাউকে পেইন কিলার দেওয়া হচ্ছে কেউ বা মলম লাগাচ্ছে। রামানুজ সমস্ত কিছু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। কখন গুরুদেব এগিয়ে এসেছিলেন তার সামনে সে বুঝতে পারেনি, "চলুন। ফেরা যাক।"

রামানুজের সম্বিতও ফিরে এল এই কথায়। সে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, "ফিরে তো আবার যুদ্ধ।"

গুরুদেব হাসলেন। এ হাসি ক্লান্তির। বললেন, "কে জানে গ্রামে এখন কী হচ্ছে! জঙ্গলের এতটা ভিতরে আছি আমরা যে তা জানার কোনো সুযোগ নেই। আর যুদ্ধের কথা বলছো, তা ফিরে হবে, নাকি ফেরার পথে হবে নাকি আদৌ হবে না তাও জানি না। তবে ফিরতে হবে এখন। এটা জানি।"

রামানুজ চারদিকে একবার তাকাল। প্রায় সকলেই তৈরি। ওরা রওনা দিল গ্রামের পথে। বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। প্রায় চার ঘণ্টার পথ। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। প্রায় পঞ্চাশ জনের দলটা এবার একত্রে থাকার মনস্থ করেছে। যা-ই মোকাবিলা করতে হবে একত্রে করবে ওরা।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর ঘটনাটা ঘটল। দলের মধ্যে গুরুদেবই কিছুটা আগে ছিলেন। এই বয়সেও তাঁর স্ফুর্তি দেখার মতো। তিনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তার দেখাদেখি তাঁর আশেপাশের উপজাতি সৈন্যরাও থমকে গেল। রামানুজ এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।

"কী হয়েছে? থামলেন কেন?"

গুরুদেব মুখে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিলেন। রামানুজ পিছনে বাকিদের নির্দেশ দিলেন। সকলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যে যেখানে ছিল। দ্বিতীয় ইশারা এল। সকলে এবার টার্গেট সেট করল চারপাশে।

খুব সূক্ষ্ম একটা শব্দ ভেসে আসছে। গুরুদেব জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতার দিকে তাকালেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতলেন মাটিতে। পাতাগুলো কাঁপছে। দূরে কোথাও একই কম্পাঙ্কে কাঁপছে অন্য জায়গার পাতা। একটা অদ্ভুত ঘষটানি শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে। ধীরে ধীরে শব্দের বেগ বাড়ছে। স্পষ্ট হচ্ছে শব্দটা। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। আরও এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সময় উপস্থিত হয়েছে। চোখ খুলে সকলের উদ্দেশে বললেন, "তৈরি থাকুন সকলে। এক দল শয়তান এগিয়ে আসছে এদিকেই।"

সকলে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল গুরুদেবের কথা শুনে। রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "কতজন আসছে?"

গুরুদেব তাঁর দিকে এক করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। রামানুজ এর অর্থ বুঝতে পারল। সে বলল, "পুরো গ্রাম!"

গুরুদেব বললেন, "জানি না। তবে সংখ্যায় নিঃসন্দেহে আমাদের কয়েকগুণ বেশি।"

রামানুজ আর সময় নষ্ট না করে চিৎকার করে উঠল, "গুলি মজুদ রাখুন সকলে। এক ঝাঁক শয়তান এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।"

গুরুদেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "মাথায়, শয়তানের মৃত্যু শুধুমাত্র মস্তক ছেদনে অথবা মস্তকে গুলি করলেই সম্ভব।"

সিনহা কথাটা শুনলেন এবং ছড়িয়ে দিলেন, "ওদের মারতে হলে ঠিক মাথায় গুলি করবে সকলে। শরীরে গুলি করলেও ওদের কিছু হবে না।"

দাসবাবু বললেন, "ওদের কামর, আঁচড় থেকে দূরে থাকবে সকলে। ওদের রক্ত যেন আমাদের দেহের রক্তের সঙ্গে না মেশে।"

গুরুদেবের হাতে একটা তরোয়াল তুলে দিল রামানুজ। নিজের পিস্তল উদ্যত করে তৈরি হল সে। সকলে একে একে তাগ করলেন নিজের অস্ত্র। কেউ অটোম্যাটিক অ্যাসল্ট রাইফেল, কারো হাতে কোল্ট পিস্তল, কারো হাতে তীর-ধনুক, বর্শা, তরোয়াল এমনকি কারো হাতে কুঠার। আদিম ও বর্তমান সভ্যতার সমস্ত অস্ত্র মিলে রুখে দাঁড়াতে চাইছে মানবসভ্যতার উপরে ধেয়ে আসা বিপদের মোকাবিলা করার জন্য।

মিনিট পাঁচে পর ওদের দেখা গেল। একদম শুরুতে দেখা গেল সাদা বস্ত্র পরিহিত এগারোজনকে। চোখ সঙ্কুচিত হল গুরুদেবের। দলের একজন নেই। সে-ই নিশ্চয়ই এই দলের মাথা। ধীরে ধীরে ওই এগারোজনের পিছনে ফুটে উঠতে থাকল আরও অনেক শরীর। মানব চক্ষু ১৮০ ডিগ্রি অবধি সামনের দৃশ্য দেখতে পারে। ওদের সকলের দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ অংশজুড়ে দেখা গেল গ্রামের লোকেরা ধেয়ে আসছে এদিকে। ওদের গতি শ্লথ, শরীরে মোচড় স্পষ্ট। ওরা যত এগিয়ে আসতে থাকল তত ওদের অবয়ব স্পষ্ট হতে লাগল। প্রত্যেকেই নিজের স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় আকৃতি লাভ করেছে। শরীর হচ্ছে পেশীবহুল।

রামানুজ গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করল, "জীবানু দেহে প্রবেশ করলেও তো এক বছর সময় নেয়। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে হচ্ছে এসব?"

গুরুদেব ঢোক গিললেন। বললেন, "মহৌষধি প্রস্তুত হয়ে গেছে। হে

ভগবান! তুমিই রক্ষা করবে এখন।"

ততক্ষণে ওরা আরও এগিয়ে এসেছে। বাহিনীর একজন বলল, "স্যর ওরা টার্গেট জোনে ঢুকে পড়েছে। আপনি অর্ডার দিন।"

রামানুজ গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিশ্চিত তো যে ওরা আর মানুষ নয়। সম্পূর্ণ শয়তান!"

গুরুদেব এবার তার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বললেন, "পুরোপুরি শয়তান হলে আমরা কোথায় আছি তা খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি বা চেতনা ওদের থাকত না। তবে এটা ঠিক যে ওরা আর স্বাভাবিক মানুষ নন। আমি জানি ওখানে আমাদের বহুপ্রিয় মানুষ বা পরিচিত মানুষ আছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত ওরা আর কোনোদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন না।"

রামানুজ এই কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সে সিনহাকে ইশারায় নিজের নির্দেশ স্পষ্ট করলেন। সিনহা চিৎকার করে উঠলেন, "ফায়ার।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল সমস্ত অটোম্যাটিক এসল্ট রাইফেল। টানা গুলিবর্ষণে কেঁপে উঠল জঙ্গল। সামনে এগিয়ে আসা শয়ে শয়ে শয়তানদের শরীরে বিদ্ধ হতে থাকল গুলি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শরীর ঝাঁজরা হয়ে গেলেও ওরা এগোতে থাকল। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল।

"স্টপ ফায়ারিং। বন্ধ করো।"

দু-রাউন্ড গুলিবর্ষণের পর সিনহা বন্ধ করলেন গুলি চালনা। রিলোড করা হল রাইফেলগুলো। রামানুজ ভালোভাবে লক্ষ করল এত গুলি বর্ষণের পর শুধুমাত্র যাদের মাথায় গুলি লেগেছিল তারাই আর কোনো নড়াচড়া না করে মাটিতে পড়ে আছে। বাকিদের শরীর দিয়ে রক্ত ধারা বইলেও ওরা একইভাবে শ্লথ গতিতে তাদের ভয়ংকর চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

"সিনহা শুধু মাথায় টার্গেট করতে বলো। গুলি নষ্ট হচ্ছে আমাদের।"

সিনহা সেই মতো জওয়ানদের নির্দেশ দিল, "মাথায় মাথায়।"

"স্যর, এখনও হেডশট নেবার মতো রেঞ্জে আসেনি ওরা। তাই আমরা

শুধুমাত্র গুলিবর্ষণ করছিলাম। যেগুলো র‍্যান্ডমলি মাথায় লেগেছে সেগুলোতেই তাই শুধু কাজ হয়েছে।"

"বেশ তৃতীয় রাউন্ড শুরু করো। হেডশট নেওয়ার মতো পজিশনে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ফায়ার!"

এবার যথাযম্ভব শরীরের উপরের দিকে তাগ করে গুলি ছোড়া হল। এবার এতে কিছুটা কাজ হল। আগেরবারের চেয়ে অধিক শয়তান ভূ-পতিত হল। স্তব্ধ হল ওদের নড়াচড়া। দু-রাউন্ড শেষে সিনহার নির্দেশে আবার বন্ধ হল গুলিবর্ষণ। এবার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

প্রত্যেক শয়তান তার কোচর থেকে বের করল একটা ছোট শিশি। দূরত্ব এখন অনেকটাই কম। গুরুদেব, রামানুজসহ সকলে দেখলেন যে ওই শিশির ভিতর আছে সবুজাভ হলুদ বর্ণের তরল। সেই তরল ওরা সকলে একসঙ্গে গলায় চালান করল। তারপরের কিছু সময় ওদের শরীরে ঘটল অদ্ভুত পরিবর্তন। এমনকি এক সময় ওরা মাটিতে বসে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল সকলে। অদ্ভুত প্রাণীগুলোর চিৎকারে কেঁপে উঠল জঙ্গল। জঙ্গলের প্রাণীরা যে যেখানে পারল দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। বানরগুলো গাছের মাথায় জুড়ে দিল চিৎকার। জঙ্গলের শেয়ালগুলো গর্তে ঢুকে পড়ল। একটা অস্বস্তিকর ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওদের আর্তনাদ বন্ধ হল। তাদের শিরা বরাবর দেখা গেল অদ্ভুত সবুজাভ আলোর ছটা বিদ্যুতের মতো পরিবাহিত হচ্ছে। পরমুহূর্তেই ওরা সবাই সংঘবদ্ধভাবে উঠে দাঁড়াল। ওরা আবার এগোতে শুরু করল। একই তাল একই ছন্দ, ভাঙা হাড়গোড় নিয়েও ওদের হাঁটতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এবার ওদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরত্ব খুব বেশি হলে চল্লিশ ফুট। গুরুদেব দেখতে পেলেন যে ওদের চোখ দু-টো সম্পূর্ণ সাদা নয়। প্রত্যেকের একটায় মণি বর্তমান অন্যটা সাদা।

সিনহা এবার গর্জন করলেন, "হেডশট।"

এবার হেডশট করা শুরু করল জওয়ানরা। পরপর শয়তানগুলো মাটিতে

পড়তে শুরু করল। এরই মাঝে একজন সাদা বস্ত্র-পরা শয়তান, যে বারোজনের দলের অংশ ছিল সে দৌড়ে এসে এক সিপাহীর উপর লাফ দিয়ে পড়ল। এত দ্রুত ঘটল ঘটনাটা যে কেউ কিছু করতে পারল না। সিপাহী নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও শয়তানের শক্তির কাছে হার মানল। তার গলায় শয়তান বসিয়ে দিল তার দাঁতের সারির আলপনা। গল গল করে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করল। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল সেই সিপাহী। ঘটনার আকস্মিকতায় আশেপাশের অনেকেই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে রামানুজও ছিল। সম্বিত ফিরে পেতেই নিজের কোল্ট পিস্তল চালিয়ে দিল সে। শয়তানের মাথায় লাগল বুলেট। সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ঘটল অন্য বিস্ময়কর ঘটনা। যে সিপাহীটিকে আক্রমণ করা হয়েছিল তার দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। তার দেহের মোচর, চোখের মণি সাদা হয়ে যাবার ঘটনা ঘটল তড়িদগতিতে। রামানুজ

একবার গুরুদেবের দিকে তাকালেন। তারপর ওই সিপাহীর মাথা লক্ষ করে গুলি করে দিলেন।

এবার আর সময় নেই। সিপাহীর ভয়াবহ পরিণতির পর বাকিরাও ভয় পেয়ে গেছে। একদম কাছে চলে এসেছে ওরা। পরপর গুলি করেও মারা যাচ্ছে না আর সবাইকে। ওরা এবার ধরে ফেলবেই। উপজাতি সিপাহীরা তীর ছুড়ছে, তরোয়াল দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, বর্শা ছুড়ছে এক আধজনের মাথা লক্ষ করে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। এবার রামানুজ নির্দেশ দিলেন, "ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকো সকলে, গুলি চালানো যেন বন্ধ না হয়।"

এবার ধীরে ধীরে গোটা দল এক পা এক পা করে পিছনে হাঁটতে শুরু করেছে। গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়নি, তাতে অনেক শয়তান মারাও যাচ্ছে। কিন্তু এই বৃহৎ শয়তানের দলের সামনে পঞ্চাশজনের দল কিছুই না। তার মধ্যে সকলের হাতে বন্দুক নেই। এভাবে গুলি চালাতে থাকলে আর মিনিট দশেকেই গুলি ফুরিয়ে যাবে। এক আধটা শয়তান গতিবেগ বাড়িয়ে সামনে চলে আসছে। কখনো গুরুদেব, কখনো অন্য কেউ তরবারির আঘারে ছিন্ন করছে তার মস্তক। কিন্তু এভাবে আর বেশি সময় আটকে রাখা যাবে না ওদের। আরও মিনিট কয়েক কাটল।

এক জওয়ান বলল, "স্যর গুলি শেষ হয় আসছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু হবে আমাদের।"

অন্য আরেকজন বলল, "অর্ডার দিন স্যর।"

রামানুজের শার্ট ঘেমে ভিজে উঠেছে। জুলপি বরাবর দরদর করে ঘাম নামছে মাথা দিয়ে। কী সিদ্ধান্ত নেবে বুঝিতে পারছে না সে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাকিদেরও অবস্থা একইরকম। রামানুজ অসহায়ের মতো দৃষ্টি নিয়ে গুরুদেবের দিকে তাকাল। গুরুদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন এক জায়গায়। তিনি কি হার স্বীকার করে ফেলেছেন!

না, তিনি আবার একটা শব্দ শুনতে পেয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ

উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। রামানুজ বুঝতে পারল না এর অর্থ। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, কী করবো এখন?"

গুরুদেব মাথার উপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ দিলেন, "রক্ষা কবচ আসছে। রক্ষা কবচ আসছে। আর চিন্তা নেই।"

রামানুজ তাঁর আঙুল অনুসরণ করে উপরের দিকে তাকালো। জঙ্গলের গাছেদের জন্যে আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। শুধু মাঝের অংশে গোলাকৃতি আকাশ অল্প দেখা যাচ্ছে। আর সেখানেই দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক কালো বিন্দু। ওদের দেখাদেখি বাকিরাও তাকালো উপরে। কিছু একটা তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বোঝা গেল ব্যাপারটা। এক ঝাঁক ঈগল উড়ে আসছে নীচে। রুদ্ধশ্বাস গতিবেগ ওদের ডানায়। তীক্ষ্ণ ফলার মতো ঠোঁট আর প্রকাণ্ড ডানা নিয়ে আহত সহস্র ঈগলের দল ছুটে আসছে নীচে।

গুরুদেব চিৎকার করলেন, "পিছিয়ে যাও সকলে। পিছিয়ে যাও। ওরাই শেষ করে দেবে ওদের।"

গুরুদেবের নির্দেশের পরে যে যেখানে ছিল সেখান থেকে দৌড় শুরু করল। পিছনে শয়তানের দল ধাওয়া করার চেষ্টা করলেও পারল না। শত সহস্র ঈগল পাখি নেমে এসে বাঁধা দিল তাদের। সে কী সুতীব্র সুতীক্ষ্ণ ডাক। বুকের ভিতরে কাঁপন ধরছে সেই ডাক শুনে। এই ডাক শুনেই একদিন ভয় পেয়েছিল চোরা পথে বাংলাদেশে যেতে চাওয়া দলের ছেলেরা। আজ এই ডাক এত কাছ থেকে শুনে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে সবার। ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা নেমে আসছে। কী বীভৎস সেই ক্রুদ্ধ ঈগলদের প্রতিকৃতি। ওরাই এই জঙ্গলের প্রকৃত পাহারাদার। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা এই জঙ্গলে প্রবেশ করবে তাদের সেই মূল্য দিতেই হবে। প্রাণ বিসর্জন করে দিতে হবে সেই মূল্য।

দীর্ঘদেহী ঈগলের ডানার ঝাপটায় প্রায় প্রত্যেকটা শয়তান মাটিতে পড়ে গেল। আবার উঠার চেষ্টা করল তারা। ততক্ষণে ঈগলগুলো তাদের বুকে

উঠে বসেছে। শয়তানগুলোও জাপটে ধরার চেষ্টা করছে পাখিগুলোকে কিন্তু ঈগল ধরা কি এতই সহজ। ইত্যবসরে রামানুজ সবাইকে নিয়ে অনেকটাই সুরক্ষিত দূরত্বে পৌঁছে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্তটা অভিজ্ঞ চোখে একবার জরিপ করল রামানুজ। তারপর ভাবল, এটাই শেষ সুযোগ। ঈগলেরা যতক্ষণ ওদের লড়াইয়ে জড়িয়ে রাখবে সেই ফাঁকে ওদের মাথায় গুলি করে ওদের শেষ করে দেওয়াই যায়। সে আর সময় নষ্ট না করে জওয়ানদের উদ্দেশে বলল, "ঈগলেরা ওদের ঘিরে রয়েছে। এরই মাঝে আমরা ওদের মাথা লক্ষ করে গুলি করতে থাকব। খেয়াল রেখো কোনো ঈগলের গায়ে যেন গুলি না লাগে। ওরা আমাদের সাহায্য করতে নেমে এসেছে।"

ব্যস জওয়ানেরা ভয় পেলেও ময়দান ছাড়তে নারাজ ছিল। ভারতীয় জওয়ানরা জয় ছাড়া কিছু বোঝে না। তারা তৎক্ষণাৎ পজিশন নিয়ে নিল। আগামী আধ ঘণ্টায় উপজাতি সিপাহীরা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল। ঈগলদের বাঁচিয়ে রেখে ভারতীয় বাহিনী সুনিপুণ হাতে একের পর এক শয়তানদের মাথায় গুলি করতে লাগল। আধ ঘণ্টার বিপুল কর্মযজ্ঞ শেষে ওখানে আর একটা শয়তানও বেঁচে রইল না।

রামানুজসহ সকল জওয়ান দাঁড়িয়ে পড়ল। উলটোদিকে এক পাল ঈগল মৃতদেহের উপরে বসে রইল। ঈগলগুলোর ঠোঁটে রক্তের দাগ। এই দৃশ্য অভাবনীয়, দুইদিকে দুইরকম জীব। পাখি ও মানুষ। ওরা মিলিতভাবে সদ্য একটা যুদ্ধ জিতেছে। গুরুদেব ঈগলেরা উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন, "জয় গন্দবেরুন্দার জয়।"

উপস্থিত সকলে মিলে বললেন, "জয়... জয় গন্দবেরুন্দা।"

রামানুজ নিজের পিস্তলটা আকাশের দিকে তুলল। অন্যান্য জাওয়ানরাও তাই করল। তারপর সকলে মিলে আকাশের দিকে একবার গুলি চালাল। ঈগলদের অভিবাদন জানাতেই এই উদ্যোগ।

ঈগলেরাও এরপর উড়ে গেল আকাশে। যেভাবে হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে

নেমে এসেছিল ঠিক সেভাবেই ওরা আবার উড়ে চলল দিকশূন্যপুরের দিকে। নীল আকাশে কালো কালো বিন্দুর মতো দেখা গেল ওদের। একসময় ওরা আকাশেই কোথাও মিলিয়ে গেল। হয়ত উড়ে চলে গেল পাহারের দিকে। আর দেখা গেল না ওদের।

অল্প সময়ের ঘটনা। তবু সকলের মনটা খারাপ হয়ে এল। আত্মীয় বিয়োগের মতো তিরতিরে একটা দুঃখ ছড়িয়ে পড়ল মনের মধ্যে। কিন্তু এখানেই তো কাজ শেষ হয়নি। গ্রামে পৌঁছাতে হবে।

গুরুদেব বললেন, "দেখে তো মনে হচ্ছে গ্রামে আর কেউ বেঁচে নেই। চলুন গ্রামে চলুন।"

রামানুজ একবার অস্ফুটে বলল, "এখানে তো হেমন্তাই নেই। তিনি কোথায় কে জানে?"

সকলে গ্রামের দিকে রওনা দিলেন। ফেরার পথে পায়ের মধ্যে যাতে মৃত শয়তানদের রক্ত না লাগে তাই ওরা ঘুরে অন্যদিক দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। গ্রামে পৌঁছাতে অন্তত তিন ঘণ্টা হাঁটতে হবে ওদের।

* * * * * * * * * *

(১২)

সন্ধে হয়ে গেছে। আবার চাক চাক কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। পাখিরা বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ হল। জঙ্গল থেকে সকলে বের হল ধীরে ধীরে। গ্রাম নাকি শুনশান শ্মশান হঠাৎ করে বোঝা যাচ্ছে না। আজ কারো ঘরে আলো জ্বলছে না। গ্রামের মাঝখানে মন্দির অবস্থিত। রোজ সেখানে বড় একটা প্রদীপ জ্বালানো হয়। আর সেখানে প্রদীপ আছে, তাতে আলো নেই। গ্রামের ঘরদোর সমস্ত খোলা। গৃহস্থরা যেন হঠাৎ এক বেলাতেই বোবা হয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দলটা।

একটা কুকুর অব্দি আজ গ্রামে নেই। ওরা কি কাউকে রেহাই দেয়নি! জওয়ানরা চারদিকে খুঁজে চলেছে। কিন্তু প্রাণের চিহ্ন অব্দি নেই। মন্দিরের ভিতরে গ্রামের দেবতা থাকেন ভেবে ওদিকে আর কেউ প্রবেশ করে না। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুঁজতে থাকেন সকলে।

গুরুদেব বললেন, "আবাসনে আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে। আমাদের আগে ওদিকেই যাওয়া উচিত। ওখানে অনেক প্রয়োজনীয় ওষুধ, গবেষণাপত্র রয়েছে। অনেক বাচ্চা ওখানে থাকে। আমরা জঙ্গলে কোনো বাচ্চা দেখিনি। চলুন সকলে।"

জওয়ানদের নিয়ে সবচেয়ে আগে আবাসনেই পৌঁছাল রামানুজ। সেখানেও যে হানা দিয়েছিল শয়তানেরা তা আবাসনের হত কুৎসিত অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দরজা জানালা ভেঙে ফেলেছে ওরা। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লাল রক্তের দাগ। ভাঙচুর হয়েছে পরীক্ষাগার থেকে শুরু করে শ্রেণিকক্ষ সর্বত্র।

গুরুদেব চিৎকার করলেন, "কে আছো এখানে? কেউ কি নেই আমার আবাসনে?"

গুরুদেব এবার অরায় ভেঙে পড়ছেন। তাঁর এতদিনের সাধের আবাসনের এই পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। গুরুদেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছেন আবাসনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। পিছনে রামানুজ, সিনহা, দাসবাবু এবং অন্যান্য জওয়ানরা। আবাসনের উপজাতি সিপাহীরাও চারদিক খুঁজে চলেছে। ছাত্রদের আবাসন পেরিয়ে ছাত্রীদের আবাসনের দিকে এগোলেন গুরুদেব।

"কেউ আছো? আমি তোমাদের গুরুদেব, আমি এসে গেছি। কেউ আছো?"

গুরুদেব উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে করতে এগোচ্ছিলেন। আর তখনই একটা দরজা ভিতর থেকে খোলার শব্দ হল। সকলে থেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বন্দুক তাগ করা হল দরজার দিকে। সামনে কী আছে কোনো ধারণা নেই।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল আর সবাইকে অবাক করে ভিতর থেকে বাচ্চারা বেরিয়ে আসতে লাগল। গুরুদেব এতগুলো বাচ্চাকে এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আনন্দে হাঁটু গেরে মাটিতে বসে পড়লেন। সমস্ত বাচ্চারা বেরিয়ে এসে গুরুদেবের বুকে জড়িয়ে ধরল। গুরুদেব পুরো গ্রাম হারিয়ে ফেলেছেন ঠিকই, কিন্তু নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করা গেছে। নিজের বুক দিয়ে আগলে ধরেছেন বাচ্চাগুলোকে। চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু।

এই দৃশ্য দেখে এতক্ষণ ধরে ক্লান্ত অবসন্ন সকলের চোখে জল চলে এল। আহা, কী সুন্দর দৃশ্য। বাচ্চারা সবাই একে একে বেরিয়ে আসছে দরজার ভিতর থেকে। রামানুজ একটা বাচ্চা মেয়েকে কোলে তুলে নিল। তার গালে আদর করে চুমু খেল। সারাদিনের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা যেন কেটে গেল মুহূর্তে।

সব বাচ্চা বেরিয়ে এলে পর সকলে দরজার দিকে তাকাল। এবার বেরিয়ে এল একজন যুবতী।

গুরুদেবের মুখ দিয়ে বেরলো, "দুর্গা!

দুর্গার পিছন পিছন বেরিয়ে এল বারোজন যুবক। সকলের পরিহিত সাদা বস্ত্র। ওরা এগিয়ে এল।

গুরুদেব রামানুজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওদেরই আমরা বাছাই করেছিলাম পরবর্তীবার জঙ্গলে পাঠানোর জন্য।"

রামানুজ বুঝতে পারল ওরা কারা। দুর্গা এগিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করল। বারো সদস্যের মধ্যে এক যুবক বললেন, "এই আবাসনের সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে গুরুদেব। আমরা বিভিন্ন রকম বুদ্ধি করে বাচ্চাদের এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিছু ওষুধও আমরা বাঁচাতে পেরেছি।"

দুর্গা হতাশভাবে বললেন, "গ্রামের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই গুরুদেব। কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের এত বছরের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল।"

গুরুদেব উঠে দাঁড়িয়ে দুর্গাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "বোকা মেয়ে! এত সহজে হারবো নাকি আমরা? সমস্ত শয়তানদের আমরা শেষ করে দিয়েছি।"

এই কথা শুনে দুর্গার মুখ উজ্জ্বল হল। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি একজন সিপাহী দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত হল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মন্দিরে চলুন গুরুদেব। মন্দিরে চলুন। অনর্থ হয়ে গিয়েছে।"

কথাটা শেষ করা মাত্রই সকলে বিপদের গন্ধ পেয়ে ছুটল মন্দিরের দিকে। কিছু জওয়ান বাচ্চাদের দায়িত্বে আবাসনে থাকল। মন্দিরে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখল সবাই তাতে সকলে বোবা হয়ে গেল।

মন্দিরের সামনে এগিয়ে এসেছিল সকলে। আর এসেই চোখ বন্ধ করে ফেলল রামানুজ। বাকিদের মুখ থেকেও বেরিয়ে এল দুঃখ মিশ্রিত হতাশার শব্দ। কিন্তু সম্পূর্ণ শব্দ কারো মুখ থেকেই বেরোলো না।

মন্দির প্রাঙ্গণে পোঁতা একটা ত্রিশুলের মাথায় শয়তানগুলো গেঁথে রেখেছে হেমন্তাইয়ের মাথাটা। হেমন্তাইকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা। গ্রামের ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না যাকে ছাড়া, সেই একমাত্র হেমন্তাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে। যে কয়েকজন গ্রামের মানুষ বেঁচে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের
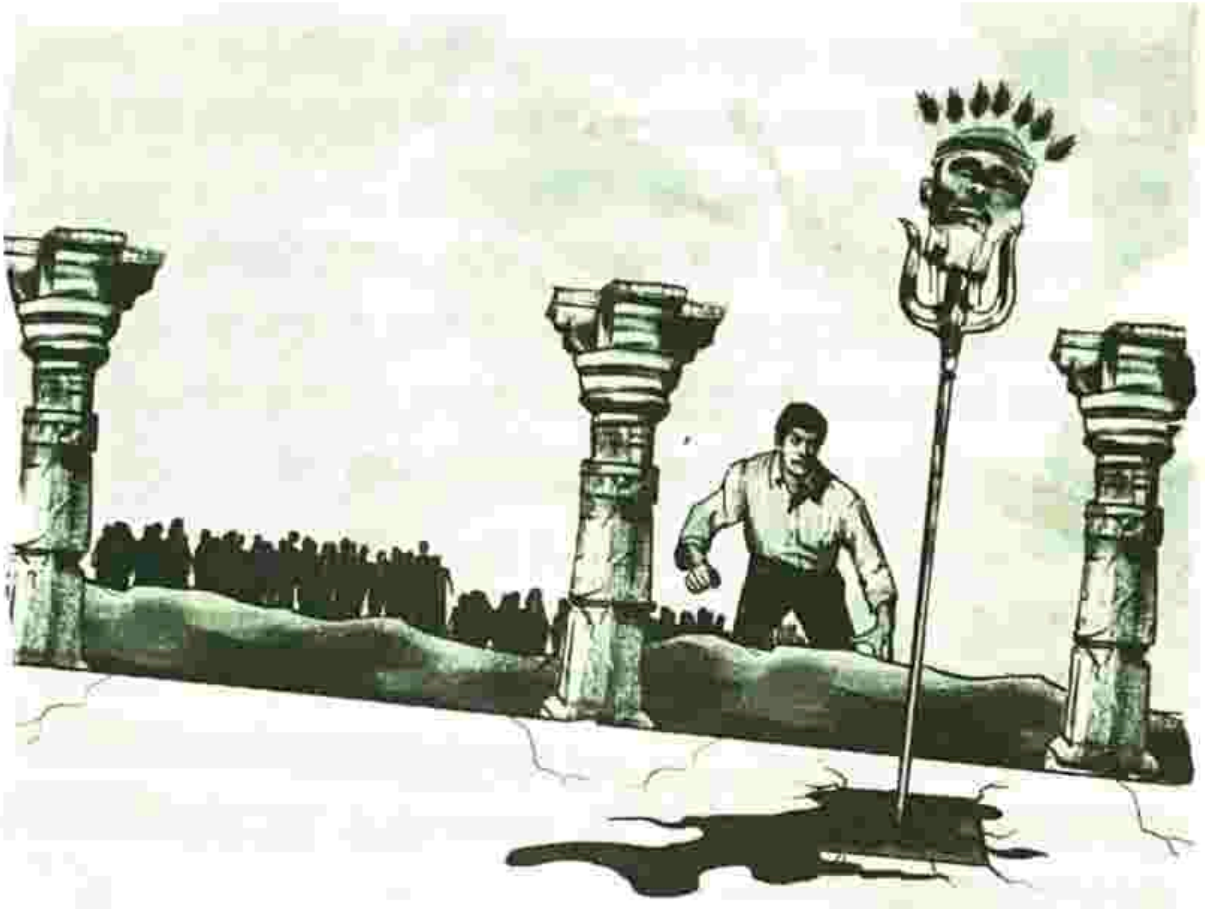
মাথায় এই দৃশ্য আর আকাশ ভেঙে পড়া একই কথা।

গ্রামে জওয়ানদের ফেরার খবর পেয়েছিল কাঞ্চন। দাসবাবু গ্রামে ঢুকেই তাকে ফোন করেছিলেন। কাঞ্চন ছুটে এসেছে সকলের সঙ্গে দেখা করতে। আর এসেই সকলকে এভাবে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হল। এগিয়ে গেল মন্দিরের একেবারে সামনে। আর এগিয়েই নিজের পিতার কর্তিত মস্তক দেখতে পেল সে।

মাটিতে বসে গেল কাঞ্চন। দুর্গা তাকে দেখতে পেয়েছে। আজকে আর কোনো বাঁধা নেই। সে এগিয়ে গেল তার দিকে। জড়িয়ে ধরল তাকে। কাঞ্চনের বাহ্য বোধশক্তি আর কিছুই যেন বাকি নেই। সে দুর্গার বুকে মাথা রেখে ডুকরে উঠল।

বারোজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই চোখে জল। কেউ এগিয়ে যেতে পারছে না। কারো সাহস নেই মন্দির প্রাঙ্গণে উঠে আরও কাছ থেকে

দৃশ্যটা দেখার। তাদের একজন গুরুদেবের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব হেমন্তাই ছাড়া এই চক্র তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তো কখনো আমাদের ক্রিয়া সম্পাদিত হবে না।"

গুরুদেব অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যুবক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুদেব! হেমন্তাই তো আর কখনো কেউ হতে পারবে না। উপায়?"

গুরুদেব এবার নেহাত বাধ্য হয়ে উত্তর দিলেন, "বিকল্প ব্যবস্থা আছে। কঠিন ব্যবস্থা, কিন্তু আছে। কিন্তু আমার এতকালের সঙ্গীকে ফেরানোর তো আর কোনো ব্যবস্থা নেই।"

রামানুজ শত চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। গুরুদেবের এই কথার তার চোখেও জল চলে এল। সত্যিই তো, আর তো বৃদ্ধ হেমন্তাই ফিরে আসবেন না। আর তো কখনো উদয়পুরের কল্যাণ সাগরে তার থেকে কাহিনি শোনা হবে না। ঝরঝর করে জল পড়ছে ওদের সকলের চোখ দিয়ে।

কিন্তু একসময় রামানুজ নিজেকে সংযত করে ফেলল। সকলে জড়বৎ দাঁড়িয়ে দুঃখবিলাস করলে বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি। সে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। আজকে তাকে কেউ আটকালো না। সে সোজা গিয়ে দাঁড়াল ত্রিশূলটার সামনে। প্রায় তার মাথা অব্দি উচ্চতার ত্রিশূলে গাঁথা আছে হেমন্তাইয়ের মাথা। যেন হেমন্তাই দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে, যেন তার দেহ ত্রিশূল দিয়ে তৈরি।

হেমন্তাইকে পিছনে ফেলে রামানুজ ভিতরে প্রবেশ করল। খুব বড় না হলেও মাঝারি আকারের গর্ভগৃহ। মন্দিরের ভিতরে গন্দবেরুন্দার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জঙ্গলের মন্দিরে যে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এই মূর্তি। দেবতার মূর্তির পাশে লাল রক্ত দিয়ে দেওয়ালে কিছু লেখা আছে। ভাষাটা সম্ভবত ককবরক। রামানুজ তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে ছবি তুলে বাইরে এল।

"গুরুদেব ভিতরে কিছু একটা লেখা রয়েছে, সম্ভবত ককবরক ভাষায়।

আপনি একটু দেখুন।"

গুরুদেব বিহ্বল হয়ে ছিলেন। বহুদিনের বন্ধু হেমন্তভাইয়ের মৃত্যু তাঁকে গভীর শোক দিয়েছে। রামানুজের ডাকে তিনি এগিয়ে এলেন সামনে। মোবাইলটা হাতে নিয়ে ছবিটা দেখে লেখাটা পড়লেন।

রামানুজ জিজ্ঞেস করল, "কী লেখা আছে বলুন আমাদের?"

গুরুদেবের ঠোঁট কাঁপছিল। রামানুজ তাঁকে ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব বলুন।"

গুরুদেবের সম্বিত ফিরল। তিনি বললেন, "লেখা আছে, মানবসভ্যতা সাবধান। কৈটভ ফিরেছে লোকালয়ে। তাঁর অস্ত্র মৃত-কৈটভ।"

* * * * * * * * * * *

রামানুজেরা যখন বর্তমানে গ্রামের মধ্যে শোকে মূহ্যমান ঠিক তখনই জঙ্গলে দেবতার মূর্তি চুরি করছিল কৈটভ। সে জানে এই যাত্রায় গুরুদেব আর রামানুজ মিলে তার সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু এই সৈন্য আবার তৈরি করা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এবার আর একদিনের প্রস্তুতি নিয়ে নয়, সে ফিরবে বহুদিনের সুপরিকল্পিত আয়োজন নিয়ে। আজকের পরাজয়ও তার কাছে সামগ্রিক জয়লাভের প্রথম সিঁড়ি।

কৈটভের হাতের কাচের বয়ামে জ্বলজ্বল করছে সবুজাভ হলুদ রঙের মৃত কৈটভ। তাঁর সামনে চন্দনময় হয়ে বসে আছেন বিষ্ণুর অবতার, স্বয়ং গন্দবেরুন্দা।

খুব শীঘ্রই আবার কৈটভ ফিরবে। এবার আরও ভয়ানক হবে পরিণতি। মানবসভ্যতার হাতে আর অল্প সময় বাকি। ততদিন বেঁচে থাকুক মানবসভ্যতা।

সাবধান পাঠক, দেবতার ঘুম ভাঙছে

ত্রিপুরার এক জঙ্গলে গ্রামবাসীদের দেবতা থাকেন। দেবতা নিজের ভোগ নিজেই চয়ন করেন। উপজাতি গ্রামবাসী ছাড়া কারোর সেই জঙ্গলে প্রবেশাধিকার নেই। সেই গ্রামকে কেন্দ্র করেই এই রোমহর্ষক কাহিনি। এই কাহিনি এক রোমাঞ্চকর অনুসন্ধানের যা শেষ হচ্ছে বিষ্ণুপুরাণের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ে।

ISBN 978-93-90890-76-7
9 789390 890767
₹ ২২২.০০
www.bivamart.in